গভীর নির্জন পথে

সুধীর চক্রবর্তী

: প্রাপ্তিস্থান :

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৯

‘প্রযাত পিতা মাতার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে’

মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে

শোনা যায় যান্ত্রিক সভ্যতা যত এগোয় সভ্য মানুষ তত কৃত্রিম হতে থাকে। তার মুখে এঁটে বসে যায় এক মুখোস শিষ্টতার, সৌজন্যের। পরে অনেক চেষ্টা করলেও তার সত্যিকারের মুখশ্রী আর দেখা যায় না, সে নিজেও এমনকি দেখতে পায় না। বলা হয় গাঁয়ের মানুষ নাকি অন্যরকম। সভ্যতার কৃত্রিমতার আঁচ যদিও তাদের গায়ে লাগছে একটু আধটু, তবু তারা সরল প্রাণবন্ত আতিথ্যপ্রবণ।

এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা মিশ্র ও ভিন্নতর। অন্তত শতকরা আশীভাগ গ্রামবাসীর মনের কথা টের পাওয়া যে খুব কঠিন তা আমি বলতে পারি। তাঁদের মুখের মুখোস নেই কিন্তু আছে এক কাঠিন্যের আবরণ। আপাত সারল্যের অন্তরালে সেই কঠিনতা প্রায় দুষ্প্রবেশ্য। তবে একবার সেই শক্ত খোলা ভাঙতে পারলে ভেতরে নারকোলের মতোই বড় স্নিগ্ধ শাঁসজল। কয়েক শতাব্দীর তিক্ত লেনদেন, ব্যর্থ আশ্বাস আর নির্লজ্জ শোষণ গাঁয়েব মানুষকে শহুরে বাবুদের সম্পর্কে ক'রে তুলেছে সন্দিহান। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁদের দেখা-জানা আর শহরের মানুষের বইপড়া-তত্ত্বে এত ফাঁক তাঁরা দেখতে পান যে আমাদের জন্যে তাঁরা সবসময়ে রেখে দেন এক অন্তর্লীন করুণাবোধ। তাঁদের মূঢ় ম্লান মূক মুখে ঢাকা আছে এক দারুণ কৌতুক, যার বিনিময় তাঁরা নিজেদের মধ্যে করেন অবসর সময়ে। তাঁদের এই কৌতুক আর করুণা প্রকাশ পায় বাক্যে। 'বাবুর কি আমাদের মোটাচালে পেট ভরবে ?' 'এ গেরামে কী আর দেখবেন ? গরমকালে ধুলো আর বর্ষাকালে কাদা'—কিংবা 'বাবু হঠাৎ টেপ রেকর্ডার যন্তর নিয়ে অ্যালেন যে ? আমাদের গেঁয়ো গানে কি আপনাদের মন ভরবে ?' অথবা 'আপনারা এদিকে ঘন ঘন এলে আমাদের ভয় লাগে, হয়ত ভোট বা অন্য কোন তালে আসছেন কে জানে ?' এসব বাক্যবন্ধে খুব কায়দা ক'রে মেশানো আছে চাপা কৌতুক আর নীরব অট্টহাসি।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে যাঁর সরেজমিন ঘোরার অভিজ্ঞতা আছে তিনিই বুঝবেন আমার ধারণার মূল কথা। একটা দারুণ প্রতিরোধ আর অবিশ্বাস তাঁদের পার হতে হয়েছে। সেখানে, অভ্যর্থনা জোটে, আহার বাসস্থানও। কিন্তু সন্দেহ থাকে

সদাউদ্যত। একটা ভয়। এই বুঝি কিছু বেরিয়ে গেল তাঁদের। 'জানেন আমাদের গাঁয়ের কুবির গোঁসাইয়ের গান টুকে নিয়ে ষষ্ঠী ডাক্তার রেডিওতে দিয়েছিল, কত টাকা পেয়েছে !' ছেঁউরিয়ায় লালন ফকিরের মাজারে আমাকে একজন বলেছিলেন, 'জানেন, আপনাদের রবি ঠাকুর আমাদের লালন শায়ের গান টুকে নোবেল প্রাইজ নাকি যেন একটা পেয়েলো। সে নাকি শতাবধি টাকা !'

এ যদি হয় সাধারণ মানুষের বক্তব্য আর ধারণা তবে অসাধারণদের অব্যক্ত বিশ্বাস আর নাই বা বললাম। কিন্তু আমার কাজটা ছিল আরো কঠিন জায়গায়। উদাসীন-ফকির-বাউলদের সঙ্গে। সময়টা পুরো ষাটের দশক। নদীয়া বর্ধমান মুর্শিদাবাদ এ বাংলায়, মেহেরপুর কুষ্টিয়া ও বাংলায়। অনেক অগণন গ্রাম। তার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকা কত উপধর্ম। এইচ. এইচ. উইলসন যাঁদের একশো বছর আগে বলেন 'মাইনর রিলিজিয়াস সেক্টস্', অক্ষয়কুমার দত্ত যাদের বলেন 'উপাসক সম্প্রদায়'। একশো বছর আগে লেখা তাঁদের বিবরণ পড়ে জানতে ইচ্ছে হয় এখন কী অবস্থায় আছে এ সব সম্প্রদায় বা উপধর্ম ? শুরুতে আমার সম্বল বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পুঁথিপড়া ডিগ্রি আর জানবার আগ্রহ। কিন্তু ভাষা যে জানি না ! সত্যিই তাই। লোকধর্মের ভাষা বুঝতে আমার লেগেছে ঝাড়া পাঁচটা বছর। কেননা তাদের ভাষাটাই 'সন্ধা' অর্থাৎ বাইরের মানে আর ভেতরের মানে একেবারে আলাদা। প্রথমদিকের হোঁচট খাওয়ার কিছু নমুনা বলি।

১. একজন সাধককে আমার প্রশ্ন : আপনি বাউল ?
উত্তর : আমি সংসার করি নাই।
প্রশ্ন : আপনি তো ফকির ? আপনার ছেলেমেয়ে ?
উত্তর : সন্তান ? পাঁচহাজার। আমার পাঁচ হাজার শিষ্যশাবক। তারাই সন্তান। জানেন না ফকিরী দণ্ড নিলে আর সন্তান হয় না।

শিষ্যসেবক নয় শিষ্যশাবক ! ফকিরী দণ্ড বস্তুটি কি ? বাউল কি সংসার করে না ?

২. একজন উদাসীনকে আমি জিজ্ঞেস করি : আজ কি খেলেন ?
উত্তর : খাওয়া নয়, বলুন সেবা। আজ সেবা হলো পঞ্চতত্ত্ব।
প্রশ্ন : পঞ্চতত্ত্ব মানে ? সে তো চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত...
উত্তর : আরে না না, পঞ্চতত্ত্ব মানে চাল ডাল আর তিন রকমের আনাজ।

৩. এক আখড়ায় খুব ফিসফিস ক'রে এক গুরুস্থানীয় উদাসীনকে জিজ্ঞেস

করলাম : একটা গানে শুনলাম 'ভগলিঙ্গে হলে সংযোগ/ সেই তো সকল সেরা যোগ ॥' তার মানে ? এখানে কি মৈথুনের কথা বলা হচ্ছে ?

একগাল হেসে উদাসীন বললেন : মৈথুন ? হ্যাঁ মৈথুনই তো ? তবে কি জানেন, এর মানে আলাদা। শুনুন তবে : 'গুরুবাক্য লিঙ্গ হয় শিষ্যের যোনি কান।' এবারে বুঝলেন ?

বুঝলাম যে আগে ভুল বুঝেছিলাম।

এ তো গেল ভুলবোঝা। মুশকিল আসতে পারে আরেক দিক থেকে। যদি প্রশ্ন করা যায়, আপনি কি বাউল সম্প্রদায়ের ? উত্তর পাওয়া যাবে, তা বলতে পারেন। আবার যদি ঐ উদাসীনকে জিজ্ঞেস করি, আপনি ফকির ? উত্তর হবে, হ্যাঁ ফকিরও বটে। এবারে অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করতে হয়, আমি যা-ই জিজ্ঞেস করি আপনি হ্যাঁ বলেন। আপনি সত্যিই কি বলুন তো ? উত্তর মিলবে, আমি মানুষ। মানুষভজা।

এসব কথার স্পষ্ট মানে কি ? আমরা কী সিদ্ধান্ত করব ? আসলে এসব উদাসীনদের সাধনের মূল কথা গোপনতা। অসম্প্রদায়ীদের কাছে হয় কিছু বলেন না, কিংবা উলটো-পালটা বলে বিভ্রান্তি এনে দেন। ওঁরা একে বলেন আপ্ত সাবধান। এর মূল বক্তব্য হল : আপন সাধন কথা/না কহিও যথা তথা/আপনারে আপনি তুমি হইও সাবধান।

আরেকবকম আছে ধন্দবাজি। সেবার যেমন ধাপাড়ার ইমানালি শাহজী ফকির তার খাতা খুলে বললে : লিখুন বাবু কারের খবর। অন্ধকার, ধন্ধকার, কুয়াকার, আকার, সাকার, ডিম্বাকার, নিরাকার, শূন্যাকার, হাহাকার, হুহুকার, নৈবাকার—এই হল একুনে এগারোকার আর চারকার গোপন।

আমি জানতে চাইলাম, এসবের মানে কি ?

মুরুব্বির চালে মাথা নেড়ে শাহজী বললে, এ সব নিগূঢ় তত্ত্ব। আপনি বুঝবেন না।

আসলে শাহজীও কিন্তু কিছু জানে না। কথাগুলো কোথা থেকে টুকে রেখেছে। শহুরে পণ্ডিতম্মন্যরা যেমন ত্রুফো-গদার আওড়ায় !

এখন ভাবি, প্রথম যখন এইসব উপধর্মের সন্ধানে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি তখন উলটো-পালটা সব দেখে শুনে চমকে যেতাম। সবচেয়ে বেকুব বনতে হতো গানের আসরে। হয়ত মচ্ছবের শেষে সারারাত চলল গানের আসর। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ বসে সে গান শুনছে মৌজ ক'রে, গায়ক গাইছে প্রাণ খুলে। আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ তকমাধারী, অথচ সে গানের বিন্দুবিসর্গ বুঝছি না।

এসব গানকে বলে 'শব্দ গান'। একজন প্রথমে গানে তত্ত্বকথা তোলে প্রশ্নের আকারে, আরেক গায়ক তার জবাব দেয় আরেক গানে। প্রথম গানকে বলে 'দৈন্যতা', জবাবী গানকে বলে 'প্রবর্ত'। এসব আমি ক্রমে ক্রমে শিখে নিই। পরে দেখেছি এসব নিগূঢ় ভাষার প্রয়োগ লাগসই করতে পারলে ফলও মেলে হাতেনাতে। সেবার যেমন আমাদের মফঃস্বল শহরে পানের দোকানে এক গ্রাম্য বাউল জনপ্রিয় সব রেকর্ডের গান গাইছিল। আমি ফস্ ক'রে বলে বসলাম, 'ওসব ফক্কিকারী রসের গান গেয়ে কি হবে সাঁই, একটা দৈন্যতার গান হোক।'

ব্যস্, কেল্লাফতে! গায়কের চোখমুখে আমার সম্পর্কে সে কী শ্রদ্ধার জানান! যেন দরদী পেয়েছে মরমীকে। বলেই বসল : আহা কি মান্যমান মহাশয়। শোনেন তবে 'আগে শান্তিপুরে চলোরে মন তবে গুপ্তিপাড়ায় যাবি।'

আমি সেই ভিড়ের দিকে সগর্বে তাকালাম। ভাবখানা যেন, দেখলে আমার এলেম! কী না আমি জানি এ গানের মর্ম। এ গানে বলা হচ্ছে দেহমনকে শান্ত করলে তবে গুপ্তিপাড়া অর্থাৎ গুপ্ততত্ত্ব জানা যাবে। এমনই ক'রে আমি জানতে পারি অমাবস্যা মানে নারীর ঋতুকাল, বাঁকানদী মানে স্ত্রী যোনি। কুমীর মানে কাম। লতা মানে সন্তান। চন্দ্রসাধন মানে মল মূত্র পান ইত্যাদি।

গোট পল্লীর আর্জান শানু ফকির বলেছিল : নিজের শরীরের বস্তু কি ঘেন্নার জিনিস? বস্তু রক্ষা আমাদের ধর্ম, শুক্ররক্ষা। অযথা শুক্রক্ষয় আর সন্তানজন্ম মানে আপ্তমরণ, নিজেকেই মারা। সন্তানজন্ম দেওয়া চলবে না। তবে পতন কি নেই? আছে। যাদের কাম মরে নি তারা বারে বারে জন্মদ্বারে যায়। আমরা তাকে বলি 'যোনিতে পতন'। তাই বলে নারী আমাদের ত্যক্ত নয়। নারীকে নিয়েই আমাদের সাধনা। বিন্দু সাধন। যাকে বলে রসের ভিয়ান। দুধ জ্বাল দিয়ে দিয়ে যেমন ক্ষীর তেমনই। আর ওথলায় না। কামকে তেমনই পাকে চড়িয়ে শান্ত করতে হবে। আমাদের আপ্তজ্ঞানে বলে :

> আপন জন্মের কথা যে জানে রে ভাই
> সকল ভেদ সেই তো জানে তার তুলনা নাই।
> রজ বীর্য রসের কারণ
> এ দেহ হইল সৃজন
> যারে ধ'রে সৃজন পালন তারে কোথা পাই?

সেই আসল মানুষ সাঁইকেই আমরা খুঁজি। বুঝলেন এবার?

লোকধর্ম আর লোকসংগীত নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রায় দশ বারো বছর একটানা ঘুরে বুঝেছি তার অনেকটা হেঁয়ালি, বেশ কিছুটা শহুরে অজ্ঞ লোককে বোকা

বানানোর চটকদারী, কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক মানুষটিকে ঘা দিতে পারলে বেরিয়ে আসে চাহিদার অতিরিক্ত রসদ। এ জন্যে শিখতে হয় তাদের সাংকেতিক ভাষা। জানতে হয় লোকধর্মে 'দীক্ষা' আর 'শিক্ষা' আলাদা জিনিস। কাউকে তার নিজস্ব ধর্মমত বলাতে গেলে 'আপনি কি বাউল ?' 'আপনি কি ফকির ?'—এভাবে জিজ্ঞেস না ক'রে বলতে হয় 'আপনার কি সতীমার ঘর না দীনদয়ালের ?' বা 'আপনি কি পাটুলী স্রোতের ?' সঙ্গে সঙ্গে উদাসীনের চোখে খেলে যাবে সুপরিচয়ের ঝলক। একবার এক বাউল আমাকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করেছিল : মাটির কাজ বোঝো ?

আমি বলেছিলাম : হ্যাঁ। নালের কাজও বুঝি।

আমার দ্বিতীয় কথাটিতে কাজ হল খুব। তখন বাউল আরো অনেক কথা আমাকে জানিয়ে দিল।

লোকধর্মের গুপ্ত ঘরানা, তার মানে, আলাদা কতকগুলি 'বন্দিশ' আছে। তার কেতা সহবৎ না জানা থাকলে ওস্তাদ মুখ খুলবেন না। লোকধর্মের 'আস্‌লী চীজ' সংগ্রহ করা কঠিন, আবার সময় বিশেযে খুব সহজ। আমার এমন একটা অভিজ্ঞতাব কথা বলি। আমি তখন মারফতী ফকিরদের মূল রহস্যগুলো বুঝতে চেষ্টা কবছিলাম।

সেবার শেওড়াতলার মেলায় প্রায় নিশিরাতে দুই ফকিরের তত্ত্ব আলোচনা শুনছিলাম। অম্বুবাচীর ক্ষান্তবর্ষণ রাত। জাহান ফকির আর শুকুর আলি কথা বলছিলেন। আমি চুপ ক'রে শুনছিলাম। পরে দিনের আলো ফুটতে জাহান ফকিরেব সঙ্গে আলাপ হল। বাড়ি বর্ধমানের,সাতগেছিয়ায়। লেখাপড়ার হিসাবে প্রায় মূর্খ। একেবারে গরীব। পোশাক-আশাক আলখাল্লা তেমনই মলিন। কিছুতেই আমার কাছে মন খুলবে না। কেবল ধানাই পানাই। শেষকালে চটিয়ে দেবার জন্যে বলে বসলাম : আপনারা তো বেশরা। শরীয়ত একেবারে বাদ দিয়ে, ভুলে গেলে, তবে কি মারফতী কবুল হবে ?

মুখচোখ প্রথমে ব্যথায় ভরে উঠল। তারপর হঠাৎ সত্যের ঝিলিকের মতো আলো খেলে গেল মুখে। আস্তে আস্তে জাহান বললেন : আপনি পণ্ডিত লোক, এসব কি বলছেন ? শরীয়ত ভুলে মারফৎ ! আচ্ছা বাবু, আপনি তো প্রথমে বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ পড়েছেন, তারপরে তো দ্বিতীয়ভাগ ? তাহলে কি আপনি প্রথমভাগ ভুলে গেছেন ?

বিদ্যুচ্চমকের মতো কথা এবং লেখাপড়া বিষয়ে মূর্খ লোকের মুখে ! আমি অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রইলাম। চকিতে বুঝলাম শরীয়ত হল means আর মারফৎ হল end। সাহস পেয়ে বললাম : আপনারা শাস্ত্র মানেন না বুঝলাম।

জাতি মানেন না কেন ? তার যুক্তি কি ?

খুব ধীর কণ্ঠে গুণগুণ ক'রে জাহান গাইতে লাগলেন :

বামুন বলে ভিন্ন জাতি
সৃষ্টি কি করেন প্রকৃতি ?
তবে কেন জাতির বজ্জাতি করো এখন ভাই ॥
বল্লাল সেন শয়তানী দাগায়
গোত্র জাত সৃষ্টি ক'রে যায়
বেদান্তে আছে কোথায় আমরা দেখি নাই ॥

বেশ ভালো লাগল। মন ভরে উঠল। জাহান যেন বেশ মেজাজ পেয়ে বলে যেতে লাগলেন আপনমনে : শাস্তর মানুষ তৈরি করেছে। জাতও মানুষ তৈরি করেছে। হিন্দুদের মধ্যে বামুন কায়েত, মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ খোন্দকার এসব বড় রটালে কে ? আমাদের দুদ্দুর গানে বলে :

অজ্ঞ মানুষে জাতি বানিয়ে
আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বজাতি খুঁজিয়ে ॥
শিয়াল কুকুর পশু যারা
এক জাতি এক গোত্র তারা
মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে ॥

সেই জন্যেই আমরা সত্যিকারের মানুষ খুঁজি। সে মানুষ বৈধিকে নেই, শরায় নেই, শালগ্রাম শিলায় নেই। নোড়ায় নেই, মন্দিরে মসজিদে নেই। যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।

আমি বললাম : তাহলে উচ্চবর্ণ বাতিল ? শাস্ত্র কোরান খারিজ ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের কাছে বাতিল। আপনারা থাকুন আপনাদের জাতিত্ব নিয়ে, শাস্তর আউড়ে, মৌলবী আর বামুনের বিধান মেনে। আমরা জাতি মানিনে। আমরা বিশ্বাস করি সাধারণ মানুষের মধ্যে, দীনদরিদ্রের মধ্যে আছেন দীনবন্ধু। শুনুন এই গান :

ছোট বলে ত্যাজো কারে ভাই
হয়তো ওর রূপে এলেন ব্রজের কানাই।
শূদ্র চাঁড়াল বাগদী বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ
কালের খাতায় হইবে বিলীন দেখছি রে তাই ॥

এ গানের ভবিষ্যৎ-বাণী আজকে প্রায় সত্য। শূদ্র চাঁড়াল বাগদী বলার দিন সত্যিই শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু এসব গানে যে প্রতিবাদ, যে রুখে দাঁড়ানো, তার মধ্যেও একটা জাতিত্বের নেশা আছে।

বেদ কোরান পুরাণ ব্রাহ্মণ মৌলবী মন্দির মসজিদ বৈধী সাধনা সবকিছু খারিজ করতে করতে আঠারো শতকের শেষদিকে আমাদের এই বাংলায় যত উপধর্ম জেগে উঠেছিল তার তালিকা বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর। 'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' বইয়ে উদ্ধৃত সেই তালিকা এই রকম : বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, সাধ্বিনী পন্থী, সহজিয়া, খুশিবিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, রামসাধনীয়া, জগবন্ধু-ভজনীয়া, দাদুপন্থী, রুইদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী, মীরাবাঈ, বিষ্বলভক্ত, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়িক বা রূপ কবিরাজী, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পণারায়ণী, বড়ী, অতি বড়ী, রাধাবল্লভী, সখিভাবুকী, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, সাধনপন্থী চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা, আখড়া, দুয়ারা, কামধেন্বী, মটুকধারী, সংযোগী, বার সম্প্রদায়, মহাপুরুষীয় ধর্মসম্প্রদায়ী, জগমোহনী, হরিবোলা, রাতভিখারী, বিন্দুধারী, অনন্তকুলী, সৎকুলী, যোগী, গুরুদাসী বৈষ্ণব, খণ্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, নিহঙ্গ বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়গল, নস্করী, চতুর্ভুজী, ফারারী, বাণশয়ী, পঞ্চধুনী, বৈষ্ণব তপস্বী, আগরী, মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিযাদাসী, বুনিয়াদদাসী, অহমদ্‌পন্থী, বীজমার্গী, অবধূতী, ভিঙ্গল, মানভাবী, কিশোরীভজনী, কুলিগায়েল, টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব, জোন্নী, শার্ভল্মী, নরেশপন্থী, দশামার্গী, পাঙ্গুল, বেউড়দাসী, ফকিরদাসী, কুম্ভপাতিয়া, খোজা, গৌরবাদী, বামে কৌপীনে, কপীন্দ্র পরিবার, কৌপীনছাড়া, চূড়াধারী, কবীরপন্থী, খাকী ও মুলুকদাসী।

এত উপধর্ম সম্প্রদায় ছিল এদেশে ? তারা গেল কোথায় ? সম্ভবত উনিশ শতকের হিন্দু ও মুসলিম সংস্কার আন্দোলন, মিশনারীদের প্রচার, ব্রাহ্মধর্মের উত্থান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণদের জীবন সাধনা এমন প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে যে এইসব উপসম্প্রদায়ী পিছোতে পিছোতে গ্রামের প্রত্যন্তে লুকিয়ে পড়ে। একদিকে উচ্চ ধর্মাদর্শ আরেকদিকে কট্টর মুসলমানদের সক্রিয় দমননীতি বাউল ফকিরদের ধ্বংস ক'রে দিল অনেকটা। শ্রীরামকৃষ্ণ তো এসব লোকায়ত ধর্মসাধনাকে সরাসরি অভিযুক্ত ক'রে বললেন : বাড়িতে ঢোকার দু'টো পথ—সদরের খোলা দরজা আর পায়খানা দিয়ে ঢোকা। সদর দিয়ে ঢোকাই ভালো, পায়খানা দিয়ে ঢুকলে গায়ে নোংরা লাগা স্বাভাবিক। তাঁর মতে কামিনীকাঞ্চনের সাধনা বিপজ্জনক।

শ্রীসদগুরুসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডে ১২৯৭ সালের ডাইরিতে বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন :

> 'বাউল সম্প্রদায়ের অনেকস্থলে বড়ই জঘন্য ব্যাপার ! তা আর মুখে আনা যায় না। ভাল ভাল লোকও বাউলদের মধ্যে আছেন। তাঁরা সব চন্দ্রসিদ্ধি করেন। শুক্র চান্, শনি চান্, গরল চান্, উন্মাদ চান্, এই চার চান্ সিদ্ধি হলেই মনে করেন সমস্ত হ'লো।...আমি বললাম "ওটি আমি পারব না। বিষ্ঠামূত্র খেয়ে যে ধর্ম্ম লাভ হয়, তা আমি চাই না।" মহান্ত খুব রেগে উঠে বললেন, "এতকাল তুমি আমাদের সম্প্রদায়ে থেকে আমাদের সব জেনে নিলে, আর এখন বলছো সাধন করব না। তোমাকে ওসব করতেই হবে।" আমি বললাম, "তা কখনই করব না।" মহান্ত শুনে গালি দিতে দিতে আমাকে মারতে এলেন : শিষ্যরাও "মার্ মার্" শব্দ ক'রে এসে পড়ল। আমি তখন খুব ধমক দিয়ে বললাম, "বটে এতদূর আস্পর্ধা, মারবে ? জানো আমি কে ? আমি শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের গোস্বামী, আমাকে বলছো বিষ্ঠামূত্র খেতে ?" আমার ধমক খেয়ে সকলে চমকে গেল।'

উচ্চস্তরের হিন্দু সাধকদের এই সব প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ নানাধরনের উপধর্মের লোকদেব যতটা কমজোরী ক'রে দিয়েছিল তার চতুর্গুণ লড়াই হয়েছিল ফকির দরবেশদের সঙ্গে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের। বাংলার সামাজিক ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরা এসব ঘটনা, কেন জানি না, এড়িয়ে গেছেন।

হিসেব নিলে দেখা যাবে শেষ আঠারো শতকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিপুল পরিমাণ শূদ্র ও গরীব মুসলমান বাউল বা ফকিরী ধর্মে দীক্ষা নিয়ে বৃহত্তর হিন্দু ও মুসলিম সমাজ ত্যাগ করতে থাকে। দেখা যায়, বাউল ফকিরদের মধ্যে মুসলমান ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। লালন শাহ থেকে আরম্ভ ক'রে বহুসংখ্যক উদাসীন ধর্মগুরু তাঁদের সৎ জীবনযাপন, অসাম্প্রদায়িক আদর্শপ্রচার এবং সমন্বয়বাদী চিন্তাধারায় বহু সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ ক'রে নেন তাঁদের উপধর্মে। এতে বৃহত্তর হিন্দু মুসলমান ধর্ম, বিশেষ ক'রে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সমাজ এবং কট্টর ইসলামী সমাজ খুব বড় রকমের অর্থনীতিক ও সামাজিক ধাক্কা খায়। স্বভাবত প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া জাগে। 'পাষণ্ড দলন' জাতীয় বৈষ্ণবীয় বুকলেট বেরোয় অজস্র, যাতে কর্তাভজা ও অন্যান্য উপসম্প্রদায়দের আক্রমণ করা হয় 'অনাচারী', 'ভ্রষ্ট', 'নিষিদ্ধাচারী' আখ্যা দিয়ে, তাদের নারীভজন ও সহজিয়া সাধনতত্ত্বকে অপব্যাখ্যা ক'রে। উনিশ শতকে দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালীতে

গালমন্দ করলেন এসব সম্প্রদায়কে, কলকাতায় জেলেপাড়ার সং বেরলো কর্তাভজাদের ব্যঙ্গ ক'রে।

শাস্ত্রবিরোধী বাউলদের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম শুরু হল উনিশ শতকে নদীয়া যশোহর ও উত্তরবঙ্গের শরীয়তী মুসলমানদের সঙ্গে। বাউলদের অন্যান্য আচরণের, যেমন চারিচন্দ্রের সাধনা, ঘৃণ্যতার বিবরণ দিয়ে শরীয়তবাদীরা বেশি জোর দিলেন বাউলদের গান গাওয়ার বিরুদ্ধে। ইসলাম ধর্মের একদল ব্যাখ্যাকারী জানালেন, ইসলামে গান গাওয়া জায়েজ নয়। বাউলদের গানের আসরে তাঁরা দাঙ্গা বাধালেন। আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশে বাউলদের উপর নানারকম দৈহিক নিপীড়ন শুরু হল এবং প্রায়শ তাদের ঝুঁটি কেটে নেওয়া হতে লাগল।* ভয়ে বাউলরা আত্মগোপন করল বা বহির্বাস ত্যাগ করল। এই সময়কার ওহাবী, ফারায়জী ও আহলে হাদীস আন্দোলন মুসলমান বাউলদের খুব ক্ষতি কবল। তাদেব জোব ক'বে শবীযতমতে ফেরানো হতে লাগল। বহু মুসলমান সংস্কারক এই সময় বাউলদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী ক'রে লড়াইয়ে নামলেন। সে সমযকাব কিছু লেখকেব রচনায় বাউলফকির-বিরোধী ভাষ্য চোখে পড়ে। যেমন মীর মশাব্‌রফ হোসেন লিখেছেন :

ঠ্যাটা গুরু ঝুটা পীর
বালা হাতে নেড়ার ফকীর
এবা আসল শয়তান কাফের বেইমান।

লোককবি জোনাবালী হুংকার দিয়ে লেখেন :

লাঠি মারো মাথে দাগাবাজ ফকীরের।

রংপুরের মৌলানা রেয়াজউদ্দীন আহমদের লেখা 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' বইটি কট্টর মুসলিম সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তার দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখেছেন : 'এই বাউল বা ন্যাড়া মত মোছলমান হইতে দূরীভূত করার জন্য বঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক গ্রাম, মহল্যা জুমা ও জমাতে এক একটি কমিটি স্থির করিয়া যতদিন পর্যন্ত বঙ্গের কোন স্থানেও একটি বাউল বা ন্যাড়া মোছলমান নামে পরিচয় দিয়া মোছলমানের দরবেশ ফকীর বলিয়া দাবী করিতে থাকিবে ততদিন ঐ কমিটি অতি তেজ ও তীব্রভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। মোট কথা মোছলমানগণের কর্ত্তব্য এই যে মোছলমান সমাজকে বাউল ন্যাড়া মত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না করা পর্যন্ত

বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে।'

এমন বিবরণ প্রচুর মেলে। বাউল ফকিরদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও অপপ্রচার উনিশ শতকের সীমান্ত পেরিয়ে বিশ শতকেও ব্যপ্ত হয়েছে। 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' বই থেকে জানা যায় অবিভক্ত বাংলায় ষাট-সত্তর লক্ষ বাউল ছিল। উৎপীড়ন ও অত্যাচারে তারা সম্প্রদায়গতভাবে শীর্ণ ও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। লিখিত প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে মওলানা আফছার উদ্দীনের নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়া আশ্রমে সমবেত লালনপন্থী সমস্ত বাউলদের চুলের ঝুঁটি কেটে নেয়।

তবে সব মুসলমান বাউল-বিরোধী ছিলেন এমন ভাবারও কারণ নেই। ১৯২৭-এ ফরিদপুরে মুসলিম ছাত্র সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে মুক্তবুদ্ধি মনীষী কাজী আবদুল ওদুদ বলেন : 'ইসলাম কিভাবে বাঙালীর জীবনে সার্থকতা লাভ করবে, তার সন্ধান যতটুকু পাওয়া যাবে বাংলার এই মারফৎ-পন্থীর কাছে ততটুকুও পাওয়া যাবে না বাংলার মওলানার কাছে, কেননা, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মারফৎ-পন্থীর ভিতরে রয়েছে কিছু জীবন্ত ধর্ম, সৃষ্টির বেদনা, পরিবেষ্টনের বুকে সে এক উদ্ভব ; আর মওলানা শুধু অনুকারক, অনাস্বাদিত পুঁথির ভাণ্ডারী—সম্পর্কশূন্য ছন্দোহীন তাঁর জীবন।

> 'এই মারফৎ-পন্থীর বিরুদ্ধে আমাদের আলেম-সম্প্রদায় তাঁদের শক্তিপ্রয়োগ করেছেন, আপনারা জানেন।...আলেমদের এই শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে কথা বলবার সব চাইতে বড় প্রয়োজন এইখানে যে সাধনার দ্বারা সাধনাকে জয় করবার চেষ্টা তাঁরা করেননি, তার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে লাঠির জোরে তাঁরা দাবিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ দেশে মারফৎ-পন্থীদের সাধনার পরিবর্তে যদি একটি বৃহত্তর পূর্ণতর সাধনার সঙ্গে বাংলার যোগসাধনের চেষ্টা আমাদের আলেমদের ভিতরে সত্য হ'তো, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে শুধু বাউল ধ্বংস আর নাসারা দলন ফতোয়াই পেতাম না।'

প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই দলন পীড়ন বাউল-দরবেশ-ফকিরদের দুর্বল ও দলছুট ক'রে দিলেও একেবারে লুপ্ত ক'রে দিতে পারে নি। কারণ নিচুসমাজের মানুষ অসাম্প্রদায়িকভাবে গ্রাম্যসমাজে সহজে মিলতে মিশতে পারে। খোঁজ করলে দেখা যাবে অখণ্ড বাংলায় যত উপধর্ম সম্প্রদায় গজিয়ে উঠেছিল তাদের বেশির ভাগ প্রবর্তক একজন মুসলমান অথবা হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে। কর্তাভজাদের স্রষ্টা আউলেচাঁদ একজন মুসলমান আর তাঁর প্রধান শিষ্য রামশরণ

পাল একজন সদ্‌গোপ। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক একজন মুসলমান উদাসীন এবং এ ধর্মের প্রধান সংগঠক চরণ পাল জাতে গোয়ালা।

আসলে বাংলার লৌকিক উপধর্মগুলির ভিত্তিতে আছে তিনটি প্রবর্তনা—মুসলমান বাউল ফকির দরবেশদের প্রত্যক্ষ প্রভাব, শোষিত শূদ্রবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবিরোধ এবং লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের উদার আহ্বান। এই শেষ বিষয়টির একটি সামাজিক ব্যাখ্যা দরকার।

শ্রীচৈতন্য আমাদের দেশে এসেছিলেন এক সময়োচিত ভূমিকায় পরিত্রাতার রূপে। তখন ষোড়শ শতকে শাসক মুসলমানের ব্যাপক হিন্দু ধর্মান্তকরণ রুখতে এবং শূদ্রবর্ণেব উপর শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ঠেকাতে তিনি এক উদাব সমন্বয়বাদী বৈষ্ণব ধর্মের পরিকল্পনা নেন। তাঁর ধর্মসাধনেব সবলতম পন্থা ছিল 'হর্রেনামৈব কেবলম্‌'। এক বিপুল জনসন্নিবেশ বৈষ্ণব ধর্মকে বেগবান ক'রে তোলে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরেই বৈষ্ণবধর্মে ভেদবাদ জেগে ওঠে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সংস্কৃতে শাস্ত্রবই লিখে চৈতন্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বেশি মনোযোগী হলেন। তাঁর লোকশিক্ষা আর সাধারণ মানুষের সংরক্ষণের দিকটি হল উপেক্ষিত। সাধারণ বৈষ্ণব মানুষ আর তাদেব মুক্তিদূত শ্রীচৈতন্যের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো রাশি রাশি শাস্ত্র আর পুঁথি। অসহায় শূদ্ররা তখন ভ্রষ্টাচারে মগ্ন হল। সেই সংকটকালে নিত্যানন্দের ছেলে বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র আরেকবাব নেতা আর ত্রাতারূপে দেখা দিলেন। পলাতক ভ্রষ্টাচারী বৌদ্ধ সহজিয়া, মিথুন সাধক মূর্খ তান্ত্রিক আর অজ্ঞ মুমুক্ষু মানুষদের বীরভদ্র আবার বৈষ্ণব কবলেন। এবারকার বৈষ্ণবায়নে এল নানা লৌকিক গুহ্য সাধনা, নিঃশ্বাসের ক্রিয়া ও গোপন জপতপ। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল নতুন নতুন আখড়া ও শ্রীপাট। গঙ্গার ধারে ধারে পাটুলী কাটোয়া অগ্রদ্বীপ ধরে আস্তানা পাতল সহজিয়া বৈষ্ণবরা। বীরচন্দ্রকে তারা দেখল চৈতন্যের অবতার রূপে। নতুন নেতার জয়ধ্বনি দিয়ে তারা ঘোষণা করল নতুন বাণী :

> বীরচন্দ্ররূপে পুনঃ গৌর অবতার।
> যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক একবার॥

কালক্রমে লোকগুরুরা গীতার 'যদাযদাহি ধর্মস্য' শ্লোকটি সামনে রেখে এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ বানিয়ে ফেললেন যাতে নির্জিত শোষিত মানুষরা বিশ্বাস ক'রে নিল কৃষ্ণের অবতার গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গের অবতার বীরচন্দ্র। এই সূত্র অনুসরণ ক'রে আমরা সকৌতুহলে দেখতে পাই কর্তাভজা ধর্মের প্রথম দিকের ঘোষণা ছিল : 'কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র আউলেচন্দ্র/ তিনেই এক একেই তিন'। তার মানে

বীরচন্দ্র সরে গিয়ে এলেন আউলেচন্দ্র। তৈরি হল এক বৈষ্ণববিশ্বাসী নতুন উপধর্ম। অচিরে সেই উপধর্ম কর্তাভজাদের নেতৃত্বে এলেন দুলালচন্দ্র পাল, যাঁর মার (মূল নাম সরস্বতী) নতুন নামকরণ হল সতী মা। সতী মা নামে শচী মা ধ্বনির আভাস তো স্পষ্ট। এর গায়ে গায়ে তৈরি হল নতুন উচ্চারণ :

তিন এক রূপ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীদুলালচন্দ্র
এই তিননাম বিগ্রহস্বরূপ ॥

কেমন সুপরিকল্পিতভাবে আউলেচন্দ্রকে সরিয়ে দুলালচন্দ্র লোকমানসে আসন পাতলেন।

একশো বছর আগে অক্ষয়চন্দ্র দত্ত যখন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইটি লেখেন তখন বাংলার বিভিন্ন উপধর্মের হদিশ দেন এবং একটা মোটামুটি প্রতিবেদন খাড়া করেন। মুশকিল যে, অক্ষয়কুমার নিজে সরেজমিন খুঁজে পেতে ঘুরে প্রতিবেদন লেখেন নি। মোটামুটি খবর এর-তার কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে লিখেছিলেন। তাতে ভুল আছে, খণ্ডতা আছে। বরং অনেকটা ঘুরে বিবরণ লিখেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর *Hindu Castes and Sects* বই লেখার সময়। মেহেরপুরের বলরামী সম্প্রদায়ের বিবরণ অক্ষয়কুমার নিতান্ত রৈখিকভাবে দিয়েছেন, অথচ বিদ্যাভূষণ স্বয়ং মেহেরপুরে গিয়ে বলরামের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে তবে লেখেন।

ষাটের দশকের শেষে আমি যখন উপধর্ম সম্পর্কে খোঁজ করতে শুরু করি তখন বিদ্যাভূষণের পদ্ধতিই শ্রেয়তর মনে হল। এ লেখার পববর্তী অংশ সেই পায়ে-হাঁটা, চোখে-দেখা আর কানে-শোনার সত্য বিবরণ। এতে আছে লৌকিক উপধর্মের সেই পরাক্রান্ততা, সভ্যতা-রাজনীতি-বিজ্ঞান-শাস্ত্র-নিপীড়ন যাকে আজও মারতে পারে নি।

●

'সাহেবধনী' কথাটা কোনোদিন শুনি নি। এই বিশাল ভূগোলে বৃত্তিহুদা বলে একটা গ্রাম আছে, এ ব্যাপারটাও ছিল অজানা। মফঃস্বলের এক কাগজে একজনের ধারাবাহিক লেখা পড়ে জানতে পারি নদীয়ায় গত শতকে কুবির সরকার বলে এক বড় লোকগীতিকার ছিলেন। নিবন্ধে ব্যবহৃত তাঁর গানের উদ্ধৃতি দেখে মনে হল কুবিরের গান সংগ্রহযোগ্য। চিঠিতে যোগাযোগ ক'রে

একদিন হাজির হলাম নদীয়ার চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে। সেখানেই রামপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে স্বচক্ষে দেখলাম তাঁর ঠাকুর্দা রামলাল ঘোষের অনুলিখনে কুবির গোঁসাইয়ের ১২০৩ খানা গান। পরে তাঁরা উৎসাহ ক'রে দেখালেন কুবির গোঁসাইয়ের সমাধি মন্দির, সেখানে তাঁর স্ত্রী ভগবতী আর সাধনসঙ্গিনী কৃষ্ণমোহিনীর সমাধিও রয়েছে। উঁকি মেরে কুবিরের সমাধি ঘরে দেখলাম একটি মাটির ঢিবি, একটি সজ্জিত চৌকি ও বিছানা, ফুলের সাজি, ফকিরী দণ্ড, বাঁকা লাঠি, ত্রিশূল, খড়ম আর কাঠের পিঁড়ি।

: 'এ সব তেনার ব্যবহার করা জিনিস', বললে গোপালদাস। এখনকার সেবাইৎ। কুবিরের অধস্তন চতুর্থ স্তরের বংশধর।

কখনো সহজিয়া বৈষ্ণবদের সমাধি তো দেখিনি। কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম : মাটির ঐ উঁচু ঢিবিটা কেন ?

: ঐখানে রয়েছে তেনার মাথা। জানেন তো আমাদের সমাধি হয় মাটি খুঁড়ে তাতে শরীরকে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসিয়ে।

আরো জানা গেল, ঐ রামলালের খাতা থেকেই, যে কুবিরের জন্ম ১১৯৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, মৃত্যু ১২৮৬-র ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত চারদণ্ডে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথির মধ্যে। এবারে তাঁরা দেখালেন কুবিরের গুরু চরণ পালের ভিটে। সবই দেখা হল। শুধু বোঝা গেল না ১২০৩ খানা গানের লেখক কুবির গোঁসাইয়ের নাম কেন সর্বসাধারণের কাছে এতটা অজ্ঞাত। বাড়ি ফিরে বিদ্যুচ্চমকের মতো দু'টো ব্যাপার চোখের সামনে ধরা পড়ল কয়েক মাসের মধ্যে। প্রথমত, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়তে পড়তে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম প্রসিদ্ধ গান 'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন' কুবিরের লেখা। দ্বিতীয়ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০) পড়ার সময় চোখ পড়ল 'সাহেবধনী' সম্প্রদায় সম্পর্কে। এই সম্প্রদায়ের স্রষ্টা দুঃখীরাম পাল। তাঁর পুত্র 'চরণ পাল এই সম্প্রদায়ের মত বিশেষরূপে প্রচার করিয়া অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন।...কিছুদিন হইল চরণ পালের মৃত্যু হইয়াছে।'

আরো দুয়েকবার নিজে নিজে বৃত্তিহুদা গ্রামে ঘুরে বুঝলাম জলাঙ্গী নদীর পশ্চিম পাড়ে দোগাছিয়া গ্রাম, পুবে বৃত্তিহুদা। চরণের পিতা ছিলেন দোগাছিয়ার মানুষ। জনৈক উদাসীনের কাছে তিনি দীক্ষা নেন এবং গড়ে ওঠে সাহেবধনী ধর্মমত। তাঁর ছেলে চরণ পাল দোগাছিয়া থেকে বাস্তু তুলে আনেন পরপারে বৃত্তিহুদায়। এখানেই সাহেবধনীদের সাধনপীঠ আর আসন। চরণের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কুবের সরকার, জাতে যুগী, পেশায় কবিদার। চরণের কাছে দীক্ষা নিয়ে কুবের হলেন গোঁসাই, বনে গেলেন তাত্ত্বিক গীতিকার। আর নদীয়ার

নিজস্ব স্বরসংগতির নিয়মে কুবেরের উচ্চারণ হল কুবির। একজন গায়ক কুবিরের গান শোনালেন। সযত্নে টুকে নিলাম :

ওরে বৃন্দাবন হ'তে বড় শ্রীপাট হুদা গ্রাম
যথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম ॥
হোরি নীলাচলে যেমন লীলে
এখানে তার অধিক লীলে
হিন্দু যবন সবাই মিলে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম ॥
দ্যাখো গোঁসাই চরণচাঁদ আমার
বসিয়েছে চাঁদের বাজার
ভক্তবৃন্দ আসছে যাচ্ছে অবিশ্রাম ॥
আমার চরণচাঁদের নামের জোরে
কত দুখী তাপী পাপী তরে
হাঁপ কাশি শূল গুড়ুম ব্যথা
মহাব্যাধি হয় আরাম ॥

গানের শেষ স্তবক বেশ লক্ষণীয়। চরণ পালের তাহলে ভেষজবিদ্যায় বেশ হাতযশ ছিল। সাহেবধনী মতে হিন্দু যবন যে সমান মর্যাদায় রয়েছে তা বুঝতে দেরি হল না। পরিসংখ্যান ঘেঁটে আদমসুমারি মাফিক এইরকম বিবরণ তৈরি করা গেল—

গ্রামের নাম : বৃত্তিহুদা। থানা : চাপড়া। জেলা : নদীয়া। অবস্থান : কৃষ্ণনগর সহর থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পূর্বে।. মৌজা নং ২৯। অধিবাসীদের জীবিকা : কৃষিকর্ম, ব্যবসায় ও শিক্ষকতা। মোট জনসংখ্যা ৩৪৫০ জন। মুসলমান ৫২৫ ঘর। ঘোষ ৬০ ঘর। কর্মকার ৮ ঘর। দাস ৪০ ঘর। প্রামাণিক ৬ ঘর। গড়াই ১০ ঘর। সূত্রধর ১ ঘর।

যে গ্রামে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সেখানে বৈষ্ণব সহজিয়াকেন্দ্রিক একটা উপধর্ম কীভাবে টিকে আছে বিপুল গৌরবে তা জানতে ইচ্ছে হল। গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্টার দ্বিজপদ প্রামাণিক বললেন বৈশাখী পূর্ণিমায় আসতে। ঐ দিন চরণ পালের ভিটের মহোৎসব হবে।

গেলাম সেই মহোৎসবে। দেখলাম বৃত্তিহুদা আর আশপাশের অনেক ক'টা গ্রামের মানুষ বিপুল উৎসাহে মেতে উঠেছে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে। তবে উচ্চবর্ণের কেউ যে নেই সেটাও চাক্ষুষ হল। সন্ধের পর সারারাত চলল

শব্দগানের আসর। লালনের 'দৈন্যতা'র গানের জবাবে কুবিরের 'প্রবর্ত' গান অনেকগুলি শোনার সুযোগ হল। দেখলাম কুবিরের গান বেশিরভাগ গাইছে মুসলমান ফকির। জহরালি আর ছামেদ আলি। লোকে গানের ফাঁকে ফাঁকে হুংকার দিয়ে উঠছে: 'জয় দীনদয়াল জয় দীনবন্ধু।'

আমি ভাবছি লোকগুলো বুঝি হরিধ্বনি দিচ্ছে। দ্বিজপদ বাবু ভুল ভাঙিয়ে জানালেন, 'সাহেবধনীদের উপাস্যের নাম দীনদয়াল। এদের সম্প্রদায়কে বলে দীনদয়ালের ঘর। কখনো কখনো দীনদয়ালকে এরা দীনবন্ধুও বলে। এটা ওদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ।'

তাহলে সেদিন কুবিরের গানে যে শুনেছিলাম 'ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট হুদাগ্রাম/যেথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম'—সে তাহলে এই দীনদয়াল-দীনবন্ধু। ক্রমে জানা গেল দীনদয়ালের ঘরে হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান সমান। মচ্ছবের সময় দেখলাম যে হিন্দুকে পরিবেশন করছে মুসলমান, মুসলমানকে হিন্দু। আসলে গেরুয়া বা কোনো বর্হিবাস তো পরে না। গৃহী ধর্ম। যে কেউ নিতে পারে। আমাদের শাদা চোখে যাকে হিন্দু বা মুসলমান ভাবছি তারা কিন্তু এখানে বর্ণ হিন্দু বা শরীয়তী মুসলিম নয়। সকলেই সাহেবধনী। ততক্ষণে জহরালি নেচে নেচে গাইছে:

এই ব্রজধামের কর্তা যিনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী।
রাইধনী এই সাহেবধনী ॥

আশ্চর্য তো! ব্রজের রাইকে এরা সাহেবধনী বানিয়েছে। তার মানে এরা নারীভজা সম্প্রদায়। এদিকে ছামেদ আলি গান ধরেছে:

একের সৃষ্টি সব নারি পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপনসুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।

এ সবই নাকি কুবিরের গান। আশ্চর্য সমন্বয়বাদের গান। এ গানের মূল তো দেখতেই হবে।

পাশ থেকে ধারাবিবরণীর মতো দ্বিজপদ মাস্টারমশাই বলে যাচ্ছেন: চরণ পালের প্রধান শিষ্য ছিলেন তিনজন। রুকুনপুরের প্রহ্লাদ গোঁসাই, বামুনপুকুরের রামচন্দ্র গোঁসাই আর এই হুদোর কুবির গোঁসাই। এদের মধ্যে গান লিখেছে শুধু কুবির। আহা কী গান!

জানতে চাইলাম : কুবিরের গানের শিষ্য নেই ?

: সেকী ? আপনি যাদুবিন্দুর গান শোনেন নি ? এখুনি শুনিয়ে দিচ্ছি। মস্ত বড় ভাবের কবি। কুবিরের প্রধান শিষ্য যাদুবিন্দু গোঁসাই। বাড়ি ছিল বর্ধমানের পাঁচলখি গ্রাম। সে বাড়ি এখনো আছে। ঐ দেখুন যাদুবিন্দুর দৌহিত্রের ছেলে দেবেন গোঁসাই। ও দেবেন, বলি এদিকে এসো।

বিনীত হেসে হাত জোড় ক'রে দেবেন গোঁসাই এসে দাঁড়ালেন। শীর্ণ চেহারায় টকটকে ফর্সা রং। বাবরি চুল। শাদা পাঞ্জাবি পরনে। জিজ্ঞেস করলাম : আপনাদের পাঁচলখি গ্রামটা কোথায় ?

: আজ্ঞে, নবদ্বীপের হিমায়েৎপুর মোড় থেকে বর্ধমান যাবার রাস্তা। সেই রাস্তায় নাদনঘাট ছাড়িয়ে ধাত্রীগ্রামের আগে নাদাই ব্রিজ। তারই গায়ে আমাদের পাঁচলখি। একদিন যাবেন তো ?

: কি দেখবো সেখানে ?

: যাদুবিন্দুর সমাধি আছে আর তাঁর গানের খাতা। শত শত গান।

দ্বিজপদ বললেন : ওহে দেবেন্দ্র, গোপালের মাকে ডাকো তো। এঁকে একখানা যাদুবিন্দুর গান শোনাবো।

দেবেন্দ্র সেই ভিড়ে পথ খুঁজতে লাগলেন। দ্বিজপদবাবুকে সেই ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : যাদুবিন্দু আবার কীরকম নাম ? যাদবেন্দ্রের স্বরসঙ্গতি নাকি ?

: আরে না না, যাদু আর তার সাধনসঙ্গিনী বিন্দু, এই দুইয়ে মিলিয়ে যাদুবিন্দু। ঐ একখানা গানে আছে শুনেছেন, 'সর্বচরণে পাপীর এই নিবেদন' তার মধ্যে আছে, 'যাদু বিন্দু এরাই দুজনা/ পাঁচলখি গাঁয় তার ঠিকানা'। এবারে বুঝলেন তো যাদুবিন্দু নামরহস্য ?

ইতিমধ্যে এসে গেল গোপালের মা। মধ্যবয়সী বিধবা। খুব লজ্জা পেয়ে গেছেন। 'আমি কী গান করবো বলো দিনি বাবা ? আমার কি আর সে গানের গলা আছে ?'

দ্বিজপদ বললেন, 'যা আছে ওতেই চলবে, নাও ধরো'। আমাকে বললেন : কুবিরের পোষ্যপুত্র কেষ্টদাস। এ তারই ছেলের বিধবা। বুড়ির গলা খুব মিঠে। যাদুবিন্দুর সঙ্গে এর খুব ভাব ছিল। যাদুবিন্দুর অনেক গান এর জানা আছে।

গোপালের মা মধুর কণ্ঠে গান ধরল :

যে ভাবেতে রাখেন গোঁসাই সেই ভাবেতেই থাকি
অধিক আর বলবো কি ?
তুমি খাও তুমি খিলাও

তুমি দাও তুমি বিলাও
তোমার ভাবভঙ্গি বোঝা ঠকঠকি ॥
গুরু দুখ দিতে তুমি সুখ দিতেও তুমি
কুনাম গুনাম সুনাম বদনাম সবই তোমারই
ও কুল্ আলম্ তোমারই ও কুদরতবিহারী
তুমি কৃষ্ণ তুমিই কালী তুমি দিলবারি ॥
কখনও দুগ্ধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী
কখনও জোটে না ফ্যান আমানি
কখনও আ-লবণে কচুর শাক ভখি ॥
কহিছে বিন্দু যাদু তুমি চোর তুমিই সাধু
তুমি এই মুসলমান এই হিঁদু
তাই তোমারে কুবিবচাঁদ বলে ডাকি ॥

গানেব পরে গান। কখনো 'আমার কাদা মাখা সার হলো' কখনো 'যাসনে মন বাঁকানদীর বাঁকে'। গোপালের মা গেয়ে যায়। তার দু'চোখ ভরা জল।

সকলেব অলক্ষে গানের আসর থেকে আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ি। এবাবে চবণ পালের বাস্তুভিটার ভেতরে। আমাকে দেখতে পেয়ে চরণ পালের বংশেব তখনকাব কর্তা শরৎ ফকির নেমে আসেন—'আসুন আসুন, আপনার খবব পেইছি। ভেতরে উঠে আসুন, দীনদয়ালের আসন দেখবেন।'

একটা পুরানো পঙ্খের কাজ করা দালান। তার মধ্যে প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠ। বাইরে অন্তত একশো পুরুষ আর নারী ভক্ত মানসিক ক'রে হত্যে দিয়ে আভূমি প্রণত। প্রকোষ্ঠের ভেতরে টিমটিম ক'রে জ্বলছে প্রদীপ। অনেকক্ষণ ঠাওর ক'রে চোখে পড়ে একটা ত্রিশূল, চিমটে, পিঁড়ে আরো যেন কীসব।

'দণ্ডবত করুন', শরৎ ফকির কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বললেন, 'আমাদের বংশের বাইরে কেউ কখনো দীনদয়ালকে দেখে নি। আপনি সেই সুযোগ পেলেন।'

আবেগের তাৎক্ষণিকতায় চোখ বুঁজে গেল। ভাবলাম আমার মতো জ্ঞানপাপী অভাজনদের প্রতি এত কৃপা! শরতের চোখ অবনত। হাত বদ্ধমুষ্টি। তাতে ফকিরী দণ্ড। যেন প্রত্যাদেশের মতো বললেন : আমার সঙ্গে আসুন

তাঁর পেছন পেছন লণ্ঠনের আলোয় গিয়ে দাঁড়ালাম এজমালি বাড়ির বিরাট ছাদে। শূন্য খাঁ খাঁ ছাদ। বৈশাখী পূর্ণিমার আলোকিত রাত। শন শন হাওয়া বইছে। ফকির হাতে দিলেন পরমান্ন প্রসাদ। দীনদয়ালের নিশিভোগ। অমৃতের মতো লাগল।

ছাদের কার্নিশে বুক ঠেকিয়ে ফকির তাকালেন জ্যোৎস্নাজড়িত জলাঙ্গী নদীর জলের দিকে। চোখের দৃষ্টি সুদূর। বলতে লাগলেন : অনেকদিন থেকে আপনার মতো একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। লক্ষ করছি মাস কয়েক আপনি এ গাঁয়ে ঘুরছেন। কখনো আমার কাছে আসেন নি। রামপ্রসাদ, দ্বিজপদ মাস্টার এদের কাছে ঘুরছেন। কী আছে ওদের কাছে ? কুবিরের ক'খানা গান ? কি হবে সে গান নিয়ে ? গানের মর্ম কিছু বুঝবেন ? এ কি রেডিওর লোকগীতি ? কিসসু বুঝবেন না যতক্ষণ না সাহেবধনী ঘরের তত্ত্ব বোঝেন। আমার কাছে সেই তত্ত্ব, সেইসব মন্ত্রের খাতা আছে। চরণ পালের বস্তু। আপনাকে সব দেব।

বৈশাখের মধ্যরাতে এমন একটা আচম্বিত প্রাপ্তি একেবারেই ভাবনার মধ্যে ছিল না, তাই বিহ্বলতায় খানিকক্ষণ কথা বেরলো না। বেশ খানিক পরে শুধু বলতে পারলাম : আমাকে দিয়ে কী কাজ হবে আপনার ?

: আমার কাজ নয়, দীনদয়ালের কাজ। এ বাড়ি ভেঙে পড়ছে। দীনদয়ালের ঘরের ছাদ পড়ো-পড়ো। ভক্ত শিষ্যরা গরীব। আমার মন বলছে আপনাকে দিয়ে দীনদয়ালের প্রচার হবে। গভরমেণ্ট হয়ত দীনদয়ালের ঘর নতুন ক'রে বানিয়ে দিতে পারে।

: কিন্তু আপনাদের ধর্মমত তো গোপন। তার এত প্রচার কি ঠিক হবে ?

: সে কথা আমি অনেক ভেবেছি। কিন্তু আমি আর সেবাপূজা সামাল দিতে পারছি না। প্রত্যেক বেস্পতিবারের ভোগরাগ, নিত্যপূজার খরচ, অন্ন মচ্ছবের বিরাট ব্যাপার, আসুনে ফকিরদের সম্বৎসরের হুঁকো পাটি দেওয়া, এ কি আর সম্ভব হবে ? তাই ভাবছি আপনি যখন এসে গেছেন, আসলে দীনদয়াল আপনাকে পাঠিয়েছেন, তখন তাঁর কাজ তিনি করিয়ে নেবেন। চলুন, রাত হল। কাল দুপুরে আপনাকে সব দেব।

বাকি রাতটা কাটল দারুণ উত্তেজনায়। দ্বিজপদবাবুর বাইরের বারান্দায় শুয়ে ঘুম আর আসে না। কাউকে বলতেও পারছি না সামনের দিন আমি কি পেতে চলেছি। অবশেষে সকাল হল। আস্তে আস্তে সকালটা গড়িয়েও পড়ল। মচ্ছবের লোকজন দীনদয়ালের নাম করতে করতে যে যার বাড়িমুখো রওনা দিল। দুপুরে কথামতো হাজির হলাম শরৎ ফকিরের ভিটেয়। তিনি যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, 'এইমাত্র দীনদয়ালের ভোগ নিবেদন শেষ হল। আজ তো বিষ্যুদ্‌বার। আজকেই দীনদয়ালের বার। দীনদয়ালের সব আসনে আজ ভোগরাগ নিবেদন।'

আমি না জিজ্ঞেস ক'রে পারলাম না যে 'আসন' ব্যাপারটা কি ? 'আসুনে

ফকির' কথাটা, যা আগের রাতে শুনেছিলাম, তার মানেই বা কি ?

শরৎ ফকির বলে চললেন : আমাদের এখানেই দীনদয়ালের মূল আসন। কিন্তু আমাদের ঘরে যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সিদ্ধ তাদের বাড়িতেও আসন পাতার হুকুম দেওয়া আছে। কয়েক পুরুষ ধরে রয়েছে সে সব আসন। তারা দীক্ষা দেবারও অধিকারী। তাদের বলে আসুনে ফকির। চৈতী একাদশীতে অগ্রদ্বীপে আমাদের বারুণী মেলা হয়। ঐখানে চরণ পাল বাক্‌সিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই থেকে প্রত্যেক বছর অগ্রদ্বীপে দীনদয়ালের আসন পাতা হয়। আমি যাই। হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য আসে। তিনদিন আমাদের পুজো মালসা মচ্ছব হয়। আসুনে ফকিররা এক একটা গাছতলায় আসন পাতে। মন্ত্র দীক্ষা হয়। সামনের চোত মাসে আসুন। আমার সঙ্গে থাকবেন গাছতলায় তে-রাত্তির। কত কি দেখবেন, জানবেন। যাকগে, এবারে ভেতর বাড়িতে আসুন। আপনাকে কতকগুলো সামগ্রী দেব। কিন্তু কাউকে বলবেন না। অন্তত আমার জীবিতকালে নয়। কি, কথা দিলেন তো ?

নীরবে সম্মতি জানিয়ে তাঁকে অনুসরণ করি। বুকের মধ্যে টগবগে উত্তেজনা। বাড়ির একেবারে ভেতরের মহলে ছিল এক বিশাল সিন্দুক। বিরাট এক চাবি দিয়ে তা ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুললেন ফকির। ভেতরে হাত ডুবিয়ে লাল শালুতে মোড়া কী সব বেরলো। তাতে মাথা ঠেকিয়ে খুলে ফেললেন শালুর আবরণ। বেরলো কতকগুলি কালজীর্ণ পুঁথি আর খাতা। হলদে কাগজ। তাতে ভুষো কালির উজ্জ্বল হস্তাক্ষর। 'এইগুলোতে আমাদের ঘরের সব গুহ্য খবর আছে। আর এই নিন আসল পুঁথি।'

থরথর উত্তেজনায় হাতে নিলাম একটা পুঁথি। আদ্যন্ত লাল কালিতে লেখা সাহেবধনী ঘরের গুপ্তমন্ত্র আর সাধনরীতি।

ফকির বললেন : এই হল সাহেবধনী ঘরের সত্য মন্ত্র আর গুপ্তনাম। একজন মুসলমান নারী উদাসীন এ মন্ত্র আর আমাদের ঘরের শিক্ষা দেন। এগুলো আচরণমূলক। এর সমস্ত শিক্ষা পুরো জানতেন চরণ পাল। তাঁর ছেলে ছিলেন তিলক। তিলকের ছেলে ফটিক। ফটিকের চার ছেলে—রামভদ্র, বীরভদ্র, প্রাণভদ্র আর মনমোহন ভদ্র। সেই রামভদ্রের বড় ছেলে আমি। এসব খাতা পুঁথি শিক্ষা পাঁচপুরুষ পেরিয়ে আমার হাতে পড়েছে। খুব গুপ্ত সাধনা আমাদের। মাটির কার্য, নালের কার্য, করোয়া সাধন। এসব আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব। কুবিরের গানে আমাদের ঘরের তত্ত্বই ব্যাখ্যা করা আছে। তার বাইরের অর্থ আর ভেতরের কথা আলাদা।

আমি চোখ বোলাতে লাগলাম অদ্ভুত ভাষায় লেখা সেসব মন্ত্রে, বিড় বিড়

ক'রে পড়তে লাগলাম :

আল্লাতালা ব্রহ্মসাঁই তোমার নেহার ধ'রে
মাটির বস্তুকে পান করিলাম।
ক্লিং মন্ত্র অনঙ্গ মুঞ্জরী হিঙ্গলবরণ গা হরিতেল বরণে সাধি।
শুক্র খাই।
পলকে পলকে গুরু যেন তোমায় দেখতে পাই।
গোঁসাই আলোকসাঁই তুমি থাকো সাক্ষী।
যে বয়সে খাইলাম চারিবস্তু সেই বয়সে থাকি।
দোহাই দীননাথ। ৩ বার।

বুঝলাম, এখানে যে চারিবস্তুর কথা বলা হয়েছে তা হলো মল মূত্র রজ বীর্য। তার মানে এ এক দারুণ গুহ্যমন্ত্র।

ফকির বললেন : কুবিরের গানে এই কথাটাই আছে অন্যভাবে। চরণ পালের শিক্ষায় তিনি লিখেছেন :

শনি শুককুল বীজরূপে এক
আর আতস খাক বাদ চারে এক চারের মধ্যে এক।
বুঝে দেখো সৃষ্টির বিষয়
আল্লা আত্মারূপে সব শরীরে বিরাজে সর্বময়।

এখানে 'শনি শুককুল' মানে বুঝলেন ? শনি মানে শোনিত, স্ত্রীরজ। শুককুল মানে পুরুষের শুক্র। এইবারে আমাদের ঘরের সত্য মন্ত্র শুনুন :

ক্লিং শ্লিং দীনদয়াল সাহেবধনী সহায়।
গুরু সত্য। চারিযুগ সত্য। চন্দ্রসূর্য সত্য।
খাকি সত্য। দীননাথ সত্য। দীনদয়াল সত্য। দীনবন্ধু সত্য।

আরেক মন্ত্র শুনুন—

ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী দীনদয়াল নাম সত্য।
চারিযুগ সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য। ঠাকুর সত্য।
দীনদয়াল সত্য। দীননাথ সত্য। দীনবন্ধু সত্য।
গোঁসাই দরদী সাঁই/ তোমা বই আর আমার কেহ নাই।

আরেক গুহ্য মন্ত্র নিগূঢ় :

গুরু তুমি সত্যধন। সত্য তুমি নিরঞ্জন।
খাকি তোমার নাম সত্য। কাম সত্য। সেবা সত্য।
ঠাকুর সত্য। বাক সত্য। গুরু সত্য।

ফকির থামলেন, কিন্তু আমার মনে শুরু হল ধন্দ। এ কোথায় এসে পড়লাম আমি ? এ সবের মানে কি ? অনেক শব্দ যে জীবনেই শুনি নি। এসব নিয়ে আমি কী করব ? যেন মুক্তি পাবার জন্যে বললাম, আমি এর কোনো মানে বুঝছি না। করণ মানে কি ? খাকি মানে কি ? আল্লা বলছেন আবার ঠাকুর বলছেন। দীনদয়াল কে ? দীনদয়াল কি ?

প্রসন্ন মুখে হাসলেন শরৎ, 'একদিনে সব বুঝে ফেলবেন ? এসব অনেক দিনের করণ। এখন খাতা থেকে টুকে নিন সব। এখানে থাকুন আজ, এই ঘরে। কেউ জানবে না। সব টুকে নিন। তারপরে দেব কবজ তাবিজের খাতা। রোগ সারাবার ভেষজ বিবরণ।'

: কুবিরের গানের খাতা দেবেন না ?

: সকলেরই দেখি এক চাহিদা। কুবিরের গানে কি আছে বলুন তো ? আগে তো চরণ, তবে তো কুবির! তার গানে তো আমাদেরই মন্ত্র আর বিশ্বাসের ব্যাখ্যা। এমনি এমনি সেসব বুঝতে পারবেন! যদি বোঝেন তবে সে হবে বাইরের মানে।

: তাই নাকি ?

: হ্যাঁ। অবশ্যই। আচ্ছা কুবিরের গানটাই শুনুন। গাইতে তো পারি না, মুখে মুখেই বলি—

আগে ছিল জলময় পানির উপর খাকি রয়
খাকির উপর ঘরবাড়ি সকলরে।
ভাই রে যে আল্লা সেই কালা সেই ব্রহ্মাবিষ্টু
ও সেই বিষ্টুর পদে হল গঙ্গার সৃষ্টিরে।

এবারে একটু মানে বুঝে নিন। খাকি মানে মাটি, ফরাসী শব্দ। বিষ্ণুর পাদপদ্মই মাটি। সেইখান থেকে গঙ্গার সৃষ্টি। গঙ্গা মানে পানি। পানি মানেও মাটি। মাটি মানেও পানি। আব আর খাক। হিন্দু ম'লে গঙ্গা। মুসলমান মরলে মাটি। দুইই এক। কিন্তু যখন প্রলয় হবে ?

ভাইরে হিন্দু ম'লে গঙ্গা পায় যখন থাকে জমিনায়
শাস্ত্রমতে বলি শোনো স্পষ্টরে।

যখন এই খাকি একাকী স'রে দাঁড়াবে
তখন সব নৈরাকার হবে।
সংসার যাবে রে গঙ্গা গঙ্গাজলে মিশাবে।
বুঝে দেখো দেখি হবে কি খাকি পালাবে
যবন ম'লে কব্বর কোথা পাবে রে॥
এই সংসার অসার হবে ঘরবাড়ি কোথা রবে
এই কথাটির বিচার করো সবে রে॥
পানি আছেন কুদরতে খাকি আছেন পানিতে
খাকির ওপর স্বর্গমর্ত্য পাতালের এই কথা
আর আতস খাক বাদ চারে কুলে আলম্ পয়দা করে
হিন্দু যবন জানে না কিছু বোঝে না বিরাজে এই সংসারে॥

কুদরতি মানে দৈবীশক্তি। কুলে আলম্ মানে ঈশ্বর। তাহলে কথাটা কি দাঁড়ালো। হিন্দুর গঙ্গা, মুসলমানের মাটি, এসব কিছুই থাকবে না। থাকবেন কুলে আলম্ আর তাঁর কুদবতি। থাকবেন কুলে আলম্ আর তাঁর কুদরতি। থাকবে আব আতস খাক বাদ। হিন্দু মুসলমান তোমরা সব ভেদবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে দীনদয়ালকে ডাকো।

কথাটা স্পষ্ট হল। তারই টানে আমি বললাম : আপনাদের ধর্মবিশ্বাসে রয়েছে সমন্বয়েব কথা। আল্লাধনী বাইধনী এই দুইয়ে মিলিয়ে আপনাদের সাহেবধনী। বড় আশ্চর্য! এর কারণ আমার মনে হয় প্রথম যে উদাসীনের কাছে আপনাদের দীক্ষাশিক্ষা হয়েছিল তিনি ছিলেন কাদেরিয়া সুফী সম্প্রদায়ের।

ফকির বললেন : তা হতে পারে। দীনদয়ালের ঘরে গেলে আমরা ঘোমটা দিই জানেন তো?

: ঘোমটা দেন? তাহলে আর সন্দেহ রইলো না।

শরৎ ফকিরের সঙ্গে আমার ভাবের লেনদেন এইভাবেই শুরু। মাঝে মাঝেই বৃত্তিহুদায় যাই। রাতে থাকি। মাঝরাতে কথাবার্তা হয়। একবার অগ্রদ্বীপের মেলায় আমগাছ তলায় পাশাপাশি দু'টো শতরঞ্জি পেতে দু'জনে শুয়ে নানা কথা বলি। ওঁর পরনে সাদা থানধুতি আর সাদা সুতি চাদর। বুকে সবসময় কালো রঙের ফকিরী দণ্ড ধরে আছেন। ঐটি কাছছাড়া করতে নেই। ওতে নাকি আছে ঐশী শক্তি।

কখন গাঢ় ঘুমিয়ে পড়েছি চৈতী হাওয়ায়। রাত তিনপ্রহরে হঠাৎ গায়ে হাত

দিয়ে ডাকেন শরৎ—'উঠুন উঠুন, আমার ক্রিয়াকলাপ দেখবেন তো ?'

সমস্ত মেলা ঘুমোচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ সমস্ত দিনের চিঁড়ে-মহোৎসবের পর ক্লান্ত নিদ্রাতুর। আকাশে একাদশীর ক্ষীণ চাঁদ। আবছা অন্ধকারে দেখলাম গোপালের মা আর তিনজন বিধবা, ফকিরের চারপাশে চারটে ধুতি দিয়ে আবরণ তৈরি করেছে। তার মধ্যে চুপিসাড়ে বসে ফকির ভাত খাচ্ছেন। আমার হতভম্ব ভাব দেখে গোপালের মা বললে ফিসফিস ক'রে, 'দুপহর রাতে আমরা ফকিরের অন্ন পাক করেছি। উনি তিন পহরে তা সেবা কচ্চেন। এ খাওয়া কাউকে দেখতে নেই। কাল চোপর দিন আর উনি অন্ন কি কোনো খাদ্য ছোঁবেন না। সংযমে থাকবেন। কথাবাত্তাও নয়। সারাদিন আসনে বসে থাকবেন। আবার কাল রাত তিন পহরে অন্ন সেবা হবে। অগ্রদ্বীপে ওঁর এই নিয়ম। জয় দীনদয়াল। চারযুগ এই চলছে।'

এরপরে ভোর থেকে আমার শুধু দেখে যাওয়া। কেননা ফকির নির্বাক। সকালে সদলে গঙ্গাস্নান সেরে আসনে বসলেন ফকির। সাদা বেশবাস। মাথায় চাদরের ঘোমটা। একহাত দিয়ে বুকে ধরে আছেন ফকিরী দণ্ড। সামনে সিঁদুরলিপ্ত এক বিরাট ত্রিশূল, তার সামনে রক্তাম্বরধারী এক সেবক। 'জয় দীনদয়াল গোপ্ত বাবাজী' হুংকার দিয়ে রাশি রাশি পুজোপচার নিয়ে পুরুষ নারীরা ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানাচ্ছে। দেখতে দেখতে জায়গাটা বিশ্বাসী ভক্তে ছেয়ে গেল। কয়েকশো লোক ভেজা কাপড়ে হত্যে দিয়ে পড়ে রইল। জায়গাটা কাদায় কাদা। উঁকি মেরে দেখলাম ফকির সংযত ভঙ্গিতে বসে আছেন। সামনে পাতা একটা নতুন পাটি। তাতে জমা পড়ছে খুচরো পয়সা আর টাকা, কাঁচা আর নোট। লাল খেরোর খাতা খুলে এক গোমস্তা হিসেব লিখছেন।

গোপালের মাকে জিজ্ঞেস ক'রে পরে জানলাম ঐ খাতায় আসুনে ফকিররা খাজনা জমা দিচ্ছে।

: 'খাজনা কিসের ?' আমার প্রশ্ন।

গোপালের মা বলে, 'কেন বাবাঠাকুর, ওনাদের দেহমন তো দীনদয়ালের ঘরে বাঁধা। তার খাজনা দিতে হবে না ?'

: কত ক'রে খাজনা ?

: তার কি কোনো ঠিক আছে ? যার যেমন ক্ষমতা। টাকা আধুলী চাল ডাল মটর খন্দ কলাই। ঐ দিয়েই তো অন্ন মচ্ছব হবে। আবার বোশেখী পুন্নিমেতে ছদোয় হবে মচ্ছব। তখন এখানকার সব আসুনে ফকির সেখানে যাবে। দীনদয়ালের ঘর থেকে তাদের দেওয়া হয় পাটি আর হুঁকো।

ভাবতে লাগলাম বিচিত্র ধর্ম, বিচিত্র তার রীতি আর আচার। কিন্তু কতদিন

আর থাকবে ? গুরুকুলে টাকার টান পড়েছে। মন্ত্রতন্ত্র জমাবন্দী হয়ে আছে সিন্দুকে। চর্চার অভাবে ভেষজ বিদ্যা ভুলে গেছে পালেরা। শরৎ ফকিরের ছেলেরা পড়ছে স্কুল কলেজে। কৌলিক ফকিরী তারা নেবে না। বড়জোর বছরে একবার আসবে অগ্রদ্বীপে কিছু রোজগারের ভরসায়।

দেখতে দেখতে বেলা গড়ালো। ফকিরের সামনের মাদুরে স্তূপের মতো জমা হতে লাগল টাকা পয়সা আর চাল ডাল আলু এঁচোড়। একদল সম্প্রদায়ী দশ-পনেরোটা মাটির হাঁড়িতে চড়িয়ে দিল রান্না। গাছতলা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। তার মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গোপালের মা পরম নিষ্ঠায় পাতলো এক বিচিত্রিত মানুষ সমান কাঁথা। তাতে রাখল একটা বালিশ। কাঁথার মাথার কাছে পাটের কাঠি দিয়ে ছোট্ট একখানা ঘর বানিয়ে সেটা ঢেকে দিল লাল কাপড়ে। কঞ্চিতে এক গেরুয়া নিশান লাগিয়ে দিল পুঁতে।

ব্যাপার দেখে আমি তো অবাক ! তা বুঝতে পেরে গোপালের মা বললে, 'ও ছেলে, এটা হল কুবির গোঁসাইয়ের আসন। তেনার প্রকট কালে চরণ পাল আসন পাততেন ঐখানে যেখানে ফকির বসেছে, আর এইখানে বসতেন কুবির বাবাঠাকুর। তাঁর বংশে তো শিক্ষাদীক্ষা রইল না। আমার ছেলে গোপাল তো অবোধ ! তাই আমি বাবাঠাকুরের আসনটুকু পেতে রাখি। উনি এসে দু'দণ্ড বসেন গুরুর সামনে। ঐ তো এখন শরৎ ফকিরের মধ্যে চরণ পাল এয়েচেন। এখন ওঁর চোপর দিন কথাবাত্তা জ্ঞানবুদ্ধি বাহ্যে পেচ্ছাব সব বন্ধ। এখানেও কুবির বসে বসে গুরুকে নেহার করছেন। বাবা চরণ পালের নামে একবার হরি হরি বল। জয় দীনদয়াল গোপ্তা বাবাজী।'

সমস্ত মেলার মানুষ যেন জোকার দিয়ে উঠল। দারুণ এই বিশ্বাসের জগতে আত্মবিচ্ছেদে জর্জর আমি এক সংশয়ী ! ভয়ানক বেমানান। তার থেকে ত্রাণ পাবার জন্যই বোধহয় গোপালের মাকে বললাম : এই সময় তুমি বরং কুবিরের একখানা গান ধর।

: ঠিক বলেছো বাবা। তবে তাঁর সেরা গানখানাই শোনো। এ গানে আমাদের দীনদয়ালের ঘরের আসল কথা ক'টা আছে। শোনো—

মানুষের করণ করো
এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধরো ॥
হরিষষ্ঠী মানসা মাখাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মরো ?

মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
করো ধর্মযাজন মানুষভজন
ছেড়ে দাওরে বেদ।
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফেরো ॥
ঘটে পটে দিওনারে মন
পান করো সদা প্রেমসুধা অমূল্যরতন।
গোঁসাই চরণ বলে, কুবির চরণ যদি চিনতে পারো।

ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে যায় যাদুবিন্দুর নাতির ছেলে দেবেন গোস্বামীর সঙ্গে। 'কই আমাদের পাঁচলখিতে তো এলেন না'—অনুযোগ ফুটল। সেইসঙ্গে আক্ষেপ, 'আর যাবেনই বা কোথায় ? ভিটেটুকু আর যাদুবিন্দুর সমাজ ঘর ছাড়া আর আছে কি ? সেবাপুজো করার পয়সা জোটে না। নতুন শিষ্যশাবক হয় না। পুরনোরা গরীব। আর চলে না।'

: রোজগারের অন্য পথ কিছু নেই ?

: সামান্য বিদ্যে সম্বল। সাতজন পোষ্য। প্রায়ই অসুস্থ থাকি। জ্বরজারি। যেদিন শরীর ভালো থাকে কালনা কোর্টে গিয়ে দলিল দরখাস্ত লিখে দু'চার টাকা পাই। তবু যাবেন একদিন। যাদুবিন্দুর গানের খাতা আছে পাঁচখানা। বাবু, ওসব বিক্রি হয় না ? কোনো দাম নেই ?

দেবেন গোঁসাইয়ের চোখমুখ লাল টকটকে। রোদে না জ্বরের তাড়সে ?

রাতে শরৎ ফকিরকে দেবেনের প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন, 'মানুষটা ভালো, তবে বড় দুঃখী। বিরাট বংশের ছেলে। যাদুবিন্দুর তো অনেক শিষ্য ছিল। ধরে রাখতে পারল না। দীনদয়ালের ঘরের শিক্ষা ঠিকভাবে ধরে রাখতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। ওর তো পাঁচ-ছ'জন সন্তান। সংযম নেই। জন্ম পাকে পড়ে গেছে। তবু দেখবেন যদি কিছু করতে পারেন। টাকার খুব টানাটানি বেচারার। আমার সমস্যা অন্য। দীনদয়ালের ঘরই বোধহয় রাখতে পারব না। আধুনিক যুগে নতুন শিষ্য আসছে না। নেহাৎ পঞ্চাশ বিঘে দেবোত্তর জমি আছে, তাই ঠাকুর সেবাটা চলবে।'

সে রাতে ফকির দু'প্রহরে ডাকলেন। বললেন : আর এক প্রহর পরে সেবা ক'রে মৌনী হয়ে যাবো, তার আগে আমাদের ঘরের কবচ তাবিজের খাতাখানা দেখাই। লণ্ঠনের আলোতেই দেখুন।

সত্যিই অদ্ভুত আশ্চর্যজনক কতকগুলো কাগজের ছক। নানা রকমের চতুষ্কোণ আর শব্দ বা অক্ষর বা সংখ্যা। কোনো ছকের তলায় 'বাণ কুজ্ঞান লাগে

না। লাগিলে আরোগ্য হয়', কোনটায় লেখা 'তারকব্রহ্ম কবচ স্বপ্নদোষ নাশ হয়', একটায় 'স্বামী ভালবাসে', একটায় 'ঋতুক্ষয় হয়'। পানের আকারে আঁকা ছকে লেখা 'মায়াধরার কাগজ', এমন কি দু'খানা কবচের বিষয় 'পিরিতি লাগে' এবং 'পিরিতি ছাড়ে'। তাছাড়া অনেক মন্ত্র আর মাপের নির্দেশ।

ফকির বললেন, 'এসবও আমাদের ঘরের জিনিস। এককালে এসব থেকে অনেক কঠিন রোগারোগ্য হয়েছে। সব স্বপ্নে পাওয়া। কাগজে লিখে তাবিজ ক'রে পরতে হয়।'

: আপনি এসব কবচ দেন?

: না। প্রয়োগ জানি না। শিখি নি। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। শিখিয়ে যেতে পারলেন কই?

: তার মানে এগুলোও বাতিল? শুধু কাগজের পুঁথি?

হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল ফকিরের। কী আশ্চর্য মায়াময় মনে হল সমস্ত জগৎ! ওদিকে মেলায় হাজার হাজার বিশ্বাসী মানুষ পরম আশ্বাসে ঘুমোচ্ছে। ঘুম নেই শুধু তাদের গুরুবংশের প্রধান মানুষটার। তাঁর চিন্তা কেমন ক'রে ভেঙে-পড়া দীনদয়ালের ভিটেটুকু বাঁচবে। কেমন ক'রে আরো শিষ্য বাড়বে।

এক ঘুমে রাত কাবার। যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদের তেজ হয়েছে। বারুণীর স্নান চলছে গঙ্গায়। আজ ভাঙা মেলা। শরৎ বসেছেন মৌনী আসনে। গঙ্গা পেরিয়ে সোজা দু'মাইল হেঁটে একেবারে অগ্রদ্বীপ স্টেশন। স্টেশনে গিয়ে দেখি সিমেন্টের বেঞ্চিতে অঘোরে পড়ে আছে ধুম জ্বরে দেবেন গোঁসাই। গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত রাখি। ক্লিষ্ট হেসে গোঁসাই বলে : 'শেষ রাত থেকে এমনি জ্বর। ট্রেনে চেপে সমুদ্রগড় নেমে পাঁচলখি গিয়ে শয্যা নেব। মাথায় থাক আমার দীনদয়াল।'

সাহেবধনী ঘরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তেমন ক'রে যে গড়ে উঠল না তার কারণ আমারই শৈথিল্য। সত্যিই তো তাদের জন্যে কিছু করতে পারতাম না আমি। তবে বিশ্বাসভঙ্গ করি নি। শরৎ ফকির যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁদের ঘরের গুপ্তকথা কাউকে বলি নি বা লিখি নি। হয়ত নিতান্ত হতাশায় কিংবা সুগভীর দুশ্চিন্তায় হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন তিনি। সে খবর পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ঐখানেই এ অধ্যায়ের ইতি।

কিন্তু হঠাৎ দশ মাস পরে দিল্লীর এক প্রতিষ্ঠান লোকসংগীত সংগ্রহের জন্য কিছু আর্থিক অনুদান পাঠালো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দেবেন গোঁসাই আর তার কাছে সংরক্ষিত যাদুবিন্দুর খাতার কথা। পুরনো ডাইরির পাতা খুঁজে পাঁচলখির ঠিকানায় দেবেন গোঁসাইকে এক চিঠি পাঠালাম রিপ্লাই পোস্টকার্ডে।

অভিজ্ঞতায় জেনেছি গ্রামের লোক অনেক সময় স্রেফ উদ্যমের অভাবে চিঠি লেখে না। তাই জবাবী চিঠি। তাতে দিন সময় জানিয়ে লিখে দিলাম আমার যাবার খবর। যেন এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে বাসস্টপে কেউ থাকে আমার জন্য। শ'পাঁচেক টাকা পাবার সম্ভাবনার কথাটুকুও ইঙ্গিতে লিখে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে একখানা চটেব সাইড ব্যাগ নিয়ে রওনা দিলাম। তার আগেই জবাবী চিঠি এসে গেছে দেবেন গোঁসাইয়ের। তিনি লিখেছেন :

পূজনীয় দাদা,

আপনার একখানি পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আপনি যে আমার মতন হতভাগাকে মনে রেখেছেন এইটাই ধন্যবাদ। যাহা হউক, আপনি আমার এখানে ও পাঁচলখিতে আসার ইচ্ছুক, আমার সৌভাগ্য। দয়া করিয়া গরীবেব বাড়িতে আসিবেন। আসিতে যেন কুণ্ঠিত হইবেন না। বাসস্টপে লোক থাকিবে জানিবেন। ইতি

আপনার হতভাগ্য দেবেনবাবু।

নবদ্বীপের হেমাইৎপুর মোড় থেকে উঠেছি কালনা-চুপী রুটের বাসে। পৌষের শীতের বেলা এগারোটা। ভাবছি, খাতাগুলো পাব তো ? আগে ভাগে টাকার কথাটা না লিখলেই হতো। অবশ্য টাকাটা পেলে গোঁসাইয়ের অন্তত চিকিৎসা খানিকটা হবে।

'নাদাই ব্রিজ ধোবা···বাবু নামবেন তো ?' কণ্ডাকটার হাঁকে।

নামলাম। একটা বছর বারো বয়সের ছেলে এগিয়ে আসে তরতর পায়ে, 'আমার সঙ্গে আসুন। আমাদের বাড়ি যাবেন তো ?'

এক্কেবারে দেবেন গোঁসাইয়ের ছাঁচ। টানা টানা চোখ নাক। উজ্জ্বল রং। তাতে একপোঁচ দারিদ্র্যের ম্লানিমা। 'তুমিই বড় ছেলে বুঝি ? এত রোগা কেন ?'

ছেলেটি জবাব দেয় না। তরতরিয়ে হাঁটে আগে আগে। কালো ইজের। ময়লা গেঞ্জি। মাথায় চাদর জড়ানো। গমক্ষেত পেরিয়ে, আলু ক্ষেতের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ। ছেলেটা বেশি কথা বলে না। হাঁ হুঁ দিয়ে চালায়। আমার প্রশ্ন তা বলে থামে না। 'হ্যাঁরে, তোর বাবা এখন কালনা কোর্টে যায় ?' ছেলেটা মাথা হেলায়। 'হ্যাঁরে, তোরা ক' ভাই-বোন ?' আঙুল দিয়ে দেখায় পাঁচ। 'দিদির বিয়ে হয়ে গেছে ?' মাথা নাড়ে। একনাগাড়ে মিনিট দশ হাঁটার পর হঠাৎ বলে, 'ঐ আমাদের বাড়ি।' বলেই একদৌড়ে আমাকে ছেড়ে পালায় বাড়ির দিকে। একখানা মেটে ঘর, তাতে ভাঙা টালির ছাউনি। একটুখানি উঠোন।

সন্ধ্যামনি আর গাঁদা ফুলের গাছ। ততক্ষণে আমার আসার সংবাদ পৌঁছে গেছে।

নিচু চালা। মানুষজনের পা দেখা যাচ্ছে। 'কই দেবেনবাবু কই ?' হাঁক ছাড়ি। ছেলেটা জলের গাড়ু গামছা নিয়ে চট ক'রে নেমে আসে, 'পা ধুয়ে নিন'। অপাঙ্গে দেখছি হতশ্রী দরিদ্র এক অপরিকল্পিত পরিবার। ধূলিধূসর দু'টো রোগা ছেলে, দু'টো মেয়ে আমাকে অবাক চোখে দেখছে। ময়লা শাড়ি পরা এক নতনেত্র মহিলা, নিশ্চয়ই দেবেন গোঁসাইয়ের স্ত্রী, নিচু হয়ে মেটে দাওয়ায় আমার জন্যে আসন পাতছেন। কিন্তু দেবেনবাবু কই ? অস্বস্তি চাপতে না পেরে বলি : কোথায় গেলেন দেবেনবাবু ?

সামনের সবচেয়ে ছোট্ট ছেলেটি বলে উঠল, 'বাবা মরে গেছে।'

: সেকি ? কবে ? কী ভাবে ? এই যে পরশু তাঁর চিঠি পেলাম ?

অঝোর কান্নায় ঢলে পড়ল আমার পায়ে এক অসহায় স্ত্রীলোক। তারপরে চোখ মুছে বলল, 'উনি দেহ রেখেছেন কার্তিক মাসে। টি. বি. হয়েছিল তিন বচ্ছর, চিকিচ্ছে করান নি। অপরাধ নেবেন না বাবা। চিঠিখানা আমিই লিখিয়েছি ধম্মো ভাইকে দিয়ে।' একটু থেমে বলল, 'মরণের খবরটা আপনাকে দিই নি, তাহলে তো আসতেন না। বাবা, আমরা বড্ড গরীব অসহায়। টাকাটা পাবো তো ? সব খাতা নিয়ে যান।'

এখন যখন মাঝে মাঝে কুবির গোঁসাইয়ের গানের খাতা খুলি, মনে পড়ে ভেঙে পড়া দীনদয়ালের ঘর, ক্ষীয়মান এক ধর্মসম্প্রদায়ের করুণ আত্মনিঃশেষ। যখন যাদুবিন্দুর গান পড়ি তখন চোখের সামনে ভাসে বেহুঁস জ্বরে রক্তাক্ত দেবেন গোঁসাইয়ের ম্লান মুখ আর সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠে কানে বাজে : 'মরণের খবরটা আপনাকে দিই নি, তাহলে তো আসতেন না।' খুব সত্যি কথা।

●

এবারে একেবারে আলাদা রকমের ব্যাপার। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি একটা সময়। আশ্বিন মাসে পিতৃপুরুষের নাম তর্পণ করছেন ব্রাহ্মণরা। জায়গাটা হল অবিভক্ত বাংলার মেহেরপুরের ভৈরব নদী। অঞ্জলি ভরে নদীর জল নিয়ে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ব্রাহ্মণরা ভক্তিনতচিত্তে পিতৃপুরুষের ধ্যান করতে করতে হঠাৎ দেখেন অনতিদূরে বুকজলে দাঁড়িয়ে একজন অন্ত্যজ মানুষ তর্পণ করছে। ভালো ক'রে নিরিখ ক'রে তাঁরা চিনতে পারলেন মালোপাড়ার বলরাম হাড়িকে। কী স্পর্ধা ! গলায় পরিহাসের সুর মিলিয়ে একজন বলে উঠলেন : কি রে বলা,

তোরাও কি আজকাল আমাদের মত পিতৃতর্পণ করচিস্ নাকি ?

কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়ে বলা হাড়ি জবাব দিলে : আজ্ঞে না ঠাকুরমশাই, আমি আমার শাকের ক্ষেতে জলসেচ করচি।

বিস্মিত ব্রাহ্মণ বললেন : বলিস কি ? এখানকার জল তোর জমিতে যাচ্ছে কি ক'রে ? আকাশ দিয়ে নাকি ?

বলরামের সপ্রতিভ জবাব : আপনাদের তর্পণের জল কি ক'রে পিতৃপুরুষের কাছে যাচ্ছে আজ্ঞে ? আকাশ দিয়ে ? বুঝলেন ঠাকুরমশায়, আপনাদের জল যেমন ক'রে পিতৃপুরুষরা পাচ্ছেন আমার জলও তেমনি ক'রে জমিনে যাচ্ছে।

মুহূর্তে আবহাওয়া থমথমে। অপমানিত ব্রাহ্মণরা বলরামের দিকে বিষদৃষ্টি হেনে চলে গেলেন। ছোটলোকের এত বড় আস্পর্ধা ? ব্যঙ্গের হাসিতে দর্পিত মুখখানা ভরিয়ে বলরাম হাড়িও বাড়ির পথ ধরল।

কে এই বলরাম ? কেন তার এহেন প্রতিবাদ ? উচ্চবর্ণেব প্রতি কীসের তার এত ক্রোধ ?

উনিশ শতকের নদীয়া জেলার মেহেরপুর। ছোট শহরের পশ্চিমদিকে অন্ত্যজ শ্রেণীর বসবাস। সেখানে মালোপাড়ায় জন্মেছিল বলরাম ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। বাবা গোবিন্দ হাড়ি, মা গৌরমণি। সেকালে হাড়িদের জীবিকা ছিল শুয়োর চরানো, গাছগাছড়ার ওষুধ বিক্রি, লাঠিয়ালগিরি কিংবা বড়লোকের দারোয়ানী। বলরাম ছিল মেহেরপুরের বিখ্যাত ধনী পদ্মলোচন মল্লিকের দারোয়ান। বেশ কেটে যাচ্ছিল দিন। হঠাৎ একরাতে মল্লিকদেব গৃহদেবতার সমস্ত অলংকার গেল চুরি হয়ে। সন্দেহ পড়ল বলরামেব উপব। তাকে গাছে বেঁধে প্রচণ্ড প্রহার চলল। শেষপর্যন্ত সকলের পরামর্শে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল তাকে। এই ঘটনায় বৈরাগ্য এসে গেল বলার মনে। ছিঃ এত নিচু মানুষের মন ? নিচু জাতি বলে বড়লোকদের এত ঘেন্না ? সহসা তার মধ্যে জন্ম নিল এক প্রতিবাদী মানুষ। এই অসহায় জীবন, সমাজের এই অন্যায়, বিশ্বাসের এই স্খলন তাকে টলিয়ে দিল।

বেশ ক'বছর পরে আবার যখন মেহেরপুরে ফিরে এল বলরাম তখন অন্য মানুষ। জটাজুটসমাযুক্ত, সাত্ত্বিক চেহারার সাধকের মধ্যে কোথায় সেই পুরনো 'বলা' ? ভৈরব নদীর ধারে তৈরি করল আসন। ইতিমধ্যে অলংকার চোর ধরা পড়েছিল। তাই অনুতপ্ত মল্লিকমশাই দিলেন জমি আর অর্থ। গড়ে উঠল মন্দির। তারপর দলে দলে দীর্ঘদিনের ব্রাহ্মণশোষিত অন্ত্যজ মানুষ—কৈবর্ত, বেদে, বাগ্দি, নমঃশূদ্ররা এসে বলরামের কাছে শরণ নিল। বলরাম হল তাদের পরিত্রাতা। তৈরি হল এক নতুন ধর্মমত আর বিশ্বাস। চল্তি কথায় তাকে বলে

'বলা হাড়ির মত'। দেখতে দেখতে বিশ হাজার ভক্তশিষ্য জমে গেল। বলরামের সাধন সঙ্গিনী হল ব্রহ্ম মালোনী।

একশো বছরেরও আগে লেখা অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইয়ে হাড়ি সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেকটা খবর মেলে। তার চেয়ে বেশি খবর আছে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা *Hindu Caste and Sects* বইতে। তিনি ১৮৯২-এ মেহেরপুর গিয়ে বলরামের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে নানা কথা বলেছিলেন। বলরামের স্ত্রী প্রথমেই যোগেন্দ্রনাথকে তাঁর জাতি পরিচয় দিতে বলেন। তাদের ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের কথা আগেই জানা ছিল বলে যোগেন্দ্রনাথ বলেন, তিনি মানুষ। তখন মহিলা তাকে বসতে বলে এবং এমনকি জাতে হাড়ি হয়েও অন্নগ্রহণে আহ্বান করে। বিস্মিত যোগেন্দ্রনাথ অবশ্য তাতে রাজি হন না, তবে মুগ্ধ হন সেই অশিক্ষিতা মহিলার অনর্গল বাক্‌পটুতায় ও নেতৃত্বে। তাঁর মতে বলবামী সম্প্রদায়ের কোনো বিশেষ ধর্মীয় চিহ্ন বা বেশবাস ছিল না। তাদের অনেকে ছিল ভিক্ষাজীবী। আর একটা জিনিস তিনি লক্ষ করেছিলেন, তারা কখনোই কোনো ঠাকুর দেবতার নাম উচ্চারণ করে না। তবে সবচেয়ে বড বৈশিষ্ট্য এই ধর্মের, যা তাঁর মনে হযেছিল, তা হল, ব্রাহ্মণবিদ্বেষ। ব্যাপারটা তিনি এইভাবে লিখেছেন :

Bala Hari...in his youth employed as a watchman in the service of local family of zeminders, and being very cruelly treated for alleged neglect of duty he severed his connection with them. After wandering about for some years, he set himself up as a religious teacher, and attracted round him more than twenty thousand desciples. The most important feature of his cult was the hatred that he taught his followers to entertain towards Brahmans. He was quite illiterate but he had a power of inventing puns by which he could astonish his audience whinever he talked or debated.

বলরামের বাক্‌শক্তি ও শব্দশ্লেষের যে উল্লেখ যোগেন্দ্রনাথ করেছেন তার কিছু ছাপা নমুনা পাওয়া গেছে পুরনো বই থেকে যেমন—

১. রাঁধুনি নেই তো রাঁধলে কে ? রান্না নেই তো খেলেন কি ?
   যে রাঁধলে সেই খেলে এই দুনিয়ার ভেল্‌কি।

২. যেয়েও আছে থেকেও নাই
   তেমনই তুমি আর আমি রে

আমরা মরে বেঁচে বেঁচে মরি।
৩. তিনি তাই তুমি যাই
যা তিনি তাই তুমি।
৪. যম বেটা ভাই দুমুখো থলি তাই জন্যে ওর আঁৎটা খালি
ও কেবল খাচ্ছে খাচ্ছে
ওর পেটে কি কিছু থাকচে থাকচে থাকচে ?
৫. চক্ষু মেলিলে সকল পাই চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই
দিনে সৃষ্টি রেতে লয় নিরন্তর ইহাই হয়।

বলবাম প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ কি ? কিন্তু নিছক ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষের জন্য তিনি একটা ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন একথা ঠিক নয়। আসলে আঠারো শতকের শেষের দিকে এদেশের সাধারণ শূদ্রজাতি নানা কারণে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তাদের জীবনে কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা ছিল না। ফলে যেকোনো সময়ে নেমে আসত উচ্চবর্ণের দমনপীড়ন বা ফতোয়া। যেমন বলরামকে কবতে হয়েছিল গ্রামত্যাগ। কল্যাণীর রামশরণ পাল, কুষ্টিয়ার লালন শাহ, হুদোর চরণ পাল, ভাগা গ্রামের খুশি বিশ্বাস, মেহেরপুরেব বলরাম হাড়ি এঁবা সকলেই উচ্চবর্ণের ভ্রূকুটির বাইরে সাধারণ ব্রাত্যজনের বাঁচবার জন্য একটা জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। নিছক প্রতিবাদ নয়, টিঁকে থাকাও। সংকীর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রে বাঁচা নয়, উদার মানবতা নিয়ে সহজ ক'রে বাঁচা। তাই মূর্তিপূজা, অপদেবতা পূজা, অকাবণ তীর্থভ্রমণ, দেবদ্বিজে বিশ্বাস, শাস্ত্র নির্ভরতা ও আচার সর্বস্বতাব বিরুদ্ধে এঁদের অস্ত্র ছিল জাতিভেদহীন সমন্বয় এবং নতুন মানবতাবাদী সহজ ধর্মাচরণ। কিন্তু কর্তাভজা সাহেবধনীরা অবতারতত্ত্ব মানেন। বলরাম সেটাও মানেন নি। তিনি যুগলভজনও মানেন নি। বলরাম ছিলেন বৈষ্ণবতারও বিরোধী। এখানেই বলা হাড়ির অভিনবত্ব।

কিন্তু বলরাম কী বলতে চেয়েছিলেন তাঁর ধর্মমতে ? তিনি অবতারতত্ত্ব না মেনে নিজেকে বলেছিলেন : 'হাড়িরাম'। হাড়ি বলতে তিনি কোনো জাতি বোঝান নি। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল, যিনি হাড়ের স্রষ্টা তিনিই হাড়ি। হাড় মানে স্ট্রাকচার, তাতে চামড়ার ছাউনি। ভেতরে বল্ অর্থাৎ রক্ত। এই হল মানবদেহ। তার মধ্যে হাড়্ডি, মণি, মগজ, গোস্ত, পোস্ত। সব মিলিয়ে আঠারো মোকাম।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে বলরামী সম্পর্কে এক বিচিত্র প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায় বলরামের জবানীতে। তা এইরকম :

প্রশ্ন : পৃথিবী কোথা থেকে এলো ?

উত্তর : ক্ষয় হতে।

প্রশ্ন : ক্ষয় থেকে কিরূপে ?

উত্তার : আদিকালে কিছুই ছিল না। আমি আমার শরীরের 'ক্ষয়' ক'রে এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। সেইজন্য এর নাম ক্ষিতি। ক্ষয় ক্ষিতি ও ক্ষেত্র একই পদার্থ। আমি কৃতদার গড়নদার হাড়ি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে সে যেমন ঘরামী সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ি।

হাড়িরাম তত্ত্ব শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক এর ভেতরের মৌলিক চিন্তার রহস্যটুকু খুব চিত্তাকর্ষক। ১৯১১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মেহেরপুর যাই বলরামী তত্ত্বের খোঁজে। এতদিন সে দেশ পাকিস্তান থাকায় আমার কৌতূহল মেটাতে হচ্ছিল পুঁথির পাতা থেকে। অবশেষে সেই ভৈরব নদীর ধারের মেহেবপুর। সেই মল্লিকবাড়ি দেখে, মালোপাড়ায় বলরামের মন্দিরের সামনে বসি। সম্প্রদায়ের লোক এখনো আছে কিছু। বৃন্দাবন এখনো নিত্য সেবাপূজা করে হাড়িরামের। তাদের এখনকার নেতা বা 'সরকার' আমাকে বোঝাতে লাগলেন : শুনুন আজ্ঞে, আমাদের বিশ্বাসে বলছে—

হাড় হাড়্ডি মণি মগজ গোস্ত পোস্ত গোড়তালি।
এই আঠারো মোকাম ছেপে আছেন আবার বলরামচন্দ্র হাড়ি ॥

আমি জিজ্ঞেস করলাম : আপনাদের এই আঠারোর তত্ত্বটা কি ?

: আজ্ঞে শুণে ন্যান্। মানবদেহ গড়ে উঠেছে একুনে আঠারোটা পদার্থ নিয়ে। তার মধ্যে কারিগরের দেওয়া দশ পদার্থ, যেমন দুই নাক, দুই কান, দুই চোখ এই ছয় আর মুখ, এক নাভি, এক পায়ু, এক উপস্থ এই হল দশ। এবার শুনুন পিতা দেন চার পদার্থ—হাড়, হাড়্ডি (মানে মজ্জা) মণি (মানে বীর্য) আর মগজ। আর জননী দেন চার পদার্থ—কেশ, ত্বক, রক্ত আর মাংস। এই হল আঠারো মোকাম। আর এই সব ছাপিয়ে বয়েছেন আমাদের হাড়িরাম।

: হাড়িরাম কি কারুর অবতার ?

: তিনি বলে গেছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার যুগের আগে ছিল দিব্যযুগ। সেই সময়ে তেনার জন্ম। তার মানে সব অবতারের আগে তিনি। আমাদের সদানন্দের গানে বলছে—

দিব্যযুগ যে হাড়িরাম
মেহেরপুরে তার নিত্যধাম ॥

লক্ষ করলাম, বলা হাড়ি ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র বা দ্বাপরের বলরামের অবতার বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন নি। নিজেকে বসিয়েছেন এ সবের উর্ধ্বে। নিজের নাম দিয়েছেন 'রামদীন'। রামদীন মানে কি?

বৃন্দাবন গাইতে লাগলো:

'রা' শব্দে পৃথিবী বোঝায়
'ম' শব্দে জীবের আশ্রয়।
'দীন' শব্দে দীপ্তাকার হয়
নামটি স্মরণ করলে তার॥

জানতে চাই বলরামীরা কাব পুজো করে। কাউকে তো তারা ডাকে? উপাস্য তো কেউ আছে? সে কে?

বৃন্দাবন বলে: আমরা কোনো ঠাকুর দেবতা, কোনো মূর্তি বা ছবি কি কোনো ঢিবি বা গাছকে পূজি না আজ্ঞে। আমরা কাউকে প্রণাম করিনে। আমরা শুধু রামদীনকে ডাকি। তিনিই তো কারিকর। সদানন্দ নিকেছে—

হাড়িরামতত্ত্ব নিগূঢ় অর্থ বেদবেদান্ত ছাড়া।
ক'রে সর্ব ধর্ম পরিত্যাজ্য সেই পেয়েছে ধরা॥
এই তত্ত্ব জেনে শিব শ্মশানবাসী।
এই তত্ত্ব জেনে শচীব গোরা নিমাই সন্ন্যাসী॥

যেন অলীক সব কথাবার্তা। কিমাকার সব বিশ্বাস। দেখতে দেখতে সূর্য ঢলে পড়ে বলরামের মন্দিরের পশ্চিমে। আমার চোখে পড়ে মন্দিবের একটা সিল্যুট। চারিদিকে ভক্ত নরনারী। তাদের চোখে মুখে স্থিব বিশ্বাসের দৃষ্টি। গর্বোজ্জ্বল মুগ্ধতা। মেহেরপুরের জনসমাজের একেবারে পবিত্যক্ত অংশে এই মালোপাড়া। গাছগাছালিব জঙ্গল আর মরা গরীবদের ভাঙা বাড়ির হতশ্রী। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবন হেঁকে বলতে লাগল: আপনারা যাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলেন, তেনাদেরও সৃষ্টি হাড়িরাম হতে।

: বলো কি? কী ভাবে তা হল?

: দেখুন, আমরা বিশ্বাস করি যে হাড়িরামের হাই হতেই হৈমাবতীর সৃষ্টি। সেই হৈমাবতী হতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। ঠিক কিনা বলুন?

ভৈরব তীরে রাত নামল। মনে মনে প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিলাম হাড়িরামের মন্দির চত্বর থেকে। মনে বিস্ময় আর সম্ভ্রম। বৃন্দাবনকে জিজ্ঞেস করলাম. হাড়িরাম সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আর কোথায় যাব?

হতাশ ভঙ্গিতে বৃন্দাবন বললে : দেশ ভাগ হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে আজ্ঞে। তবে আপনাদের ওপারে নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার নিশ্চিন্তপুরে যদি যান তবে অনেক খবর পাবেন। সেখানে সিদ্ধপীঠ বেলতলায় হাড়িরামের খড়ম জোড়া আছে। তাতে নিত্য তেলজল দেয় রাধারানী। তাকে গিয়ে আমার কথা বলবেন। বলবেন, মেহেরপুরের বেন্দাবন পেটিয়েছে আপনারে। আর ঐ নিশ্চিনপুরেই আছে পূর্ণ হালদার, বিপ্রদাস হালদার। দু'জনেই বুড়ো হয়েছে। তবে বিপ্র ডাঁটো আছে এখনো। হাড়িরামের অনেক গান সে জানে। শুনে নেবেন। তাছাড়া ধা'পাড়ায় আছে আমাদের এখানকার 'সরকার' চারু। সাহেবনগরে আছে ফণী দরবেশ। বাবু, যাবেন কিন্তু অবশ্যই।

●

পাঠকদের নিশ্চিন্তপুরে নিয়ে গিয়ে বলরামীদের মুখোমুখি করার আগে বরং হাজির করা যাক আরো কয়েকটা জরুরি অনুষঙ্গ। মানুষভজন ব্যাপারটি কি? মেহেরপুরের সঙ্গে নিশ্চিন্তপুরের যোগাযোগ হল কবে, কেমন ক'রে? বলরামীদের সাধনা কী ধরনের?

আর পাঁচটা উপাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বলরামীদের খুব একটা মিল নেই। গুরুবাদে এরা বিশ্বাসী নয়, কাজেই মন্ত্রদীক্ষা বা শিক্ষা নেই। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতো প্রর্বত-সাধক-সিদ্ধ এসব স্তরপরম্পরার সাধনমার্গ এদের নেই। বেশির ভাগ লৌকিক সাধনার যা সামান্য লক্ষণ, অর্থাৎ নারীসঙ্গী নিয়ে কায়াসাধন তা এরা করে না। তাই এ ধর্মে বিকৃতি কম। গুরুবাদ নেই বলে ভক্তের উপর শোষণ কম। এদের ধর্মের আচরণবিধি খুব সহজ সরল। সম্প্রদায়ে উচ্চবর্ণের কেউ নেই। একেবারে নিম্নবর্ণের হিন্দু, অন্ত্যজ ব্রাত্য সব মানুষ আর কিছু দলছুট মুসলমান এদের দলের অংশীদার। মুসলমান থেকে বলরামী হয়েছে যারা, তারা হাড়িরামকে বলে হাড়িআল্লা। এদের মুরুব্বিদের অত্যাচার নেই, উচ্চবর্ণ, গুরু নেই। তাই গদি নেই, খাজনা নেই, মন্ত্রতন্ত্রের অভিচার নেই, আখড়া নেই, আসন নেই। আসন মোট দু'জায়গায়। এ বাংলায় নিশ্চিন্তপুর, ও বাংলায় মেহেরপুর। আলখাল্লা, জপমালা, তসবি বা খেলকা ...র নেই।

আসলে বলরামীরা মানুষভজনে বিশ্বাসী। মানুষ, তাদের মতে, কারিকর হাড়িরামের সৃষ্টি। ঈশ্বরের নয়। সংসারে থেকে এ ধর্মের সাধনা করতে হয়। এরা মনে করে, হাড়িরাম যেমন আঠারো তত্ত্ব দিয়ে মানবদেহ গঠন করেছেন, তেমনই সেই দেহ চালাচ্ছেনও তিনি। একটা গানে বলছে :

হাড়িরাম কলমিস্তিরি হেকমতে চালাচ্ছে এ কল।

আর একটি গানে রয়েছে : `

হাড়িরাম মানবদেহ বানিয়েছে এক আজব কল।
বলের সৃষ্টি বলে করায় মন আমার
বল্ বিনে চলবে না কল।

এখানে 'বল্' মানে রক্ত।

যদিও এরা অবতারবাদে বিশ্বাসী নয় তবু সম্ভবত বৈষ্ণব ভাবাপন্নদের মনে প্রতীতি আনার জন্য তারা বলে : 'নবদ্বীপে এসে ছিন্নবেশে কেঁদে গেল শচীর গোরা' এবং তারই পরিপূরকভাবে 'কলিকালে মেহেরপুরে পূর্ণমানুষ দ্যাখ্ সে তোরা।' আবার মুসলমানদের মনে হাড়িরাম সম্পর্কে প্রতীতি আনতে গায় .

অসম্ভবের কথা শুনে লাগলো জীবের দিশে।
আল্লাতালা মেহেরাজ মানুষরূপে আসে॥

কিন্তু কেন এই ব্যক্তিভজন ? কেন এমন ক'রে একজন মানুষকে দাঁড় করাবার চেষ্টা ?

আসলে বাঙালীর লৌকিক ধর্মসাধনার দুই রূপ : অনুমান আর বর্তমান। লৌকিক সাধক বলেন · রাধা-কৃষ্ণ-বৃন্দাবন -মথুরা-কুব্জা -কংস-চন্দ্রাবলী এসব কল্পনায় অনুমান ক'রে যে সাধনা তাকে বলে অনুমানের সাধনা। আর বর্তমানের সাধনা হল মানবদেহ নিয়ে। সেই দেহেই আছে বৃন্দাবন, সেখানেই মান-বিরহ-বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে গুরুর নির্দেশিত পথে দেহতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যুগলভজনে যে ঐশী উপলব্ধি সেটাই সঠিক পথ।

বলরামীদের সাধনা আবার ঐ অনুমান-বর্তমানেরও বাইরে আরেক রকমের। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা ক'রে সাহবেনগরের ফণী দরবেশ আমাকে বলেছিলেন : ওসব রাধাকৃষ্ণ দুর্গাকালী আমরা ভজি না। আমরা বলি—'যাহা দেখি নি নয়নে/ তাহা ভজিব কেমনে ?' তাই আমরা হাড়িরামকে ডাকি। তাঁরই জন্যে কাঁদি। মানুষটা তো আমাদের জন্যেই মানুষরূপে জন্ম নিয়েছিল, না কি বলেন বাবু ?

কিন্তু মেহেরপুরের সঙ্গে তেহট্টের নিশ্চিনপুরের যোগাযোগ ঘটল কেমন ক'রে ? আসলে আগেকার দিনে নদীয়া যখন ভাগ হয় নি তখন মেহেরপুর ছিল একটা মহকুমা শহর। আশপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে কেনা বেচা বা মামলা মকদ্দমার কাজে মেহেরপুর আসত মানুষজন। এই রকম কোনো কাজে নিশ্চিনপুরের তনু মণ্ডল সেখানে এসেছিল একবার। নেহাতই দৈবঘটনায় তার

সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বলরামের। বলরামের বাকপটুতা, ঐশীক্ষমতা আর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তনু তাঁর শিষ্যত্ব নেয়। এই তনু থেকেই নিশ্চিনপুরে বলরাম ভজনার শুরু। আস্তে আস্তে ঐ গাঁয়ের মৎস্যজীবী নমঃশূদ্ররা বলরামভজা হয়ে ওঠে। তনুর নির্বন্ধে মেহেরপুর থেকে হাঁটাপথে বলরাম বোধহয় নিশ্চিনপুরে আসেনও ক'বার। সেখানে তাঁর কাছে সরাসরি দীক্ষা নেয় মহীন্দর, রামচন্দ্র দাস, জলধর, সদানন্দ, শ্রীমন্ত আর রাজু ফকির। মেয়েদের মধ্যে দীক্ষা নেয় নুটু, দক্ষ আর জগো। দেখতে দেখতে ধরমপুর, সাহেবনগর, আরশিগঞ্জ, নাটনা, ধা'পাড়া, হাউলিয়া, গরীবপুর, পলাশীপোড়ায় ছড়িয়ে পড়ে বলা হাড়ির মত।

এরা নিজের প্রচ্ছন্ন রেখে ধর্মসাধনা করত। কেননা সমাজে এরা ছিল অন্ত্যেবাসী আর মরা গরীব। তাছাড়া বৈষ্ণব আর সহজিয়ারা বলরামীদের দেখত খারাপ চোখে। বলরামভজন ব্যাপারটা তাদের বরদাস্ত হতো না, কেননা তারা ছিল অবতারবাদী। কুবির গোঁসাই তাঁর গানে লিখেছেন : 'বলরামের চেলার মত/কৃষ্ণকথা লাগে তেতো'। বোঝাই যাচ্ছে, সাহেবধনীরা বলরামীদের খাতির করত না।

অবশ্য তাতে বলরামের কিছু এসে যায় নি। তাঁর জীবিতকালেই তো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর মতাদর্শ। তাঁকে সবাই বলত 'বাচক'। তার মানে তাঁর ছিল অসাধারণ বাক্‌চাতুর্য এবং জগৎ ও জীবনের নানা বিষয়ের তিনি নিগূঢ় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সমস্ত শিষ্যকে সম্মিলিত ক'রে তিনি বছরে তিনবার মহোৎসব করতেন। চৈত্র একাদশীতে বারুণী, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি আর কার্তিকী একাদশী। তার মধ্যে বারুণীতে জাঁক হতো বেশি। শিষ্যরা বলরামকে দোলমঞ্চে বসিয়ে আবীর খেলত। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ৩০ অগ্রহায়ণ (১৮৯০) বলরাম মারা যান ৬৫ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পরও বলরামভজাদের রমরমা কিছুমাত্র কমে নি। কিন্তু দেশবিভাগের ফলে এ সম্প্রদায়ের মানুষজন নানাস্থানী হয়ে পড়ে। তবু নিশ্চিন্তপুরে এখনো এদের বড় ঘাঁটি। সেখানে পালপার্বণ আর বেলতলার নিত্যপূজা একভাবেই চলছে। সে গ্রামে ৫০০ ঘর মানুষের মধ্যে ৪০০ ঘরই বলরামভজা।

এসব খবর আমি আগেই যোগাড় ক'রে নিই সাহেবনগরের ফণী দরবেশের কাছে। মানুষটা বড় নরম। শুধু একগাদা সন্তান হয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। কেবলই খেদ করে আর বলে, 'কারিকর এ আমার তুমি কি করলে!'

ফণী দরবেশ আমাকে ঠেলে পাঠালো নিশ্চিন্তপুরের দিকে।

১ নম্বর তেহট্ট ব্লকের অন্তর্গত ৫২ নম্বর মৌজা, পোষাকী নাম নিশ্চিন্তপুর।

লোকের মুখে মুখে দাঁড়িয়েছে নিশ্চিনপুর। খুব নিশ্চিন্ত জায়গা অবশ্য নয় প্রশাসনের পক্ষে। গ্রামে ঢোকার আগে ব্লক আপিসের একজন বললেন : খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করবেন। এককালে গ্রামটা ছিল টেরর। ডাকাতে ভর্তি। ও আপনার যতই বলরামী-ফলরামী হোক, সাবধানের মার নেই।

আমি অবশ্য অকুতোভয়ে গ্রামে ঢুকলাম। মনে মনে জপতে লাগলাম, মেহেরপুরের বেন্দাবন আমাকে পাঠাচ্ছে ভক্ত্যা রাধারানী সকাশে। আমার তাহলে ভয় কোথায ?

●

মাঠের পর মাঠ পেবিয়ে পাটকেবাড়ির বাস এক পাঁকুড়গাছ তলায় দম ছাড়ল। কনডাক্টর হাঁক পাড়ল নেমে পড়ুন…নিশ্চিনপুর।

অন্তত আধঘণ্টা মেঠো পথে হেঁটে তবে গ্রাম। হদিশ নিয়ে প্রথমে গেলাম বেলতলায় রাধারানীব কাছে। পরিচয় পেয়ে সে সমাদব ক'রে বসাল। সত্যিই দেখবার মতো বিশাল বেলগাছ। তার একটা বড় ডাল ঝুলে পড়েছে। একেবারে পড়ো-পড়ো। তাই ইঁটের গাঁথনি দিয়ে ডালটাকে ঠেকিয়েছে। আদ্যিকালের লক্ষণযুক্ত বেলগাছ। এখানে হাড়িরাম এসেছেন কত! তাই পবিত্র। গাছের গুঁড়ির কাছে ভক্তিভরে বাখা আছে হাড়িরামের একজোড়া খডম। রাধারানী এগিযে এসে বলল . কি দেখচো ছেলে, হাড়িরামের ছিচরণের খড়মজোড়া ? দ্যাখো ভক্তি ক'রে। রোজ বেলা বারোটায় এই খড়মজোড়া তেলে জলে ছ্যান্ কবাতে হয়। সরকারের সেইরকম হুকুম্।

সরকার মানে গভরমেণ্ট ?

না গো ছেলে। সরকার আমাদের প্রধান। ধা'পাড়ায় থাকেন। চারুপদ নাম।

তা খড়মজোড়া স্নান কে করায় ?

আমিই কবি ? তেনার সেবাপুজোর ভার এখন আমাতেই বত্তেছে। আমি চোপর দিন রাত এখানেই থাকি। আমার ভাগ্য।

হাড়িরামের ভোগরাগ কী দিয়ে হয় ?

ওঁর সেবায় সেদ্ধপক্ক ভোগ চলে না। শুধু কাঁচাভোগ। মুগের ডাল ভেজানো, ফল আর আখের বা খেজুরেব গুড়। দোকানের পাক দেওয়া সন্দেশ রসগোল্লা চলে না।

: পুজোর বা ভোগরাগ নিবেদনের কোনো নিয়ম বা মন্ত্র আছে ?

: ভোগরাগ এই বেলতলায় রেখে দু'টো ফুল ফেলে তাঁর নাম করতে হয়। তিনি সেবা করেন। আর যখন চালজল সেবা দিই তখন বলতে হয়—

> হক্ হাড়িরামচন্দ্র তোমাকে চালজল দিলাম
> সেবা করুন আপনি।
> জাতিতত্ত্ব ভাবসত্য তোমা হতেই শুনি।
> তোমায় ভাবি ধ্যানে জ্ঞানে আমাব আর কোনো বাঞ্ছা নাই।
> পলকে পলকে হাড়িরামচন্দ্র যেন তোমার দেখা পাই॥

: হাড়িবামেব মহোৎসব কোনখানে হয ?

: এখানেই। এই বেলতলাতেই সব। চত্তিব মাসের একাদশী, জষ্টি মাসের সংকরাস্তি আর কাত্তিক মাসেব একাদশী—এই তিনবার মচ্ছব। তাছাড়া সঙ্কল্প, মানসিক সব এখানে। এখানেই তিনি থাকেন। কিন্তু এখন জষ্টিমাসেব এই কাঠবেলায় বাছা তুমি অত বকবক কোরো না দিকিনি। তুমি ঐ টিউকলের জলে মুখখান ধুয়ে বসুন। একটু তেনার পেসাদ সেবা হোক। কাঁচাভোগ।

ভক্তি ভ'রে রাধারানী আমার হাতে তুলে দেয় এক খামচা টাটকা আখের গুড আর পেতলের ঘটিতে ঠাণ্ডা জল। গরীব মানুষের দীন আয়োজনেও পূর্ণতার স্বাদ মেলে। পথক্লান্ত শরীব নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে মনে নেমে আসে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। বুঝি যে, বলরামীদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে রয়েছে সারল্য আন্তরিকতা আর আয়োজনহীন উপচার। যেসব বড বড় উপাস্যকে পূজার ছলে আড়ম্বরে আমরা ভুলেই থাকি হাড়িরাম তেমন আরাধ্য নন। তিনি নিত্যজীবিত রয়ে গেছেন শ্রান্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতিটি ক্ষণে আর প্রাত্যহিক স্মরণে।

কথাটা আরো স্পষ্ট হল যখন বেলতলা থেকে পৌঁছোলাম বিপ্রদাস হালদারের মেটে দাওয়ায়। ষাট পেরোনো পেটা চেহারা বিপ্রর। মৎস্যজীবী। ইয়া দু'খানা গোঁফ। আমাকে দেখেই হৈ হৈ ক'রে হেঁকে উঠল, 'আরে, আসুন আসুন। আপনি আসবেন সেকথা বি. ডি. ও. সায়েব বলে পেটিয়েচে। তবে টাইম তো দ্যায় নি! তাই বেলান্ত পথ চেয়ে ব'সে আছি। বেলতলায় গিয়েলেন বুঝি। জয় হাড়িরামচন্দ্র। সবই তাঁর হেকমতের খেল। তা আমাদের ঘরে সেবা নেবেন তো দুপুর বেলা ?

সম্মতি জানাতেই আরেকবার হুংকার দিল: জয় হাড়িরামচন্দ্র। তিনি ব্রাহ্মণকেও সদ্‌বুদ্ধি দ্যান। ওরে কাঞ্চন বিটি, এ বাবুকে গামছা ঘটি দে। গরীবের ঘরের মুড়ি চা একটু খাওয়া। ভাত চড়া। আমি ততক্ষণে খ্যাপ্‌লা জালটা নিয়ে এগুই নদী পানে। যদি একটা মাছ মেলে।

আমি বললাম : এত বেলায় কি মাছ মিলবে ?

'সবই কারিকরের ইচ্ছে, তিনি যখন তোমাকে পেটিয়েছেন তখন মাছও পাটাবেন বৈকি', বলে জাল হাতে এগলো বিপ্রদাস। বাড়ির একটু দূরেই খরস্রোতা নদীর রুপোলি ফালি দেখা যাচ্ছে দাওয়া থেকে। আমি বেশ দেখতে পেলাম বিপ্র নামল নদীর হাঁটুজল ছাড়িয়ে, ছুঁড়ে দিল খ্যাপ্‌লা জাল। তারপর জল টেনে নিরীক্ষণ ক'রে হাত তুলে দিল ওপরে। তার মানে এক খেপেই কেল্লা ফতে। প্রায় ছুটতে ছুটতেই উঠে এল। ধরফর করছে হাতে একখানা পাঁচ-ছশো ওজনের মৃগেল।

আমি দাওয়ায় উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললাম : তুমি তো খুব ওস্তাদ মেছো দেখছি।

বিপ্র তার দাওয়ায় মাছটা রাখল। তারপরে পাকানো গোঁফে চাড়া দিয়ে একগাল হেসে বলল : এতে আমার আর কেরদানি কি আছে ? সবই তাঁর হেকমৎ। আর আপনার ভাগ্য। আপনি বসুন। আমি সক্কলকে খবর দিই।' বিপ্র গুনগুন করতে লাগল :

আরে বল্ হাওয়াতে কইছে কথা
মন আলেক লতা।

দেখতে দেখতে বিপ্রদাসের দাওয়া ভরে উঠল বলরামীদের ভিড়ে। দাওয়ায় জায়গা আর আঁটে না। মুড়ি চা খেতে খেতে আলাপ চলল। সবচেয়ে বয়স্ক ভক্ত পূর্ণ হালদার এসে দণ্ডবৎ ক'রে বসল। খবর পেয়ে গ্রামের ব্রাহ্মণ এক মাস্টারমশাই এসে তাঁর পরিচয় দিয়ে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়ি মধ্যাহ্নভোজের। বাধা দিয়ে বিপ্র বলল, 'বলেন কি ? উনি মেহেরপুর ফেরত লোক, একেবারে খোদ হাড়িরামের অতিথ। কারিকর ওঁর জন্যে ইয়া বড় একখানা মাছ পেটিয়েছেন। তাছাড়া ওঁর আপ্তজ্ঞান হয়েছে। জাত বিচার করেন না।' বলেই হাত তুলে বিপ্র গাইল :

আমার হাড়িরামের চরণ কৃপায় মিলে সব জাতে।
ও তার শুদ্ধ আচার সত্যবিচার দেখলাম সাধুসঙ্গেতে ॥
তব জলে পাক অন্ন ভেদ নাই ছত্তিশ বন্ন
এ সংসারে আর কে পারে হাড়িরাম ভিন্ন ?

দারুণ সুরেলা গলা। তালমানের জ্ঞানটুকুও পাকা। অবাক হয়ে বলতেই হল : কথায় কথায় তোমার এখন গান এল কেমন করে ? গলাখানাও তো চমৎকার

বানিয়েছো !

বিপ্রদাস জিভ কেটে সংশোধন করল, 'আবার ভুল করলেন বাবুমশাই, সবই কারিকরের খেল। আর গানের কথা বলছেন ? সেটা বলার মত। কী বলো হে তোমরা, আমার বাড়িতে ধানের গোলা নেই বটে, নেতান্ত গরীবগুরবো জেলে, তবে এ আমার গানের গোলাবাড়ি', একটা বিকট হেসে বিপ্র বলল, 'চোপর রাত ধ'রে আমি হাড়িরামের গান গাইবো। ও আপনার টেপ রেকর্ডার যন্তরের ফিতে শেষ হয়ে যাবে তবু আমার গান শেষ হবে না। না কি বলো তোমরা !'

সকলে সানন্দে সায় দিল। পূর্ণ হালদার বলল : আর তোর স্মরণশক্তির কথাটা বল্।

খুব সায় দিয়ে গোঁফ মুচড়ে বিপ্রদাস বলল : সেটাও কারিকরের অদ্ভুত কৃপা আমার পর। কোনো জিনিস আমার বিস্মরণে নাই। লেখাপড়া বেশি জানি না, এই ফোর পাশ, কিন্তু হাড়িরামের সব তত্ত্ব আর দীনু গোষ্ঠ সদানন্দর সব গান আমার অন্তরে লেগে আছে। তবে কতদিন থাকবে জানিনে আর আমি চলে গেলে যে এসব গান কে গাইবে কে জানে ! এ ছোঁড়াগুলোর আশনাই বেশি, নিষ্ঠা কম। দেখি, কারিকর কাকে শেখাতে আদেশ করে। আপাতক তো আপনার যন্তরে বন্দী করা থাক। একটা হদিশ থাকবে। বিকেলে আরশিগঞ্জ থেকে আমাদের আরেক গাহকের আসবার কথা। দেখি যদি আসে। সে ব্যাটা বোধিতনে পড়ে আছে তো ? কথা রাখতে পারে না।

: 'বোধিতন কি ?' আমি জিজ্ঞেস না ক'রে পারলাম না।

বিপ্র তুড়ি মেরে বলল : জানবেন জানবেন। সবই জানবেন। সেসব হলো নিগূঢ় তত্ত্ব। বেদবেদান্ত ছাড়া। কারিকর যখন তোমাকে পেটিয়েছে আর মেহেরপুর যখন ঘুরে এসেছো তখন আপনার অজানিত কিছুই থাকবে না। এখন বসুন দু দণ্ড। স্নান সেবা হোক। ততক্ষণে আমি একটা ডুব দিয়ে বেলতলায় কাঁচাভোগ সেবা দিয়ে আসি।

বাইরে জ্যৈষ্ঠের অসহ্য দাবদাহ, দাওয়ায় বিশ্বাসী ভক্তদের স্নিগ্ধ সমাবেশ। আমার মনের পর্দায় ফিল্মের মতো ঘুরে যাচ্ছে মেহেরপুরের ভৈরব নদীর ধারে বলরামের মন্দিরের রহস্যময় উদ্ভাস—বৃন্দাবনের সরল মুখ আর বিশ্বাসভরা দু'খানা আকুল চোখ। ভাবতে আশ্চর্য লাগছিল, দেড়শো বছর আগেকার একজন ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী এদের পরিত্রাণের মন্ত্র এনে দিয়েছে। রক্তে দিয়েছে প্রত্যয়। পায়ের তলায় শক্ত মাটি। বেদ বেদান্ত ব্রাহ্মণ শাস্ত্র সব কিছু দলিত মথিত ক'রে গ্রামে গ্রামে এ কোন গুপ্ত প্লাবন ? অথচ এরা দীন দরিদ্র দুঃখভারনত। এদের রক্তে সত্যিই ডাকাতির নেশা আছে ? এদের পূর্বপুরুষরা

কি বেছে বেছে ব্রাহ্মণ আর উচ্চবর্ণের বাড়িতে ডাকাতি করত ? সে কি তবে প্রতিশোধ ? সবকিছু কেমন অলীক মনে হতে লাগল।

গেজেটিয়ারে দেখেছিলাম নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বয়স দেড়শো বছরের বেশি। আগে ও জায়গায় ছিল জঙ্গল। উচ্চবর্ণের অত্যাচারে কিছু শূদ্র এখানে পালিয়ে এসে জঙ্গল কেটে বসত করেছিল। তারপর একদিন সেই অবমানিত মানুষদের মধ্যে বলরাম তুলে ধরেছিলেন বিশ্বাসের ছবি, বাঁচার প্রত্যয়। সে সময়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত তনু মহীন্দর রামচন্দ্র জলধর সদানন্দ শ্রীমন্ত রাজুরা আজ কোথায় ? এদের মধ্যে কি তাদেরই সন্তান সন্ততি ? সকলের বংশ কি এখানেই ? নাকি তারা দেশান্তরে।

নব্বই বছরের পূর্ণ হালদার নম্রকণ্ঠে বললে : সকলের খবর তো জানা যায় না। তবে তনুর তো বংশ নেই, বিবাহই করে নি। দিনু বাংলাদেশের আমঝুপিতে ছিল। এখনো বংশ আছে। কুঞ্জর নাতি জয়দেব কাছেই ভবানীপুরে থাকে। ধনঞ্জয়ের বংশ আছে বীরভূমে। রাজু ফকিরের আশ্রম আছে পলাশীপাড়া ঘাটে। সদানন্দর বংশ আছে পঞ্চকোটিতে। মহীন্দর শ্রীমন্ত দক্ষ আর জগো তো হাড়িরামের সঙ্গে মেহেরপুরে চলে গিয়েছিলেন। কী জানি কী হল। তাঁরা তো সব সিদ্ধ মানুষ। কারিকরেব সঙ্গে আছেন।

: আচ্ছা, হাড়িরামেব শিষ্যদের সম্পর্কে কোনো কিম্বদন্তী বা অদ্ভুত গল্প নেই ?

: তাঁরা তো সকলেই ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। অলৌকিক। কেবল আমাদের শেখাবার জন্যে কারিকরের সঙ্গে মনুষ্যদেহ নিয়েছিলেন। তবে শুনেছি আমাদের নিশ্চিনপুরের শ্রীমন্ত হাড়িরামের সেবা করতে করতে একটা অঙ্গ পেয়েছিল। তাঁর জন্মেছিল এক রত্তি লেজ।

: তবে কি সে ছিল হনুমানের অবতার ? তোমরা তাই মানো ?

: কী ক'রে বলি সে সব নিগূঢ় তত্ত্ব। তবে তিনি ছিলেন আমাদের প্রথম সরকার। তেনা থেকেই আমাদের শাস্তরের উৎপত্তি। তাঁর থেকেই সব শিক্ষা।

: তাঁর পরে কে সরকার হয়েছিলেন ? সরকার কীভাবে ঠিক হয় ?

: পুরোনো সরকার দেহ রাখলে নতুন সরকার ঠিক হয়। শ্রীমন্তের পর কে হন আমরা জানি না। তবে আমার জ্ঞান হবার পর থেকে সাহেবনগরের গোষ্ঠকে সরকার দেখেছি। তাঁর দেহ চলে গেলে আমাদের সরকার এখন ধা'পাড়ার চারু মণ্ডল।

: সরকারের ছেলে বুঝি সরকার হয় না ?

: হতে বাধা তো কিছু নেই। সে রকম গুণগরিমা জ্ঞান থাকলে হয়, হতে

পারে। বাচক হতে হয়। হাড়িরামতত্ত্ব সকলকে বোঝাবার ক্ষ্যামতা চাই সকলের মান্যমান হওয়া চাই। আর হতে হয় নিত্যনের সাধক। যেমন ধরুন আমাদের আগেকার সরকার গোষ্ঠর ছেলে ফণী। খুব গুণগরিমাঅলা মানুষ জ্ঞানবুদ্ধিও পাকা। কিন্তু গোষ্ঠের দেহ রাখার পর তাকে 'সরকার' করা গেল না।

: কেন?

: অনেকগুলো সন্তান তার। কোথায় এয়োতন থেকে নিত্যনের সাধন করবে, তা নয় পড়ে গেল বোধিতনের ফাঁদে।

: এসব কথা তো কিছুই বুঝছি না। এয়োতন, নিত্যন বোধিতন··

পূর্ণ গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওসব বুঝবেন বিপ্রদাসের কাছে। এখন একটা গান শোনেন। যদি মর্ম কিছু বোঝেন।' কাঁপা গলায় গান ধরল পূর্ণ—

এবার ভক্তিভাবে ভাবো তারে
নইলে উপায় নাইকো আর।
হাড়িরামের চরণ করো সার॥
মন আমার বোধিতনে থাকলে প'ড়ে
পড়বি সব যুগের ফেরে দ্যাখ্ বিচারে।
বোধিতনে বদ্ধ হয়ে থেকোনাকো মন আমার
হাড়িরামের চরণ বিনে গতি নাহি আর॥

পূর্ণ বলল, 'কারিকরের কি খেলা! এ গান গোষ্ঠদাসের রচনা অথচ তার নিজের সন্তান ফণী পড়ে গেছে এই বোধিতনের পাকে।'

এমন সময় হৈ হৈ শব্দে এসে পড়ল বিপ্রদাস। পূর্ণ তাকে কাছে ডেকে কানে কানে কি যেন সব বলল। বিপ্র এক লাফ মেরে বললে : হবে হবে সব হবে। সব শুনবেন। সে সব অনেক রাতের ব্যাপার। বেলতলায় শুনতে হয় সে সব তত্ত্ব। আমি বেলতলার কারিকরের কাছে হুকুম নিয়ে এসেছি। গানও শোনাবো অনেক। কিন্তু জানেন তো আগে ভোজন পরে ভজন।

আমি বললাম : এও কি কারিকরের কথা নাকি?

বিপ্র গোঁফে তা দিয়ে বললে : না। একথাটা কারিকরের নয়। এটা তাঁর অধম পেটেল বিপ্রদাসের। এই তোরা সব বাড়ি যা এখন। স্নানসেবা সারগে যা। বাবু তো আর পালাচ্চে না। একবার এয়েচেন যখন তেরাত্তির বাস নিয়ম।

সারাদিনের দিগ্‌দাহ যখন জুড়িয়ে এল তখন নামল সন্ধ্যা মায়াময় রূপে। হু হু বাতাস। আকাশে একখানা মানানসই চাঁদ। বিপ্রদাস আর আরশিগঞ্জের সেই গায়ক একটানা গান গাইতে লাগল নদীর পাড়ে বসে। সঙ্গে একতারা আর

আনন্দলহরীর সঙ্গত। কখন গান থেমে গেছে, কখন সবাই চলে গেছে, কিছুই জানি না। ঘুমের জড়িমা আমাকে একেবারে কাতর ক'রে দিয়েছিল। ক্লান্ত শরীর আর শ্রান্তিহারী হাওয়া। আমার দোষ কি ?

বিপ্রদাস যখন ডাকল তখন বেশ রাত। দু'জনে চললাম বেলতলার দিকে। সারা গাঁ নিশুতি। গা ছম ছম নীরবতা। বেলতলায় একা রাধারানী শুধু প্রদীপ জ্বালিয়ে ধ্যানস্থা। দু'জনে তার কাছাকাছি বসতেই বিপ্র হুংকার দিল—

বীজে কলে একস্থানে উৎপত্তি আমার।
হাড়ি রামচন্দ্র সেই বল্ শক্তি
ইহার তত্ত্ব জানেন যেই ব্যক্তি
তাহার চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ।
তিনি যাহা বলেন হাড়িরামের বলের বলে ॥

এবপরে বিপ্র আর রাধারানী বেলতলার খড়মে ফুলজল দিয়ে দ্বৈত কণ্ঠে বলল—

হাড়িরামচন্দ্রের শ্রীচরণে ফুলজল দিলাম। ধরাতলে ধন্য হলাম।
রূপযৌবন নয়নমন অর্পণ করিলাম।
আমি দুর্বল। দুর্বলেরি বল তুমি। সকল জানে অন্তর্যামী
কেবল তোমারই গুণ গাই। শুন অন্য কাহারে না জানি ॥

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। এলোমেলো হাওয়া। বিপ্রদাসের চোখ দু'টো জ্বলছে। রাধারানী ধ্যানস্থা। হঠাৎ বিপ্র গালবাদ্য বাজিয়ে বলল : জয় হক্ হাকিম হাড়িরামচন্দ্রের জয়। শুরু হোক সৃষ্টিতত্ত্ব।

রাধারানী চোখ বন্ধ রেখেই বলতে লাগল—প্রথমে হক্ হাড়িরাম। তাঁর থেকে হৈমবতী আর নারদের জন্ম।

বিপ্র বলল : আর এই হৈমবতী হতেই জন্ম নিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। ব্রহ্মার সন্তান দুটো—ঘামকাঞ্চনী আর ভগবতী। ভগবতী হ'তে অঘাসুর বকাসুর কংসাসুর আর লোহাসুরের জন্ম।

রাধারানী বলল : আর ঘামকাঞ্চনীর সন্তান তিনজন—কালু মুরারি বাসুদেব। এই কালুর সন্তান হল—খাগর, নাগর, নীলাম্বর আর মন্মথ। মুরারির সন্তান—লোকনাথ, জীবন, আজির মেথর আর ভুষি ঘোষ। বাসুদেবের সন্তান—শানমৃগ, গজকন্যা আর মুনিবালক।

বিপ্রদাস আরেকবার গালবাদ্য বাজিয়ে বলল : এইখানে সাঙ্গ হল ব্রহ্মার বংশ। এবারে বিষ্ণু বংশ শোনেন রাধারানীর মুখে।

'বিষ্ণুর বংশ মস্ত বড়', নিমীল চোখে বলে চলে রাধারানী, 'তাঁর তিন সন্তান—ঝো-কালি, মুছুন্দরী কালি আর মুসুক কালি। ঝো-কালির সন্তান নেই। মুছুন্দরী কালির সন্তান হাওয়া আর আদম। এই আদমের সন্তান হাবেল আর কাবেল। কাবেল হ'তে নিকাড়ি, জোলা আর রাজপুত জাতের জনম। ইদিকে হাবেল হতে সেখ, সৈয়দ, গোমল, পাঠানের জনম।'

বিপ্র বলল : এবারে শুনুন আমার ঠাঁই। সেখ থেকে জন্মালো চারটে জাত—জিন সেখ, পরী সেখ, হাইদুলি সেখ আর দুলদুলি সেখ। সৈয়দ থেকেও চারটে জাত—হুমানী সৈয়দ, আলী সৈয়দ, দুমরা সৈয়দ আর হুরানা সৈয়দ। মোগল হতে চার জাত—লাল মোগল, নীল মোগল, সুন্নি মোগল আর শিয়া মোগল। পাঠান হতেও চার জাত—ছুর, ছুরানি, লুধি, লোহানি। ব্যস। এবারে বাকি আছে মুসুক কালির বংশ বেত্তান্ত। শোনেন তা রাধারানীর ঠেঁয়ে।

: মুসুক কালির তিনসন্তান—পরাশর মুনি, নমস মুনি আর ঋষভ মুনি। এই পরাশর মুনির এগারো সন্তান—যথা, ছাগ বাঘ নাগ শকুন মুসক মশক হাজত ঘোড়া বিড়াল উট আর হনুমান। ইদিকে নমস্ মুনির সন্তান একুনে বারোজন, যথা—জরলাল ফরলাল গ্রহক নৈনি শিউলে নুলো আলতাপেটে মুগলবেড়ে মালদহী ঝাপানি পুরকাটা আর চং।

বিপ্র বলল : ঋষভ মুনির চার ছেলে—দরশন নরশন পরশন আর পদ্ম। এখন নরশন থেকে হল নাপিত। পরশন থেকে ধাই আর পদ্ম থেকে হল মুচিরাম দাসের জন্ম। দরশনের সন্তান তো অজস্র। গুণে নেন বাবু। দোবে চোবে তেবে পাঠক পাঁড়ে উবিদ্ধি তেওয়ারি মিশির মেতেল দেবেল ঠাকুর বিষণ আর শুকুর। তেরোজন হল ? এবারে সৃষ্টিতত্ত্ব সাঙ্গ কর।

রাধারানী বলল : 'রইল বাকি শিবের অংশ। শিবের সন্তান কার্তিক গণেশ আর সরস্বতী। কার্তিকের সন্তান অর্জুন, গণেশের সন্তান ভুঁইমাসুর। আর সরস্বতী চিরকুমারী ব্রহ্মচারী।

বিপ্র সেই নিশীথ রাত্রিকে কাঁপিয়ে বলল : ইতি নমো সৃষ্টিতত্ত্ব। হক্ হাকিম হাড়িরামের নামে বলিহারি দাও।

বিপ্র আর রাধারানী গদ্‌গদ্ চিত্তে এবং আমি খানিকটা হতভম্ব হয়ে একসঙ্গে তিনবার বলে উঠলাম—বলিহারি বলিহারি বলিহারি।

রাতের কত প্রহর তার নিশানা নেই। সবদিক শান্ত স্তব্ধ। শুধু অদ্ভুত তিনটে মানুষ যেন জেগে আছে এত বড় বিশ্বে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব শুনব বলে আমরা তিনজনই একাহারী আছি। তাই নিয়ম। যে বলে আর যে শোনে দু'জনকেই আহার নিদ্রা থেকে বিরত থাকতে হয় রাত দু'প্রহর থেকে। কেমন যেন অবাক

লাগছে সব কিছু। এতক্ষণ এসব কী কথা শুনলাম ?

কিন্তু বেশিক্ষণ সে বিস্ময় পোহানো গেল না। বিপ্রদাস বললে : এবার রাধারানী একা যাপন করবে বাকি রাতটুকুন। আসুন আমরা একটু ওধারে গিয়ে কথা বলি। আমাদের তনের সাধনা আপনাকে বলব। সেটাই হাড়িরামের নিগূঢ় তত্ত্ব।

বেলতলার বিপরীত দিকে একটা ঘাসের জমিতে জমিয়ে বসতেই বিপ্র বলতে লাগল : আমাদের মতে গুরু নেই, সাধনসঙ্গিনী নেই। হাড়িরাম বলে গেছেন সবচেয়ে দামী সাধনা সেইটা যাতে 'সখার সখী নেই, সখীর সখা নেই'। একেই বলে খাসতনের সাধনা। আমাদের হাড়িরাম ছিলেন একমাত্র খাসতনের সাধক। কিন্তুক খাসতন বুঝতে হলে আগে আপনাকে বুঝতে হবে আর সব তনের থাক বা ঘর।

আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই কারণ বিপ্রই বলে যাচ্ছে অনর্গল।

: 'হাড়িরামের ধর্ম বৈরাগ্যের নয়। এ হল গিয়ে গৃহীর সাধনা। তাই আমাদের সাধনার আদি থাক্ হল এয়োতন। তার মানে হাড়িরামের মনের মানুষ জন্মদ্বারে যাবে অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গম করবে শুধু সৃষ্টির জন্যে। তাই বৃথা সঙ্গম নয় আর রোজ সঙ্গম নয়। আমাদের মতে বৃথা বীর্যক্ষয় নরহত্যার সমান পাপ। তাই স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের সাড়ে তিনদিন পরে অর্থাৎ চতুর্থদিনে সহবাস করতে হবে সুসন্তান কামনা ক'রে। এই সহবাসই এয়োতনের ধর্ম। ঐ সাড়ে তিন দিনের সময় রক্তের রং হয় পীতবর্ণ। এই সাড়ে তিন আমাদের আপ্ততত্ত্ব।' বলেই গান ধরল বিপ্রদাস—

> আরে ঐ বৃন্দাবন হ'তে এলো সাড়ে তিন রতি
> ঐ পথেতেই এয়োতনের যেন থাকে মতি ॥

আমি বললাম : এই তাহলে এয়োতনের সার কথা ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আরো কথা আছে। হাড়িরাম বলে গেছেন সন্ধে-রাতে স্ত্রী সহবাস করলে সে সন্তান জন্মায় সে হয় চোর। আবার সন্ধ্যার পর কিন্তু রাত বারোটার মধ্যে সঙ্গম থেকে যে সন্তান হয় সে হবে ডাকাত। তাহলে বুঝলেন তো রাত বারোটার পরই সহবাস ভালো। তাতে সুসন্তান হয়। আর ভোরবেলার সহবাসে জন্মায় দেবগুণান্বিত সন্তান!

বিপ্রদাস ব্যাপারটাকে গুছিয়ে বলল : এয়োতনের ধর্ম তাহলে কি দাঁড়ালো ? শুধু সন্তানের জন্য জন্মদ্বারে যাওয়া, সেও ঐ সাড়ে তিন রাত্তিরে। অন্যদিন সহবাস নিষিদ্ধ। স্ত্রী ঋতুমতী না হ'লে বৃথা সঙ্গম অর্থাৎ কাম এয়োতনের ধর্ম

নয়।

প্রজনন তত্ত্বের এহেন ব্যাখ্যা আমি কখনো শুনি নি, তাই কৌতূহল জাগল। বিপ্রদাস ক্রমে বুঝিয়ে দিল 'নিত্যন্' হল এয়োতনের পরের ধাপ। গৃহস্থ ধর্মে এয়োতন মেনে একটা-দু'টো সন্তান জন্মালে নিতে হবে নিত্যনের পথ। তখন মনের মধ্যে আনতে হবে সংসারে অনাসক্তি আর জন্মদ্বারে ঘৃণা। জন্মদ্বারকে পচা গর্তরূপে ভেবে তাকে চিরতরে ত্যাগ করতে হবে। সংসার আর জগতের আইন কানুনের বাইরে গিয়ে নিত্যপুরুষ হাড়িরামের ধ্যান করতে হবে। নির্জন মাঠে, নদীর ধারে বা বেলতলায়। মেহেরপুরের বৃন্দাবন আর নিশ্চিনপুরের রাধারানী নিত্যনের পথে আছে।

কিন্তু সবচেয়ে কঠিন সাধনা বোধ হয় খাসতনের। একা হাড়িরাম শুধু এ সাধনা করতে পেরেছিলেন। আর কেউ পারবে না। খাসতন হল চরম মুক্তির সাধনা। পৃথিবীর আলো হাওয়া আকাশ গাছপালা নদী পাহাড় বন মাঠ এরা খাসতালুকের প্রজা। স্বাধীন। এরা কাউকে খাজনা দেয় না। এদের বেঁচে থাকতে গেলে কোনো মূল্য দিতে হয় না। মানুষকে বেঁচে থাকার মূল্য দিতে হয় বীর্যক্ষয় আর বীর্যগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। যে মানুষ কোনোদিন তার বীর্যক্ষয় করে নি সে খাসতনের সাধক। একমাত্র হাড়িরাম তা পেরেছিলেন, তাই তিনি জগৎস্রষ্টা কারিকর।

এই অবধি বোঝার পর আমি বললাম : এবারে আমি বোধিতন বুঝেছি। বোধিতন মানে কামের দ্বারে একেবারে বন্দীত্ব আর তার জন্যে অনুতাপ। তাই না ?

: ঠিক তাই। বোধিতন হল জ্ঞানপাপীর দশা। আমরা সবাই তাই। হাড়িরাম বলে গেছেন, যে প্রতিদিন সঙ্গম করে আর অকারণ বীর্যক্ষয় করে সে পড়ে বোধিতনের ফাঁদে। হাড়িরামের সব শিষ্য এই বোধিতন থেকে মুক্তি খোঁজে, কাঁদে। নিত্যনের জন্যে চোখের জল ফেলে। এই আমার কথাই ধরুন। প্রত্যেকদিন দু'বেলা বেলতলায় মাথা কুটি আর কারিকরকে বলি, খাসতন তো পাবো না এ জন্মে, অন্তত নিত্যনের পথে একটু এগিয়ে দাও। গোষ্ঠদাসের গান শুনুন—

বোধিতনে বদ্ধ হয়ে থেকোনা রে মন আমার
হাড়িরামের চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
আর অন্য উপায় দেখিনে থাক্ একিনে
আবার মানব হবি যদি হাড়িরামের চরণ করো সার ॥

গানের করুণ সুর সমস্ত পরিবেশকে গাঢ় ক'রে দিল। যেন আমার চেতনা থেকে অস্পষ্টতা কেটে গিয়ে উদ্যত সত্যের মতো আকাশে জেগে রইল শেষ বাতের দীপ্ত চাঁদ। গানের ভাবে আর সুরে সমস্ত পৃথিবীর কামমোহিত সকল মানুষের অসহায় মাথা কোটা যেন আমি শুনতে পেলাম। মনে হল এ কোনো লৌকিক ধর্মের বানানো তত্ত্ব নয়। এর মধ্যে চিরকালের লৌকিক মানুষের অসহায় অনুতাপ আর কান্না।

গানের সুব শেষ হলেও কান্না থামে নি বিপ্রদাসের। আমি তার পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে মমতাব সঙ্গে কাঁধে হাত রাখলাম। অমন শালপ্রাংশু মানুষটা আত্মধিক্কাবে একেবাবে কুঁকডে গেছে। আমি তাব হাত ধবে বেলতলার দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললাম . শান্ত হও। হাডিবামকে ডাকো। তোমার তো অনেক বয়স হয়েছে। আব ভয কি ?

বিপ্রদাস করুণ কণ্ঠে বলল · বাবু, আমাব ভিতরেব পশুটা যে আজও মরে নি।

শেষ চাঁদের ঝিলিক মারা আলোয় পা ফেলে বেলতলায় গিয়ে দাঁড়াই দু'জন। গাছতলায় হাড়িরামের খডমের কাছে জ্বেলে দেওয়া প্রদীপ এত হাওয়াতেও নেভে নি। ধ্যানতন্ময় রাধারানীর মুখে পড়েছে সেই আলো। সেইদিকে চেয়ে ভাবলাম কোথায় গেল মেহেবপুরের সেই মেধাবী সিদ্ধ সাধক ? কোথায় তার তনু সদানন্দ শ্রীমন্ত নুটু জগো দক্ষ ? নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে, অবনত অবমানিত মানুষদের বাঁচাতে তৈবি হযেছিল যে শাস্ত্র তাতে তো কই একফোঁটাও কলংক লাগে নি !

'যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি'

সব মানুষের বোধহয় ভেতর ভেতর চেষ্টা থাকে তার মনের অতলে ডুব দেবার। সকলেই কি তাই ভালবাসে তার আত্মনিঃসঙ্গতার স্বাদ ? সকলে কি সেইজন্য ভীড়ের কথা বলে, কাজের চাপের কথা বলে ? খুলতে চায় কাজের জট, এড়াতে চায় ভীড়ের জটিলতা। বহুজনতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা খুঁজতে চায় নিঃসীম একাকীত্ব। অথচ কতবার এর উল্‌টোটাই দেখেছি। সাধক যারা, যারা দেহাত্মবাদী, চলতি কথায় যাদের বলে আউল বাউল দরবেশ, তাদের গভীর নির্জন সাধনায় কেমন ক'রে যেন চিরকালের নিঃসঙ্গতা কায়েম হয়ে যায়। ভীড়ে তাদের ভয় থাকে না নিজেকে হারাবার। বোধহয় সেইজন্যেই তাদের সারাবছর ধরে এত মেলা আর মহোৎসব, দিবসী আর পার্বণ। কতবার সোৎসাহ আমন্ত্রণ পেয়েছি এসবে। 'আসবেন ১৪ই ফাগুন মচ্ছবে, আমার গুরুর আখড়ায়। খুব আনন্দ পাবেন।' আসলে আনন্দ সবচেয়ে বেশী আমন্ত্রণকর্তার। এ তো আমাদের শহরের ক্লিষ্ট কর্তব্যতাড়িত সমাবেশ নয়। কোথায় একটা প্রাপ্তির সানন্দ বিস্তার আছে দেহতত্ত্ববাদীর ডাকে। বহুসময় জিগ্যেস করেছি : কি আনন্দ পান ? খরচও তো প্রচুর।

: হিসেবের বাইরে একটা আনন্দ আছে যে ! মানুষ দেখার আনন্দ। অনেক মানুষ আসবে। অনেক মানুষের সেবা দেওয়া যাবে। সব জাত সব বর্ণের মধ্যে সেই মানুষকে, সেই আসল মানুষকে দেখা যাবে।

: অত মানুষের ভীড়ে আসল মানুষকে চিনবেন কি ক'রে ?

: সে চেনা যায় আজ্ঞে। চকমকি দেখেছেন ? লোহা আর পাথরের ঘর্ষণে সত্যিকারের আগুন এসে যায়। তেমনই মানুষে মানুষে মেশামেশি থেকে আসল মানুষ ভেসে ওঠে। এ আমরা অনেক দ্যাখ্‌লাম। ও সব হিমালয় টিমালয় গেলে কিস্যু পাবেন না। লালন বলে 'মানুষ ধরলে মানুষ পাবি/ও সব তীর্থব্রতের কর্ম নয়'। তাই আপনাকে বলছি, এ সব বাউল ফকিরদের পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করবেন না। মেলায় মিশবেন।

রয়েল ফকিরের কাছ থেকে এসব আমার শোনা, তা বিশবছর তো হ'লো। রয়েল ফকির। নামটার মত মানুষটার মধ্যে ছিল মস্ত রাজকীয়তা। লম্বা সুগঠিত

চেহারা। আমাকে খুব সহজে বুঝিয়েছিল : বাবু, আসল মানুষ কাছে পিঠেই নড়ে চড়ে কিন্তু খুঁজলে জনমভর মেলে না। দুই ভুরুর মাঝখানে যে সূক্ষ্ম জায়গা তাকে বলে আরশিনগর। সেইখানে পড়শী বসত করে। পড়শী মানে মনের মানুষ। আরশি ধরলে পড়শী আর পড়শী ধরলে আরশি, কিছু বুঝলেন ?

: অন্তত এইটুকু বুঝলাম যে আরশিনগরে পৌঁছোতে গেলে মানুষকে এড়ালে চলবে না, পড়শী ধরতে হবে।

: বিলক্ষণ। বাবু, আপনার আসল কথাটা বোঝা সারা। এবারে ক্রিয়া আর করণ।

: সেটা কি বস্তু ?

'সেটাই আসল' রয়েল ফকির বলে, 'মনে মনে জানা, ধ্যানে জ্ঞানে জানা, এবারে তাকে দেহ দিয়ে কায়েম করা, সেটাই আসল। যেমনধারা আপনি শুনলেন গাছে সুন্দর ফল পেকেচে। শুনলেই তো হবে না। দেখতে হবে, খুঁজতে হবে, গাছে উঠতে হবে এবং সবশেষে খেতে হবে। তবে সাঙ্গ হ'লো। তা অত কথায় কাজ কি ? আপনি আমাদের বড় বড় ক'টা বিখ্যাত মেলায় যাবেন, আচ্ছা আমার সঙ্গেই যাবেন। আমি সব বুঝিয়ে দেব। তাহ'লে সেই কথাই রইলো। আপনি প্রথমে যাবেন দোলের সময় ঘোষপাড়ায়। সতী-মা-র মেলায়। দোলের আগের দিন প্রভাতে আমার আখড়া থেকে রওনা। চলে আসবেন তৈরি হয়ে। থাকতে হবে তেরাত্তির। ব্যাস্ পাকা কথা।'

আমি বললাম : কথা পাকা। কিন্তু ঐ মেলা সম্পর্কে আগে বইপত্তর থেকে আমি একটু লেখাপড়া ক'রে নেব। খুব বিখ্যাত মেলা তো। দুশো বছরের মত প্রায় বয়েস। মেলাটা সম্পর্কে একটু খুঁটিনাটি জেনে নেব।

: সে সব জেনে নেবেন বৈকি। আপনারা জ্ঞানের পথের লোক তো। সব বাহ্য বিষয়ে নজর তাই। তবে আমরা হলাম ভাবের পথের লোক। আমাদের চলতে চলতেই সব বোঝা হয়ে যায়।

: কতদিন ধ'রে যাচ্ছেন ঘোষপাড়ার মেলায় ?

'সে কি আজ থেকে গো ?' রয়েল ফকির তার শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো, 'সে আমার জ্ঞান হওয়া ইস্তক। অর্থাৎ আমার দাদু-গোঁসাঞিয়ের কাল থেকে'।

: দাদু-গোঁসাঞি মানে ?

: কথাটা ধরতে পারলেন না বুঝি ? আমার যিনি বাবা আবার তাঁর যিনি বাবা তিনি আমার কে ? না, দাদু। তেমনই আমার যিনি গুরু তিনি আমার গোঁসাঞি। আর আমার গোঁসাঞিয়ের যিনি গুরু তিনি আমার দাদু-গোঁসাঞি। এবারে

বুঝলেন ?

: বুঝলাম। কিন্তু এইটে বুঝলাম না যে যারা বৈরাগ্যের পথে নেমেছে তারা সব সংসারী লোকের মত দাদু-নাতি সম্বন্ধ পাতায় কেন ?

: শুধু দাদু-নাতি নয়। গুরু পিতা শিষ্য সন্তান। গুরুপত্নীকে শিষ্য বলে মা-গোঁসাঞি। আমাদের চলতি কথায় শিষ্যসেবক না বলে বলে শিষ্যশাবক। সব সম্পর্কে বাঁধা। আমাদের পথ যে রসের পথ বাবা। তালগাছ দেখেছেন ? খেজুর গাছ ? সব খাড়া উঠে গেছে মাটির দিকে ফেরে না আর। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী ধর্ম ঐরকম মাটি আর মানুষের দিকে নজর নেই। আর আমাদের সতীমার ধর্ম হ'লো গৃহীধর্ম। বটগাছের মতন। কেবলই ঝুরি নামছে। ছেলেপুলে নাতি পুতি রস টানছে মাটি আর মানুষের কাছ থেকে। গোঁসাঞি, মা-গোঁসাঞি, দাদু-গোঁসাঞি সব নিয়ে আমাদের চলা।

: এই সতী মার ধর্ম বা কর্তাভজা মতের শুরু কোথা থেকে ?

: কেন ? আউলচাঁদ থেকে ?

: আউলচাঁদ কে ?

: আউলচাঁদ গোরাচাঁদের অবতার। শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথের মন্দিরে গোরাচাঁদ হারিয়ে যান। তারপরে আউলচাঁদের রূপ নিয়ে এই ঘোষপাড়ায় তাঁর উদয়। এবারে তাঁর জন্ম হয়েছে গৃহীদের জন্যে কর্তাভজা ধর্মের পথ তৈরী করার কারণে। তিনিই আদিকর্তা। তাঁর থেকেই এই মত।

: তাহলে সতী মা কে ?

'তাহলে শোনেন সবিস্তারে' রয়েল বেশ ভব্যিযুক্ত হয়ে বসে ভক্তিমানের মত বলে ; 'আউলচাঁদের ছিলেন বাইশজন শিষ্য। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন রামশরণ পাল। সাকিন ঘোষপাড়া মুরতীপুর, জাতি সদ্‌গোপ। তাঁর পরিবারের নাম সরস্বতী। সেই সরস্বতী থেকে সতী। বুঝলেন ?'

আমি তর্ক তুললাম : তা কি ক'রে হয় ? সরস্বতী থেকে সতী ? কেমন ক'রে ?

'হয়, হয়' রহস্যের হাসি রয়েল ফকিরের মুখে, 'আপনি ধম্মের ভেতরকার সুলুক জানেন না, তাই এমন ধন্দ। আচ্ছা, আপনারে বোঝাই। সরস্বতীর আদ্যক্ষর 'স' আর শেষঅক্ষর 'তী' হলো ? এই দুই মিলে সতী। এবারে বুঝলেন ?'

আমতা আমতা ক'রে বলতেই হ'লো, 'ব্যাপারটা বেশ মজার। এ রকম আরও নমুনা আছে নাকি ?'

: বিলক্ষণ। এই যেমন ধরুন রামশরণ আর সতী মার একমাত্র সন্তান হলেন

রামদুলাল ওরফে দুলালচাঁদ। তো সেই দুলালের 'লাল' আর চাঁদের বদলে 'শশী' বসিয়ে তিনি নাম নিলেন লালশশী। এই লালশশীকে আমরা বলি 'শ্রীযুত'। তাঁব লেখা গানই আমাদের ধর্মসংগীত। সে গানের বইয়ের নাম 'ভাবের গীত'। তাকে আমরা বলি আইনপুস্তক। শুক্কুরবাবে সন্ধ্যেবেলা আমরা একসঙ্গে ব'সে শ্রীযুতের আইনপুস্তক থেকে গান করি।

: শুক্কুরবার কেন? ওটা তো মুসলমানদের জুম্মাবার। তবে কি আউলচাঁদের সঙ্গে মুসলমান বা ফকিরিধর্মের কোন যোগ ছিল?

রয়েল ফকির বললে, 'আজ্ঞে সে সব গুহ্যকথা আমার গোঁসাই আমাবে বলেন নি কিছু। তবে লালশশীর গানে যা বলেছে তা গাইতে পাবি। শুনুন—

তার হুকুম আছে শুক্রবারে সৃষ্টির উৎপত্তি
সেই দিনেতে সবে হাজির হবে
যে দেশেতে আছে যার বসতি।
আছে যে দেশেতে যে মানুষ সবে হাজির হন
পরস্পর সেই অষ্টপ্রহর পরেতে স্ব স্ব স্থানে যান।
এই শুক্রবারে প্রহর রাত্রে লয়ে আশীর্বাদ
যার মনে যা বাঞ্ছা আছে পূর্ণ হয় সে সাধ।

রয়েল ফকিরের সঙ্গে আমার যখন এসব কথা হয় তখনও বিখ্যাত লেখক কমলকুমার মজুমদার বেঁচে ছিলেন। কে না জানে এ দেশেব নানা বিদ্যা ও দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। প্রথমবার ঘোষপাড়ার মেলায় যাবার আগে তাই কমলকুমারকে জিগ্যেস ক'বেছিলাম ঘোষপাড়াব মেলা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি সামনের পূর্ণিমায সেখানে যাব।

কমলকুমার প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপরে নাক কুঁচকে বললেন, 'সে তো এক অসভ্য জায়গা মশাই। যাবেন না। শেষকালে কি এক বিপদ আপদে পড়বেন।'

তাঁর কথায় অবাক লেগেছিল। কথা হচ্ছিল এক প্রকাশকেব ঘরে ব'সে। এক গবেষক ফস্ ক'রে তাক থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' খুলে কয়েক জায়গা পড়ালেন। দেখা গেল সহজিযা এই প্রকৃতিভজা ধর্মের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ নানা বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে গেছেন। আবার শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বই থেকে সেকালের বাবুসমাজের বিবরণ প'ড়ে তিনি শোনালেন। বাবুরা নাকি 'খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে

আমোদ করিতে যাইত'।

যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে। গবেষক অনর্গল বলে যান অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে নাকি কর্তাভজাদের সম্পর্কে গালমন্দ আছে। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দু কাস্টস্ অ্যাণ্ড সেক্টস্' বইতে ঘোষপাড়াকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছেন সেই ১৮৯৬ সালে। ওয়ার্ডসাহেব বা উইলসন সাহেবও নাকি রেয়াৎ করেননি। 'এই তো' 'এই তো' বলে ভদ্রলোক শেষমেষ বিনয় ঘোষের বই খুলে একটা জায়গা পডতে লাগলেন :

> এ বৎসর দোলে প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক ; পুরুষদিগের সকলেই প্রায় মূর্খ।
>
> দেখিলাম ২০ রোগী আরোগ্যলাভ করিবার আশায় দাড়িম্বতলায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অন্য অন্য ধর্মাবলম্বিদিগের ন্যায় ইহাদিগের বুজরুকীও অল্প নয়। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বোবা সাজাইয়া 'বোবার কথা হউক' প্রভৃতি বলিয়া রোগ আরাম করিতেছে।
>
> অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি এই ধর্মাবলম্বিদিগের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত কৃষ্ণলীলাটাই অনুষ্ঠিত হয়।

আমি জানতে চাই এ বিবরণ কবেকার ? জানা যায় ১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্রের 'সংবাদ প্রভাকর' কাগজের ২১ সংখ্যা থেকে প্রতিবেদন খুঁজে পান বিনয় ঘোষ। আশ্চর্য হই। একটা গ্রাম্য লৌকিক ধর্ম সেকালে কলকাতার এত মানুষের বিদ্বেষ সয়েছিল ? কর্তাভজাদের আচরণ সকলের এত খারাপ লেগেছিল ? নীতিবাদী ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার কিংবা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ যোগেন্দ্রনাথ না হয় খানিকটা ধর্মান্ধ হয়ে কর্তাভজাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, কিন্তু উদার সমন্বয়বাদী শ্রীরামকৃষ্ণ ? তিনি কেন এঁদের ভুল বুঝেছিলেন ? কমলবাবুও কি রামকৃষ্ণপন্থী ব'লেই ওঁদের বিষয়ে অসহিষ্ণু ?

পরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা স্বস্তিকর তথ্য মিললো নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' বইয়ের চতুর্থভাগে। ১৮৯৫ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল ঘোষপাড়ার মেলার তত্ত্বাবধান। সরেজমিন সেই মেলা দেখে নবীনচন্দ্র লেখেন :

> আমার বোধ হইল 'কর্তাভজা' রূপান্তরে হিন্দুদের 'গুরুপূজা' মাত্র।

তাহাদের ধর্ম বেদান্তের মায়াবাদের প্রতিবাদ। যে-রামশরণ পাল বেদ-বেদান্ত প্লাবিত দেশে এরূপ একটা নূতন ধর্ম প্রচার করিয়া এত লোকের পূজাই হইয়াছিলেন, তিনি কিছু সামান্য মানুষ ছিলেন না। যথার্থই কাল্পনিক মূর্তির পূজা না করিয়া এরূপ পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করিলে ক্ষতি কি ? এখন যে harmony of scripture বা ধর্মের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে, এই রামশরণ পালই তাহা সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম, সকল আচার সত্য—এমন উদার মত এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও ধর্মসংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব রামশরণ পাল, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি এতদিনে কর্তাভজা ধর্ম কি বুঝিলাম, এবং ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে আমাব শিবিরে ফিরিলাম।

পরিষদ পাঠাগারেই দেখা হয়ে গেল এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে। উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ নিয়ে তাঁর কাজ। আমাব সমস্যা তাঁর কাছে ব্যক্ত করতেই দিলেন একগাদা বইয়েব ফর্দ। সেসব বই ঘেঁটে দেখা গেল : উনিশ শতকের গোড়ায় কর্তাভজাদের নিয়ে কলকাতাব ব্রাহ্ম খৃষ্টান আর হিন্দুধর্মের মানুষদের খুব মাথা-ব্যথা ছিল। প্রথমে 'ইতরলোকদের ধর্ম', 'ওদের জাতপাঁত নেই', 'ওরা কদর্যভক্ষণ করে', 'মেয়েমানুষ নিয়ে ওরা গোপনে রাসলীলা করে'—এসব কথা খুব রটানো হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর জাত-বৈষ্ণবদের মধ্যে থেকে বহুলোক ভেতরে ভেতরে কর্তাভজা ধর্মে আকর্ষণ বোধ করছিলেন। সেকালের কলকাতার কৈবর্ত তিলি গন্ধবণিক শাঁখারী বেনে তাঁতী এইসব নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে কর্তাভজাদের কাছে 'ঘোষপাড়ার মত' বা সত্যধর্ম খুব সহজ সরল সাদাসিধা বলে মনে হ'তে লাগল। তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় 'আসন' বানালেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় শুরু হ'ল সমাবেশ। প্রথমে গোপনে পরে সগর্বে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অনেকে, এমনকি অনেক বড় মানুষ কর্তাভজাদের ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেন। যেমন ভূকৈলাশের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। ১২২১ সালে তিনি বেনারসে 'করুণানিধানবিলাস' নামে যে বিরাট কৃষ্ণলীলার কাব্য লিখেছিলেন তাতে রামশরণ পালকে উল্লেখ করেছিলেন অবতার বলে।

কর্তাভজাদের ভক্তি আর বিশ্বাসের তীব্রতা বিপ্লব এনেছিল সেকালের ব্রাহ্ম সেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে। তাঁর জীবনীকার কুলদাপ্রসাদ মল্লিক লিখেছেন :

শশিপদবাবুর সময়ে বরাহনগরে 'কর্তাভজা' নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকগুলি উপাসনাস্থল ছিল। বনহুগলীতে নিমচাঁদ মৈত্রের বাগান এই সমস্তের মধ্যে অন্যতম। এইস্থানে সপ্তাহে একদিন করিয়া নিম্নজাতীয় হিন্দুগণ সম্মিলিত হইত এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে স্তোত্রপাঠ ও আরাধনা করিত। শ্রীযুক্ত শশিপদবাবু সময়ে সময়ে এই স্থানে যাইতেন। তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাদের উপাসনার ঐকান্তিকতার দ্বারা তিনি সেই দলে মিশিয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন।

কর্তাভজাদের সত্যধর্মযাজন এবং জাতিপংক্তিহীন উদার সমন্বয়বাদ সেকালে খুব সাধারণ মানুষদেরও কতখানি দ্বিধায় ফেলেছিল তার নমুনা মেলে ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ১৮ চৈত্র সংবাদপ্রভাকরেছাপা জনৈক পত্রদাতার বক্তব্যে। ঘোষপাড়ার মেলা স্বচক্ষে দেখে তিনি লেখেন :

ঐ বহুসংখ্যক কর্ত্তামতাবলম্বিরা কেবল যে ইতর জাতি ও শাস্ত্রবি নিবর্জ্জিত মনুষ্য তাহা নহে তাহাদের মধ্যে সৎকুলোদ্ভব মান্য, বিদ্বান, এবং সূক্ষ্মদর্শিজন দৃষ্ট হইল।....

যেহেতু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন প্রভৃতি জাতি নীচেদের অন্নবিচার না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে ভোজন ও পান করে ইহা কুত্রাপি কোন স্থানে দেখি নাই ও শুনি নাই, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদবধি আমরা উক্ত পল্লীতে উপস্থিত ছিলাম তদবধিক্ষণ মাত্র কাহাকেও অসুখি দেখি নাই, সকলেই হাস্যাস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছিল, বোধহয় রাসের তিন দিবস তথায় আনন্দ বিরাজমান থাকে, সম্পাদক মহাশয়, ঘোষপাড়ার বিষয়ে নানা মহাশয়ের নানা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্তু আমরা অল্পবুদ্ধিজীবী মনুষ্য হঠাৎ কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে সাহসিক হই নাই, ঘোষপাড়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য যে পর্য্যন্ত আমরা না জানিতে পারি সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইব না, যদিও এ ধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত নহে ও ইহার বাহ্যপ্রকরণ সমস্ত অনাচারযুক্ত, কিন্তু যখন বহুলোকের ঐ মতের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা এবং ইদানীন্তন বিদ্যার স্রোত প্রবল হইয়া হ্রাস না হইয়া উন্নতি হইতেছে তখন ইহার অন্তরে কিছু সারত্ব থাকিবেক, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসম্মত নহে।

নবীনচন্দ্র সেন যখন ১৮৯৫ সালে ঘোষপাড়ার মেলায় যান তখন সকালবেলা কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁরা 'সকলেই প্রায়

গ্র্যাজুয়েট, সুশিক্ষিত ও পদস্থ। সকলেই কর্তাভজা'। এসব বিবরণ প'ড়ে জানতে ইচ্ছে করে কতসংখ্যক মানুষ না জানি আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নে কর্তাভজা ধর্মে যোগ দিয়েছিল যাতে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণরা বার করেছিলেন জেলেপাড়ার সং তাদের গালমন্দ ক'রে কিংবা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মদতে দাশু রায় লিখেছিলেন কর্তাভজা পাঁচালী। তার ব্যঙ্গ বড় নির্মম আর অশালীন। যেমন :

কর্তাভজন করতে যাই চলো সকলে।
বজায় করবি যদি দুকুলে
কেন যাস হয়ে ব্যাকুলে
হারিয়ে দুকূল কুল তেজে অনন্ত কুলে ॥
এতে করতেছে মজা কতজন
করিয়ে পূজা আয়োজন
যাবো নির্জন স্থানে প্রতি শুক্রবারে হ'লে।
বৃক্ষে উঠি হবেন মুরলীধব
আমরা ক'রে ঢাকিব পয়োধর
হেসে আধা করিব অধর
তখন কত সুখ পাবে।
হবে ব্রজেব লীলা শুন বলি
কেউ বৃন্দে কেউ চন্দ্রাবলী
ললিতে আদি কেউ হবে শ্রীরাধা
লেগে যাবে ভারি 'চটক
কেউ কারে করিবে না আটক
কর্মে দিবে না কেউ বাধা।

এত যে প্রতিরোধ, এমন যে বিদ্রূপ তার মূলে শুধুই ভ্রষ্টাচার আর ধর্মীয় বিরোধ ? আমার তো মনে হয়, কর্তাভজাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আর সংঘবদ্ধতা ভাবিয়ে তুলেছিল হিন্দু আর ব্রাহ্মদের। কিন্তু কত শিষ্য ছিল এঁদের ? তাঁদের সংগঠিত করলেন কে ?

নিঃসন্দেহে দুলালচাঁদ ওরফে লালশশী। উনিশ শতকীয় শিক্ষিত যুবা। বাংলা সংস্কৃত ইংরাজি পার্সী চারটি ভাষাই ভালমত জানতেন। ১৭৮৩ সালে যখন রামশরণের মৃত্যু ঘটে তখন দুলালচাঁদের বয়স মাত্র সাত। তাঁর মা সরস্বতী দেবী (পরে তিনি বিখ্যাত হন সতীমা নামে) কিছুকাল কর্তাভজাদের নেতৃত্ব দেন। তারপরে দুলালের ষোলো বছর বয়স হতেই তাঁর হাতে নেতৃত্ব আসে। কিন্তু

অপরিণত বয়সে দুলাল মারা যান ১৮৩৩ সালে। এই ক্ষণজীবী মানুষটি কর্তাভজাদের আচরণবিধি ও সংগঠন চিরকালের মত সুদৃঢ় ক'রে গেছেন। রয়েল ফকিররা একশো বছর ধরে এঁর লেখা আইনপুস্তক 'ভাবের গীত' গায়, বুকে ভরসা জাগে। সে গানগুলি নাকি মুখে মুখে বলে যেতেন দুলাল আর লিখে নিতেন রামচরণ চট্টোপাধ্যায়। রামচরণ মূলে ছিলেন বেলুড়ের এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। তিনি ছাড়া দুলালের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ছিলেন বাঁকাচাঁদ, কাশীনাথ বসু, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, রামানন্দ মজুমদার আর নীলকণ্ঠ মজুমদার। ১৮৪৬ সালের ক্যালকাটা রিভিয়্যুয়ের ষষ্ঠ খণ্ডে দুলাল সম্পর্কে একটি বর্ণনা রয়েছে। তাতে দেখা যায় ১৮০২ সালে মার্শম্যান আর কেরী দুলালের কাছে গিয়েছিলেন সর্বেশ্বরবাদ নিয়ে তর্ক করতে। তাতে দুলালের চেহারার বর্ণনায় বলা হয়েছে 'he was no less plump than Bacchus'। মানুষটি কি উনিশ শতকীয় রীতিমাফিক খুব ভোগীও ছিলেন? একজন লিখেছেন:

> কর্তাভজা সম্প্রদায় সর্বজাতের মিলনক্ষেত্র রচনায় দুলালচাঁদ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় চারিটি কন্যাকে বিবাহ করেন। চারিটি স্ত্রীব গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়।

কর্তাভজাদের সম্পর্কে সাহেবদের উৎসাহ ও সতর্কতা লক্ষ করবার মত। কেরী, মার্শম্যান ও ডাফসাহেব খুব নজর রাখতেন ঘোষপাড়ার দিকে।* ১৮১১ সালে ডব্ল্যু. ওয়ার্ড দুলালের জীবিতকালে যে প্রতিবেদন লিখে গেছেন তাতে বলেছেন:

> Doolatu, the son, pretends that he has now 4000,000 disciples spread over Bengal.

ওয়ার্ড অবশ্য ১৮১৮ সালে তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে এই চার লক্ষ শিষ্যসংখ্যা কমিয়ে এনেছেন কুড়ি হাজারে।

রয়েল ফকিরের দলের সঙ্গে আমি যখন ঘোষপাড়ায় যাচ্ছিলাম তখন তার দলবল গাইছিল এক আশ্চর্য কোরাস:

দিলে সতীমায়ের জয়   দিলে কর্তামায়ের জয়

আপদখণ্ডে বিপদখণ্ডে খণ্ডে কালের ভয়।
দিলে মায়ের দোহাই ঘোচে আপদ বালাই
ছুঁতে পারে না কাল শমনে।

এই সতীমা যে কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে কর্তা মা হয়ে উঠেছিলেন সেও এক রহস্য। কেননা ১৮১১ সালে এবং ১৮২৮ সালে ওয়ার্ড সাহেব এবং পরে হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন তাঁদের লেখায় রামশরণ ও দুলালচাঁদের সুবিস্তৃত উল্লেখ বারবার করলেও এক জায়গাতেও সতী মা-র কথা লেখেননি। বরং ওয়ার্ডসাহেব ঐশীক্ষমতা ও রোগ আরোগ্যের মীথ তৈরি করেছেন আউলচাঁদ ও রামশরণের নামে। আউলচাঁদ সম্পর্কে বলেছেন : 'It is pretended he communicated his supernatural powers' এবং রামশরণ পাল সম্পর্কে, 'He persuaded multitudes that he could cure leprosy and other diseases'। এই রোগারোগ্যের কৌশলে অসহায় মানুষকে ঠকিয়ে রামশরণ যে বিপুল অর্থ সম্পত্তি বানিয়েছিলেন ওয়ার্ড সে ইঙ্গিত গোপন রাখেননি। তাঁর মতে 'By this means, from a state of deep poverty hebecamerich,and his son now livesin affluence'।

সমস্যাটা এইখানে। রোগ সারাবার গল্প কিংবা কল্পকাহিনীগুলি সতীমার নামে বটলো কেমন করে? 'সহজতত্ত্ব প্রকাশ' নামে একটা বইয়ে সমস্যাটার জবাব আছে। মনুলাল মিশ্র নামে এক কর্তাভজা এ বইয়ে লেখেন :

> তাঁহার [অর্থাৎ রামশরণ] তিরোধানের পর মহাত্মা দুলালচাঁদের চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত সতী মায়ের অলৌকিক শক্তির কাহিনী কর্তাভজন ধর্মকে জগতে প্রচারিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল।

রয়েল ফকিরের তো এসব কথা জানা নেই। সে শুধু বিশ্বাস করে। তার পায়ের তলার মাটিতে নেই সংশয়ের ফাটল। সে জানে এবং মানে যে ঘোষপাড়ার ডালিমতলার মাটি গায়ে মেখে হিমসাগরের জলে স্নান ক'রে সতী মায়ের নাম ভক্তিভাবে নিলে সব রোগ সেরে যায়। ঘোষপাড়ার মেলার আগের দিন সেই ভরদুপুরে অগণিত ভক্ত মানুষদের মাঝখানে আসন পেতে ব'সে ডালিমতলার দিকে তাকাই। এই মাটিতে সব রোগ সারে? এত হাজার হাজার মানুষ সেই বিশ্বাসের জোরে এখানে এসেছে? রয়েল ফকির আমার সংশয়ী চোখে চোখ বেখে হেসে বলে, 'বাবা বিশ্বাস করো, বিশ্বাসে মুক্তি'। তারপরে তার দলের দীনুবতন দাসীকে বলে, 'দীনু, সতী মায়ের মাহিত্ম্য তুমি বাবুরে একটু শোনাও দিনি। উনি শান্তি পাবেন'।

দীনুরতন দাসী উর্ধ্ব ক'রে অলক্ষ সতী মাকে প্রণতি জানিয়ে পাঁচালীর সুর ক'রে বলে :

সতী মা উপরে যেবা রাখিবে বিশ্বাস।
সেরে যাবে কুষ্ঠ ব্যাধি হাঁপ শূল কাশ ॥
কৃপা হলে ভবে তাঁর ঘটে অঘটন।
অন্ধ পায় দৃষ্টিশক্তি বধিরে শ্রবণ ॥
চিত্ত যেবা বাখে পায় বিত্ত পায় ভবে।
বন্ধ্যানারী পুত্র পাবে তাঁহার প্রভাবে ॥
সতী মার ভোগ দিতে হবে যার মতি।
সকল বিপদে সেই পাবে অব্যাহতি ॥

কথাগুলো রয়েল ফকিরের দলের সকলেরই খুব মনোমত সেকথা বোঝা যায় তাদের মাথার দুলুনিতে। রয়েল ফকির বলেন : আমবা এইবকম শুনেচি যে আউলচাঁদ ফকির, রামশরণ আর সরস্বতীর সেবাধর্মে অনেকদিন ধবে খুব তুষ্ট হয়ে শেষে একদিন বললেন, 'এবারে আমি চলে যাব'। 'না না' সবস্বতী কেঁদে পড়লেন তাঁর পায়ে। অনেক কান্নাকাটির পরে শেষমেশ রফা হ'লো আউলচাঁদ জন্মাবেন তাঁর গর্ভে সন্তান হয়ে। সেই সন্তানই হলেন আমাদের এই লালশশী। তিনিই নিরঞ্জন। গোকুলে যেমন যশোদার দুলাল কৃষ্ণ, অযোধ্যায় যেমন কৌশল্যার দুলাল রামচন্দ্র, নবদ্বীপে যেমন শচীমাব দুলাল গোরাচাঁদ, আমাদের এই ঘোষপাড়ায় তেমনই সতী মায়ের দুলালচাঁদ। এই চাবেই এক, একেই চার। বুঝলেন ?

বুঝলাম, কর্তাভজা ধর্মে রয়েছে এক মেধাবী বিন্যাস, যার মূলে দুলালচাঁদের কল্পনাগৌরব আর বুদ্ধির কৌশল। একদিকে অবতারতত্ত্ব আরেকদিকে রোগ আরোগ্যের উপাখ্যান। একদিকে সহজসাধন আরেকদিকে ভাবেব গান। একদিকে আসন-গদী-অর্থাগম আরেকদিকে বিধবা ও পুত্রহীনাদের সান্ত্বনা। শিক্ষিত মানুষের কাছে যা সমন্বয়বাদের কারণে আকর্ষণীয়, অশিক্ষিতদের কাছে তা সতী মার মাতৃতান্ত্রিকতায় ভরপুর ও মোহময়। অবশ্য দুলালচাঁদের ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তিগত এলেমও কম ছিল না। জানালেন সত্যশিব পাল দেবমহান্ত অর্থাৎ দুলালের উত্তরপুরুষ, এখনকার কর্তা। সুবিনয়ী শিক্ষিত মানুষ সত্যশিব বাবু দুলালের প্রশস্তি করতে গিয়ে আমাকে চমকে দিয়ে জানালেন, '১৮৯৩ সালে শিকাগোর রিলিজিয়াস্ কংগ্রেসে রামদুলাল পাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। সে চিঠি আমার কাছে আজও আছে। চিঠির তারিখ ১৭ এপ্রিল ১৮৯৩। কিন্তু তার অনেক আগেই তো দুলালচাঁদ দেহ

রেখেছেন। তাই তাঁর নাতি সত্যচরণ দেবমহান্তকে ঐ পদ দেওয়া হয়।'
'এই দেবমহান্ত ব্যাপারটি কি?' আমি জানতে চাই।
সত্যশিব পাল দেবমহান্ত দুলালচাঁদের চতুর্থ পুরুষের বর্তমান উত্তরাধিকারী। শালপ্রাংশু চেহারা। বললেন : দেবমহান্ত একটি টাইটেল। আমাদের বংশে রামদুলাল এই উপাধি পান নদীয়ার মহারাজার কাছ থেকে।
: কী কারণে টাইটেলটা পান তিনি?
ব্যাপার কি জানেন, বৈশাখী পূর্ণিমাতে ঘোষপাড়ায় রথযাত্রা হতো, এখনও হয়। নদীয়ার মহারাজা একবার বললেন বৈশাখ মাসে রথ অশাস্ত্রীয়, কাজেই তা বন্ধ করতে হবে। তিনি জোর ক'রে রথযাত্রা বন্ধের আদেশ দেন। তখন ভক্তরা দুলালচাঁদকে রথে বসায় আর বিনা আকর্ষণে রথ চলতে থাকে। সেই ঘটনায় দুলালচাঁদ দেবমহান্ত হন।
কিংবদন্তীর ধোঁয়াশা কাটাতে আমার ঝটিতি জিজ্ঞাসা 'ঘোষপাড়ার এরিয়া কতটা?'
: দক্ষিণে কল্যাণী উপনগরী, উত্তরে চরবীরপাড়া, পূর্বে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমে চরসরাটি এই হল সীমা। এখন আমাদের ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন জমির পরিমাণ ৬·২৯ একর। আগে ঘোষপাড়ার মেলা ৬০০ বিঘা আমলিচুর বাগান সমেত জমিতে বসত। প্রায় সাড়ে তিন হাজার গাছ ছিল। একেক গাছের তলায় একেক 'মহাশয়' তাঁর দল নিয়ে বসতেন। তারপরে গত যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার জমি নিয়ে নেন। যুদ্ধের পরে সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ মেলার জন্যে ঐ ৬০০ বিঘা ছেড়ে দেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেলার জন্যে মাত্র ৩০ একর জমির সংরক্ষিত রাখেন। তারমধ্যে আবার জবরদখল ঘটেছে। গড়ে উঠেছে কলোনী। মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে।
রয়েল ফকিরের সঙ্গে প্রথম যাওয়ার পর অবশ্য আরও অন্তত দশবার গেছি ঘোষপাড়ার মেলায়। শুধুই মনে হয়েছে মেলায় দিনে দিনে যত লোক বাড়ছে ততই জায়গা কমছে। কিন্তু সে কথায় যাবার আগে রয়েল ফকিরের ঘটনাটা শেষ করি। দোলের আগের দিন সকালে ফকির আমাকে নিয়ে বিরাট মেলা চত্বরের নানাদিকে ঘোরালেন আর চেনালেন সবকিছু। 'এই হ'ল' হিমসাগর, এখানে কাল চান করবে ভক্তবৃন্দ আর ব্যাধিগ্রস্তরা'। 'ঐ দেখুন ডালিমতলা। এখানকার মাটি মাখলে আর খেলে সব রোগের মুক্তি'। 'চলুন একটু পূবদিকে যাই, ওখানে অনেক বাউল ফকির দরবেশ আসেন'। হঠাৎ রয়েল ফকির বলে বসেন, 'এই এই তো শিবশেখরের আসন। আসুন বাবা, এখানে বসুন।'
শিবশেখর হলেন এক চুল কোঁকড়ানো সুগঠন যুবা। ভক্তিমানের মত মাথা

নিচু করলেন। রয়েল বললে, 'এঁদের এক মস্ত 'মহাশয়' বংশ মুর্শিদাবাদ জেলার কুমীরদহ গ্রামে'। সবাই বসলে আমি বললাম, 'এই 'মহাশয়' ব্যাপারটি কি বলুন তো ?'

শিবশেখর বললেন, 'এখানে ঘোষপাড়ায় নিত্যধামে আমাদের মূল 'আসন'। এখানকার যাঁরা প্রত্যক্ষ শিষ্য তাঁদের মধ্যে যাঁরা ভক্তিমান ও অবস্থাপন্ন তাদের বাড়িতে 'আসন' থাকে। তাঁরা দীক্ষা দেন। এঁদের বলে 'মহাশয়'। আর মহাশয়রা যাঁদের শিষ্য করেন তাঁদের বলে 'বরাতি'।

: আপনারা ক'পুরুষের মহাশয় ?

: আমাকে নিয়ে ছয় পুরুষ চলছে। ছ' পুরুষ আগে আমাদের পূর্বপুরুষ নফর বিশ্বাস, ভোল্লাগ্রামের মহাভারত ঘোষ আর হরিহর পাড়া-মালোপাড়ার তেঁতুল সেখ এই তিনজন ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে দীক্ষা নেন। তারিখ ছিল ২৮শে কার্তিক। সেই থেকে ২৮শে কার্তিক আমাদের কুমীরদহ গ্রামে মহোৎসব হয়। আপনি এবারে যাবেন। খুব জাঁক হয়।

: আপনার ছ' পুরুষের নাম বলতে পারেন ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। লিখে নিন। আমার নাম শিবশেখর মণ্ডল। আমার বাবা যদুলাল মণ্ডল, তাঁর বাবা দুকড়ি, তাঁর বাবা চাঁদ সিং, তাঁর বাবা ফতে সিং, তাঁর বাবা নফর বিশ্বেস।

জবাব শুনে আমি তো অবাক। বিশ্বাস থেকে মণ্ডল, মাঝখানে আবার সিং ? খানিকটা সংকোচ নিয়েই বলি : আপনারা কি তবে মাহিষ্য ?

: আমরা মুসলমান।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। নাম শিবশেখর, পিতা যদুলাল অথচ জাতে মুসলমান ? দেখি, রয়েল ফকির মিটিমিটি হাসছে। ভাবখানা যেন, 'বাবু এই মজা দেখাতেই তো আপনাকে আনা'। 'মানুষের কারবার দেখ্‌লি আপনি তাজ্জব হয়ে যাবা'।

শিবশেখর বলে, বাবু জন্মে আমরা মুসলমান তবে কর্মে এই সতী মার দোরধরা।

: মুসলমান ধর্ম পালন করেন না ?

: বাড়িতে ঈদ্‌গাহ আছে। দুই ঈদ পালন করি। মসজিদে যাই না। বাড়িতে ছ' পুরুষের পূজো করা আসন আছে। সতীমার ঘটে প্রত্যেক শুক্রবার উপাসনা সিন্নিভোগ হয়।

: খাওয়া-দাওয়ার কোন বিধি আছে নাকি ?

: তেমন আর কি ? শুধু সম্বৎসর নিরামিষ খাই বাড়ির সকলে।

নিরামিষভোজী মুসলমান তায় আবার নাম শিবশেখর ! এমন একটা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলানো কঠিন বৈকি। জাতাজাতির সংস্কার এমন বদ্ধমূল এই উচ্চশিক্ষিত মনেও সে অংক মেলে না। আমার বিপন্নতা দেখে রয়েল ফকির শিবশেখরের আখড়াব গাহককে রহস্যময হেসে কানে কানে কী একটা গান গাইতে বলে। সে সঙ্গে সঙ্গে একতাবা বাজিয়ে গান ধরে :

জাত গেল জাত গেল ব'লে
এ কি আজব কারখানা।
সত্য কথায় কেউ রাজি নয়
সবই দেখি তা না না না ॥

কী আশ্চর্য, রয়েল ফকির কি তবে আমাকে তা না না না-র দলে ফেলে দিল ? ততক্ষণে সেই অজানা গ্রাম্য গায়ক ভ্রূকুটি ক'রে সরাসরি আমাকেই যেন জিগ্যেস ক'রে বসে তার গানের অন্তরায় :

এই ভবেতে যখন এলে
তখন তুমি কী জাত ছিলে ?
যাবার সময় কি জাত হবে
সে কথা তো কেউ বলে না ॥
ব্রাহ্মণ চাঁড়াল চামার মুচি
এক জলে হয় সবাই শুচি
দেখে কারও হয় না রুচি
শমনে কাউকে থোবে না ॥

এ ভর্ৎসনা কি আমাকেই ? ভাববার আগেই গ্রাম্য গানের দারুণ লজিক আমাকে আঘাত করে এইখানে যে,

গোপনে যদি কেউ বেশ্যার ভাত খায়
তাতে জাতির কি ক্ষতি হয় ?
ফকির লালন বলে জাত কারে কয়
এ ভ্রম তো আমার গেল না ॥

বয়েল বলে উঠল, 'বাবা জাত বলে কিছু নেই। সব কর্ত্তাবাবার সন্তান তাই লালশশী বলেন—ভেদ নাই মানুষে মানুষে/ খেদ কেন করো ভাই দেশে দেশে।'

আমি চেয়ে থাকি শিবশেখরের দিকে। তার মুখে লাজুক হাসি। ভাবলাম, খুব শিক্ষা হ'ল যা হোক। সে আমার অবস্থা বুঝে হঠাৎ উঠে হাত দুটো চেপে ধ'রে বললে, 'বাবু মনে কিছু করবেন না। এখানে সতী মার থান, শান্তির জায়গা। মনের মধ্যে দুঃখ রাখবেন না। রয়েল, তোমার মনে বড় প্রতিহিংসা'।

রয়েল বললো, 'প্রতিহিংসা নয়। বাবুকে পেরথমেই একটা ঝাপটা মেরে সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দিলাম। ওঁর আর ভ্রম হবে না। তাই না বাবু ?'

সঠিক পথ কোথায়, কোন্‌খানে ? বছরের পর বছর এই যে আমার ঘোষপাড়ায় আসা তার পিছনে কিসের টান ? ঘোষপাড়া জায়গাটাই কি অবিতর্কিত ? সেই আঠারো শতকে এখানে যে-কর্তাভজা ধর্ম গড়ে উঠেছিল তা গোড়াতে ছিল আউলচাঁদের সুফীমত। ওয়ার্ডসাহেব আউলচাঁদের বর্ণনা দিয়েছিলেন এইরকম :

> About a hundred years ago another man rose up, as the leader of a sect, whose cloth, or dress of many colours, which he wore as a voiragee, was so heavy that two or three people can now scarcely carry it.

বিশাল ভারী এই আলখাল্লাধারী মানুষটি তাঁর সুফীধর্মের ছাঁচে যে গৌণ ধর্মটির পত্তন করেছিলেন তাতে কালে কালে অনেক প্রতিভার উজ্জ্বলতা মিশেছে। সবশেষে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে উত্থান, বেদবিরোধী মনোভাব আর জাতিবর্ণহীন সমন্বয়বাদ সবই ঢুকে গেছে এ ধর্মে। কিছুটা ইসলামী বিশ্বাস আর কিছুটা খৃষ্টধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডও জুড়ে গেছে তার মর্মে। সুফীদের ব্যক্তিগত দেবতা যাঁকে তাঁরা বলতেন 'হক্' বা সত্য—কর্তাভজারা সেই সত্যকে ভজনা করেন। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল কর্তাভজা শব্দটা বোধহয় কেউ ব্যঙ্গ ক'রে বানিয়েছিল। কিন্তু ভাবের গীতের একটি পদে দুলালচাঁদের একটি দর্পিত উক্তি থেকে সে ধারণা পালটালো। দুলাল বলেছিলেন :

আমি আপ্ত খোদে মেয়ে মরদে
কর্তা ভজাবো
কর্তাভজার কাছে তোদিকে
মূর্খ বানাবো।

বলাবাহুল্য এই 'তোদিকে' বলতে দুলালের লক্ষ্য ব্রাহ্মণ্যবাদ। সেই ব্রাহ্মণ্যবাদকে খর্ব করতে দুলালের সগর্ব উচ্চারণ :

আছে কর্তাভজা আর এক মজা
সত্য উপাসনা।
বেদ বিধিতে নাইকো তার ঠিকানা
এ সব চতুরের কারখানা।

কিন্তু চতুর মানুষটি কি শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন ? দেখা যাচ্ছে দুলালের জীবিতকালেই কর্তাভজাদের একটা উপদল গজিয়ে ওঠে, তাদের নাম রামবল্লভী। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে রামবল্লভীদের কথা প্রথম উল্লেখ ক'রে জানান বাঁশবেড়িয়ার শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর আর মতিলালবাবু ঘোষপাড়ার পালেদের নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে 'কালীকৃষ্ণ গড খোদা' উপাসনা সুরু করেন। এ খবর প'ড়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমি হাজির হই বাঁশবেড়িয়ায়। বাঁশবেড়িয়া আর ঘোষপাড়া বলতে গেলে গঙ্গার এপার আর ওপার। বাঁশবেড়িযায় গিয়ে দেখি কোথায় কি ? সব শুনশান্। কৃষ্ণকিঙ্কর বা শ্রীনাথ মুখুজ্যের ভিটে বা বংশ আর নেই। একজন বৃদ্ধ সব শুনে বললেন, 'মনে পড়েছে। খুব ছোটবেলায় শুনেচি ঐ যেখানে বাঁশবেড়ের পাবলিক লাইব্রেরি তার নিচে গঙ্গার ধারে রামবল্লবীদের আকড়া ছেল তা সে কি আর আচ্যা ?' পাবলিক লাইব্রেরির নিচে গঙ্গার ভাঙা পাড়ে যখন ঘুরছি, পুলিশ-কুকুরের মত, তখন উদ্ধার করলেন আরেক বৃদ্ধ। জানালেন রামবল্লভীদের আসল কাণ্ডকারখানা ছিল ওপারে অর্থাৎ কিনা কাঁচড়াপাড়ার কাছে পাঁচঘড়া গ্রামে। খুঁজতে খুঁজতে বাঁশবেড়িয়ার গ্রন্থাগারে সংবাদপ্রভাকরে ১৮৩১ সালের একটি উদ্ধৃতি মিললো 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' বইতে। জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী পাঁচঘরা গ্রামে রামবল্লভীদের এক সমাবেশের ভারী চমৎকার বর্ণনা করে লিখেছেন :

> এই ক-একজন বাবু একত্র হইয়া মোর কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে একজন পোদের ভবনে এক ইস্টক নির্ম্মিত বেদি তদুপরি চৌকী এবং তদুপরে কুসুমমাল্য প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধবর্ণ প্রায় পঞ্চসহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিসহর নিবাসী একশত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গিতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন।

পড়তে পড়তে কি মনে হয় না ধর্মসমন্বয়ের একটা তাপ এঁদেরও মধ্যে লুকানো ছিল ? মনে না হয়ে কি পারে যে দুলালচাঁদ যতখানি ব্যক্তি তার চেয়ে অনেকখানি তাঁর যুগের সৃজন ? এঁদের সাফল্যে যে সমসাময়িক গাঙ্গেয় অঞ্চলের ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মণ্যসমাজ কেঁপে উঠেছিল তাতে আর সন্দেহ কি ? অক্ষয়কুমার তো এতদূর অসূয়াসম্পন্ন ছিলেন যে রামবল্লভীদের গোমাংস ভক্ষণেব অপবাদও দিয়েছিলেন।

ঘোষপাড়ায় দাঁড়িয়ে অনেকবার আমার মনে হয়েছে সর্বধর্মসমন্বয়ের এমন অপরূপ পীঠস্থান কেমন ক'রে সতী মা-র মহিমায় আবিষ্ট হয়ে গেল ? সে কি দুলালচাঁদের অকালমৃত্যুতে পরবর্তী যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ? ১৮৩৩ সালে দুলালচাঁদের প্রয়াণ ঘটে। সতী মা সম্প্রদায়ের কর্ত্রী হন। তাঁরও দেহাবসান ঘটে ১৮৪০ সালে। তারপর গদীতে বসেন দুলালের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৮২ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু এবং শরিকদের মধ্যে গদীর লড়াই।

সেই গদীর লড়াই এখনও মেটেনি।

১৮৯৫ সালে নবীনচন্দ্র সেন যখন ঘোষপাড়ায় গিয়েছিলেন তখন সতী মা জীবিত নেই, রামদুলালের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রও দেহ রেখেছেন। তাঁদের পরবর্তী দুই বংশধর তখন দুই শরিক হয়ে দুই গদী দখল করেছিলেন। মেলায় তাঁদের দেখে নবীনচন্দ্র লেখেন :

> এখন রামশরণ পালের দুই বংশধর আছেন। দুইটিই মহামূর্খ। তথাপি ইঁহারা উভয়ই বর্তমান 'কর্তা'।....
>
> দেখিয়াছি, মূর্খ কর্তা দুজন দুই 'গদিতে' বসিয়া আছেন এবং সহস্র সহস্র যাত্রী তাঁহাদের ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া এবং প্রণামি দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে।

এখন, এই বিশশতকের শেষ অংশে ঘোষপাড়ার মেলায় গেলে একই দৃশ্য দেখা যাবে। ঠাকুরবাড়ির ভেতরে আর বাইরে হাজার হাজার ভক্ত, পা ফেলার জায়গা নেই। বেশির ভাগ অজ্ঞ মূর্খ গ্রামবাসী। হুগলী নদীয়া মুর্শিদাবাদ বর্ধমানের কৃষিজীবী মানুষ। তাদের মধ্যে বারোআনা স্ত্রীলোক। দুই গদীর বদলে এখন চার গদী। তার মানে চার কর্তা। এঁরা শিক্ষিত তবে প্রণামী নিতে ও পদধূলি দিতে খুবই আগ্রহী। গোমস্তা জাতীয় একজন লোক থেয়োর খাতায় মহাশয় আর বরাতিদের খাজনা আদায় করছেন। সামনে আবির রাঙানো প্রাক্তন কর্তাদের আলোকচিত্র। একজন গোমস্তাকে আমার সঙ্গী বন্ধু জিগ্যেস করল, 'খাজনা আদায় করছেন ? কিসের খাজনা ?'

আমি তাকে একপাশে সরিয়ে এনে নোটবই খুলে কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী' থেকে টোকা একটা অংশ পড়ালাম। তাতে লেখা আছে :

> পালবাবুদের ত্রিবিধ প্রকাবে আয় হইযা থাকে। ১) খাজনা ২) ভোগ ৩) মানসিক। অর্থাৎ উহাদেব মতে প্রত্যেকের দেহের মালিক কর্তা, সুতরাং তুমি যে উহাতে বাস করিতেছ তজ্জন্য কর্তাকে তোমার খাজনা দিতে হয়।

বন্ধুটি বদ্‌মেজাজী। গজগজ করতে লাগল। এক যুবক এগিয়ে এসে আমাদের কাছে একটি বই দেখালো। 'ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়' লেখক অদ্বৈতচন্দ্র দাস। নগদ সাতটাকা দিয়ে বইটি কিনে বন্ধু একজাযগায় বসে পাতা উলটোতে লাগলো। হঠাৎ শেষ প্যারাগ্রাফে এসে আমাকে বলল, 'দেখেছ দেখেছ কাণ্ড। পড় পড়'। পডলাম, লেখা রযেছে .

> ব্যক্তিগত আত্মপ্রচাবে মুগ্ধ না হয়ে, তুচ্ছ দ্বেষাদ্বেষি ও অর্থলোলুপতায় আকৃষ্ট না হয়ে, সতীমার দুই শরিক ট্রাস্টিগণসহ একযোগে ঠাকুরবাড়ির তথা কর্তাভজা ধর্মের উন্নতিসাধনে ব্রতী হন এই প্রার্থনা জানাই শ্রীশ্রী সতীমার শ্রীচরণকমলে।

বন্ধু বললেন, 'দেখেছ, শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। রেজিস্‌টেন্স'।

প্রতিবাদ কোথায় ? বছরের পর বছর সতীমার মেলায় একই দৃশ্য দেখে গেছি। হাজার হাজার মানুষ, অশিক্ষিত অসহায় রোগগ্রস্ত, হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। ডালিমতলায় সতীমার নামে লালপেড়ে কাপড় শাঁখা লোহা সিঁদুর ছুঁড়ছে, গাছে বাঁধছে ঢিল। ডালিমতলার মাটি মেখে, খেয়ে, হিমসাগর নামে নোংরা একটা ঘুলিয়ে-ওঠা পুকুরের জলে স্নান ক'রে, সেই জল খেয়ে, তারা ভাবছে তাদের রোগবালাই সেরে যাবে। বোবা কথা বলবে, খোঁড়া হাঁটিবে, বাঁজার ছেলে হবে, অন্ধ পাবে দৃষ্টি। প্রতিবন্ধিতায় ভরা এই দেশে, অজ্ঞতায় মোড়া আমাদের গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোপনে কত ধর্মব্যবসায়ী দালাল। তারাই এসব অসহায় মানুষদের আনে এখানে ভুজুং ভাজং দিয়ে। তারফলে হিমসাগর থেকে ডালিমতলার দীর্ঘ পথ কাদায় কাদা। ভোর থেকে অগণিত অন্ধবিশ্বাসী আর কুসংস্কারঘেরা পুরুষ আর নারী দণ্ডী খাটছে। চোখে তাদের জল। মুখমণ্ডলে তাদের গভীর বিশ্বাসের দ্যুতি। বেশবাস ভিজে, অসম্বৃত। আত্মজের রোগ নিরাময়ের আশায়, স্বামীর পক্ষাঘাত সারাতে, সন্তানকামনার অতলটানে কত লজ্জাশীলা গ্রাম্যবধূ এখানে আত্মজ্ঞান হারিয়ে লজ্জা ভুলে দণ্ডী খাটছে। তাদের

স্নানাচিক্কণ দেহ সিক্তবসনের বাধা মানছে না। তার ওপর পিছলে যাচ্ছে লম্পট আর লুম্পেনের চোখ। সতী মার নাম মাহাত্ম্যে মহিমময় এমন এক জায়গায় মাতৃজাতির এতখানি অবমাননা সওয়া যায় না।

কোথায় প্রতিবাদ ?

হিমসাগরের পাড়ে এসে দাঁড়াই। স্নানের জন্যে কি উদ্দাম লড়াই। ঐটুকু পুকুর পাঁকে আর কাদায় আবিল হয়ে উঠেছে কয়েক হাজার মানুষের দাপাদাপিতে। ধর্মীয় দালাল কোমরজলে দাঁড়িয়ে বোবা বালককে চুলের ঝুঁটি ধরে জলে চোবাচ্ছে আর গালে মারছে চড়। বলছে, 'বল্, সতীমা বল্'। অক্ষম নির্বাক বালক খাচ্ছে চড়ের পর চড়। তার অরুন্তুদ যন্ত্রণার প্রতিরোধ কই ? তার রাঙা চোখের পাড়-ভেঙে-আসা অশ্রু আর পাড়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা তার অভিশপ্ত গর্ভধারিণীর চোখের জল মিশছে হিমসাগরের ঐশী সলিলে। কে প্রতিবাদ করবে ?

মাইকে মেলা কর্তৃপক্ষ গজরাচ্ছেন : আপনারা সংযত থাকুন। নারীজাতির সম্ভ্রম রক্ষা করুন। কেউ মেয়েদের গায়ে হাত দেবেন না।

'তার মানে ?' আমার বন্ধুটি গর্জে ওঠে। 'এখানে এসব কি শুনছি, দেখছি ? এ কি আমাদের দেশ ? আমরা যে সবাইকে বলি ধর্মের উগ্রতা নেই পশ্চিমবঙ্গে। সে কি তবে ভুল ? এর প্রতিকার নেই ?'

হঠাৎই একজন যুবক আমাদের হাতে গুঁজে দিলো একটি লিটল ম্যাগাজিন 'শাব্দ'। 'পড়ুন, পড়ে দেখুন' আবেদন শুনে বন্ধু বললেন, 'ভাই এখানেও পদ্য আসছে তোমাদের ? রুখে দাঁড়াতে পারো না এসব বুজরুকির বিরুদ্ধে ?'

ছেলেটি বলল, 'এটাই প্রতিবাদ। পড়ুন।'

দুজনে একটা গাছতলায় বসে প্রথমে 'শাব্দ' থেকে পড়ি 'উৎসমানুষ' কাগজের একটা পুনর্মুদ্রণ 'কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় সতী মায়ের মেলা, যা দেখেছি যা বুঝেছি'। প্রথমেই পুরোনো বছরের একটা প্রতিবেদন, বক্সে।

> এবারেও (১৯৮০) ২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ঘোষপাড়ার বিরাট মেলা বসেছিল।....একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে তার মাসী হাওড়ার দানসাগর থেকে এসেছিল সতী মায়ের মেলায়। ছোট্ট, মেয়েটি ঝড়বাদলে অসুস্থ হয়ে পড়লে সমবেত অনেকের পরামর্শে মাসী মেয়েটিকে হিমসাগরে (একটা এঁদো পুকুর যার নোংরা জলে হাজার লোকে স্নান করে পুণ্যলোভে) স্নান করিয়ে সতী মায়ের থানে ডালিমতলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে রাখে। মেলাতে ডাক্তার ছিল কিন্তু দৈবশক্তির ওপর ভরসা ছিল

অনেক বেশী। ফলত শিশুটি মারা যায়। মাসীর বুকফাটা আর্তনাদে মেলার বাতাস ভারী হয়। জলকাদার মধ্যে সে মৃত শিশুকে আঁকড়ে বসে ছিল।

পড়ায় বাধা পড়লো। এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আচ্ছা ব্যাণ্ডেল প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্রের স্টল কোথায় জানেন ?'

: না তো। কী ব্যাপার ? এখানে এই মেলায় স্টলটা আছে ?

: হ্যাঁ। মাইকে শুনলাম। আমার ছেলে বোবা কালা। ঐ দেখুন।

দেখলাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে ম্লানমুখে মার কোলে ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান। বছর আট-দশ বয়স। প্রচণ্ড আক্রোশে পা দাপাচ্ছে। ক্ষীণস্বাস্থ্যের মা তাকে সামলাতে পারছেন না। হতাশভঙ্গীতে ভদ্রলোক বললেন, 'ছেলেটা ভয়ানক টারবুলেণ্ট। গত তিনবছর এখানে আনছি। ডালিমতলার মাটি খাইয়েছি, হিমসাগরে চান করিয়েছি। কিন্তু কিছু হলো না। কি করি বলুন তো ?'

: আপনি থাকেন কোথায় ? করেন কি ?

: বেলেঘাটা। একটা কারখানায় কাজ করি।

: লেখাপড়া জানেন ? তো এখানে এসেছেন কেন ?

অসহায়ভঙ্গীতে জবাব এল, 'সবাই বললো। ওর মা কান্নাকাটি করতে লাগলো। একজন বললো পরপর তিনবছর আসতে হয়। তাই আসলাম। তা হ'লো কই ? কিচ্ছু হলো না। যে এনেছিল সে অনেক পয়সা খেঁচলো মশাই। ধ্যুস্, সব বাজে। এখন বলছে আপনি ভক্তিভরে সতী মাকে ডাকেননি। যাক্ গে। বাদ দিন সব বুজরুকি। কল্যাণকেন্দ্রটা দেখি।'

প্রতিবন্ধী কল্যাণ-কেন্দ্র তো আমাদেরও দেখা দরকার। পায়ের তলায় আমাদেরও মাটি চাই। অসহায় পিতা মাতা আর প্রতিবন্ধী সন্তানের পেছন আমরা এগোই। খানিক যেতেই কানে আসে মাইকের উচ্চারণ : এখানে আসুন, এই প্রতিবন্ধী কল্যাণকেন্দ্রে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করুন আপনার সন্তানকে। হিমসাগরের জল আর ডালিমতলার মাটিতে কিছু সারতে পারে না।

এসে দাঁড়াই সেই স্বস্তিকর মানবতার আহ্বানকেন্দ্রে। ছোট্ট স্টল। ভেতরে পাতা বেঞ্চিতে ব'সে আছে অনেক অসহায় ভাগ্যহীন মা-বাবা, তাদের হরেক প্রতিবন্ধী সন্তান নিয়ে। বোবা-কালা-অন্ধ-জড়বুদ্ধি-পঙ্গু। কয়েকটি উজ্জ্বল যুবক তাদের পরীক্ষা করছেন যন্ত্রপাতি দিয়ে। নির্দেশ দিচ্ছেন। একটি টেবিলে মাইক্রোস্কোপে দেখানো হচ্ছে হিমসাগরের জলে কত বীজাণু।

'আপনারা এখনও মারধোর খাননি ?' আমার এ প্রশ্নে হাসির পায়রা উড়ে গেল যেন একঝাঁক। একজন যুবক বললেন, 'বছর দুই ধ'রে আমরা আসছি

ব্যাণ্ডেল থেকে। অন্ধবিশ্বাস আর এই সব কুসংস্কারের একটা প্রতিবাদ করা দরকার। কি বলেন ?'

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লাম কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। কেবল মনে হ'তে লাগলো গভীর নির্জন পথের প্রান্তে হয়ত আমার প্রাপ্তি ঘটবে না তেমন কিছু। তবে পথের দুধারেই তো পেয়ে যাচ্ছি অনেক দেবালয়। মনের মানুষ খোঁজার গহন সাধনা আমার কই ? আমি তো ভীড়ের মধ্যে, দলিত মনুষ্যত্বের মধ্যে, অবমানিত মূল্যবোধের পুঞ্জীকৃত শবের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেখছি জীবনের উদ্ভাসন। শেষপর্যন্ত মানুষকেই, মানুষের মুক্তবুদ্ধিকেই জাগতে দেখছি। এ পথেই আলো জ্বেলে তবে ক্রমমুক্তি ? ভাবলাম, মনের মানুষ না মিললেও মনের মত মানুষ তো মিলে যায়। যেমন এই ব্যাণ্ডেলের চারটি যুবক, কিংবা সেই ছেলেটি যে আমাদের হাতে গুঁজে দেয় 'শাব্দ'। এদের বিবেচনা আর প্রতিরোধে ভর দিয়ে দাঁড়ায় আমাদের প্রহৃত মনুষ্যত্ব। আবার নতুন উদ্দীপনায় বুক বেঁধে মেলার ভেতরে এলাম। মধ্যদুপুর। রোদ গনগনে। চারদিকের অগণন আখড়ায় রান্নাবান্না চলছে। চাপ চাপ ধোঁয়া আর সেদ্ধভাতের গন্ধ। তারই মধ্যে কোথাও কোথাও গান হয়েই চলেছে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে গুপ্‌গুপ্ গুম্‌গুম্ আওয়াজ। গানের তালবাদ্য। গুটি গুটি একটা আখড়ার সামনে দাঁড়াই। একজন গ্রামীণ গাহক গাইছে শব্দগান

মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতনধন।

আখড়ার মধ্যে ভাল ক'রে নিরিখ ক'রে দেখা গেল যেন একটা বিস্তৃত তাঁবু। পাটি আর পলিথিন পেতে অন্তত পঞ্চাশ ষাটজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে ব'সে আছে। তাঁবুর বাইরে রান্নাকাজ চলছে। মস্ত বড় একখানা কড়াইতে খিচুড়ি ফুটছে। আখড়ার মধ্যে একটা জলচৌকি আসন। তাতে একখানা সতীমার ছবি। তামার ঘটে জল। ফুল পাতা আবির ফাগ মাখানো। আমি বন্ধুকে বললাম : একেই বলে আসন। মাঝখানে ঐ যে শাদা আলখাল্লা পরা জটাজুট মানুষ ঘুমোচ্ছেন উনিই হলেন 'মহাশয়'। আর এরা সব 'বরাতি'। বুঝলে ?

একজন বরাতিকে জিগ্যেস করলাম, আপনাদের মহাশয়ের নাম কি ? নিবাস কোথায় ?

: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার নাম শুনেছেন ? সেই বেলডাঙ্গার ভেতরে

ব্যান্যাডা গ্রাম। আমাদের গুরুপাট ওখানেই। আমাদের 'মহাশয়' ত্রৈলোক্য মহান্ত। ঐ যে ঘুমিয়ে আছেন। পাশে আমাদের মা-গোঁসাই। মাটির মানুষ।

বন্ধুকে বললাম : ভেতরে ঢুকবে নাকি ? এদের ওপর ভর ক'রেই কিন্তু সারাবছর চলে সতী মার সংসার। এঁরাই মহাশয় আর বরাতি। এঁবাই দেন খাজনা আর প্রণামী। নতুন বরাতি এই সব গ্রাম্য মহাশয় রিক্রুট করেন।

বন্ধু বললেন : বুঝেছি এরাই গ্রাসরুট লেবেলের ক্যাডার। আর মহাশয় হলেন ল্যাডার। এদের ডেপুটি কালেকটারও বলা চলে কি বলো ? কিন্তু এরা সব মহা ঘাঘু নয় কি ? তোমার নোটবই এঁদের সম্পর্কে কি বলে ?

আপাতত মহান্ত মহাশয় ঘুমোচ্ছেন তাই তাঁর সামনে ব'সে সাইড ব্যাগ থেকে নোটবই বার ক'রে বলি, 'এদের সম্পর্কে একটু মতামত আছে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বইতে। ১৮৯৬ সালে তিনি লেখেন,

> The agents of the Karta are required to pay over their collections to him, at a grand levy held by him at his family residence in the month of March.

তার মানে এই দোলের মেলা। এর পরের অংশটা শোনো :

> Each agent of the karta is generally on very intimate terms with a childless and friendless widow in the village or group of villages entrusted to his charge, and through the instrumentality of this women he is able to hold secret meetings which are attended by all the female votaries within his jurisdiction and in which he plays the part of Krishna.'

: এসব তুমি বিশ্বাস কব ?

আমি বললাম, 'যোগেন্দ্রনাথের আমলে হয়ত এসব হতো। কে জানে ? আমার তো কোন উল্টোপাল্টা চোখে পড়ে নি কখনও। আসলে গুরুবাদের ব্যাপারটা সবাই ঠিক বোঝেন না। তাছাড়া এখানে তুমি কি দেখছো ? শুধুই কি স্ত্রীলোক ? কতই তো পুরুষ বরাতি রয়েছেন এ আখড়ায়। সবাই বিকৃত হ'তে পারে ? আমি অনেক শুদ্ধ মহাশয় দেখেছি'।

কথার মাঝখানে উঠে বসলেন ত্রৈলোক্য মহান্ত। মাথায় ঝুঁটি, গালে দাড়ি গোঁফ, সিঁথিতে অজস্র আবির। মধ্যবয়সী অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ। ভক্তিমান সেবাপরায়ণ। প্রথমেই আমাদের পরিচয় নিয়ে মিস্টিজল খাওয়ালেন। বোধহয় আমাদের কথা কিছু কানে গিয়েছিল। তাই তারই রেশ ধরে বলে উঠলেন, 'গুরু আর শিষ্যের সম্পর্ক আসলে পুরুষ আর নারীর মত। সেইজন্য বলেছে,

প্রকৃতি স্বভাব না নিলে হবে না গুরুভজন।
আগে স্বভাবকে করো প্রকৃতি
গুরুকে পতি স্বীকৃতি।
তবে হবে আসল করণ ॥

এ কথার মানে হ'ল নিজের অহং ত্যাগ ক'রে গুরুর পায়ে সব ছেড়ে দিতে হবে। কাজটা কঠিন।'

মহান্ত কথা বলে চলেছেন অনর্গল আর আমি অবাক হয়ে দেখে চলেছি আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত সেবাধর্ম। একজন শিষ্যা প্রথমে পরম মমতায় মহান্তর কপালে জল চাপড়ে ধুয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। তারপরে একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে তেল মাখিয়ে ঝুঁটি বেঁধে দেয়। তার মুখে সে কী আকুতি আর স্নেহের তাপ! যেন মা জননী। তারপরে গুরুর সারা মুখের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছিয়ে পাশে ব'সে পাখার বাতাস করতে লাগলো আর তাঁর প্রত্যেকটা কথা যেন গিলতে লাগলো গভীর আগ্রহে। এমন দৃশ্য খুব বেশি তো দেখিনি জীবনে। আমার শিক্ষিত মগজ গুজবে উৎসুক, পর্নোগ্রাফিতে পোক্ত, খবরের কাগজে আইন-আদালতের পাতা-পড়া শহুরে বিকৃত মন। এমন অমলিন সম্পর্ক দেখলে অস্বস্তি হয় কোথায় একটা। অংক মেলে না।

ফস ক'রে ব'লে বসলাম : আমাদের মন চট ক'রে সব জিনিসে খারাপ দেখে কেন বলুন তো? একেই কি পাপী মন বলে?

সর্বজ্ঞের মত হেসে মহান্ত বললেন, তাহলে একটা গান শুনুন :

পাপ না থাকলে পুণ্যির কি মান্য হ'ত?
যমের অধিকার উঠে যেত।
যদি দৈত্য দুশমন না থাকত
কামক্রোধ না হ'ত
মারামারি খুনখারাপি জঞ্জাল ঘুচিত।
সবাই যদি সাধু হ'ত
তবে ফৌজদারি উঠে যেত ॥

গান থামিয়ে মহান্ত ক্ষণিক আমাদের দিকে চেয়ে নেন। সে কি আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে? কি জানি? তারপরে হঠাৎ যেন একটা গিটকিরি মেরে গেয়ে ওঠেন :

দোষগুণ দুইয়েতে এক রয়
কর্মক্ষেত্রে পৃথক হয়

পৃথক পৃথক না থাকিলে
দোষগুণ কেবা কয়।
যদি অমাবস্যা না থাকিত
পূর্ণিমা কে বলিত ?

গ্রাম্যগানের এই বিন্যাস এই ন্যায়ের ক্রম আমার বরাবর খুব ভাল লাগে। যেন বক্তব্যের ব্যাখ্যার মত গান এগিয়ে চলে। মনের মধ্যেই পাপপুণ্য, কামপ্রেম, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি! কর্মক্ষেত্রে কেবল তারা পৃথক। এ পর্যন্ত বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মহান্তর চোখের ইঙ্গিতে তাঁর পাশের সেই সেবাতৎপব শিষ্যাটি এবার অতি মধুর তারসপ্তকে গেয়ে উঠল :

গুরু মূল গাছের গোড়া
আছে ত্রিজগৎ জোড়া
কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম
কোথাও নেই ছাড়া।
লঘু যদি না থাকিত
গুরু কে বা বলিত ?

গানের এই অংশ যতক্ষণ হ'ল ততক্ষণ গুরু ত্রৈলোক্য ছিলেন মুদিতচোখ। হঠাৎ চোখ খুললেন। সে চোখভরা এক বিশ্ব জল। বললেন, বড় কঠিন প্রশ্ন তুলেছিলেন বাবাজী। তার জবাবে গৌর গোঁসাইয়ের এত অকাট্য গানখানা অন্তর থেকে উঠে এল।

: অকাট্য গান ?

: হ্যাঁ গান কাটান দেওয়া যায় না। তার মানে এ গানের মধ্যে যে-তত্ত্ব যে-সত্য তা চিরকালের মত নির্ণয় হয়ে গেছে। মহতের লেখা পদ। এ তো বানানো গান নয়।

আমার বন্ধুর বস্তুবাদী মনেও খানিকটা অভিভব জেগেছিল বুঝি। সে তাই বলে বসলো, 'সেকাল থেকে অনেক মিথ্যা আর বুজরুকি দেখে দেখে মনটা খুব দমে গিয়েছিল। আপনার এখানে এসে মনটা শান্ত হ'ল। আচ্ছা বলুন তো, এ সব হিমসাগর ডালিমতলার ব্যাপারগুলোর মধ্যে কোন সত্য আছে ?'

মহান্ত মৃদু হেসে বললেন : সত্য না থাকলে আপনারা এই ভরদুপুরে এখানে এলেন কেন ? ব্যাধি না থাকলে কি কেউ বৈদ্য ডাকে ? তবে সবচেয়ে বড় শক্তি হ'ল নামের শক্তি। সেইজন্যে লালশশী ব'লে গেছেন :

চতুর্বর্গ ফলের অধিক ফলে

যদি থাকে বাসনা
নামরস পানেতে মত্ত
হওরে রসনা।

তার মানে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষেরও ওপরে হ'ল নামের শক্তি। তবে নাম জপলেই কি শুধু হয়? ব্যাকুলতা চাই। তার ওপরে আবার অধিকারীভেদ আছে। আমাদের মতে বলে 'মেয়ে হিজড়ে পুরুষখোজা তবে হয় কর্তাভজা'। মানে বুঝলেন?

: না, প্রহেলিকার মত লাগলো।

: কিছুই প্রহেলিকা নয়। বৈদিক পথ ছাড়তে হবে। বৈদিক পথ বলতে বোঝায় ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ আর সন্ন্যাস। এর কোনটাতেই ঈশ্বর মিলবে না। সব কিছুর মধ্যে থাকতে হবে নির্বিকার হয়ে। যেন মেয়ে হয়েও হিজড়ে, পুরুষ হয়েও খোজার মত। এই অবস্থা এলে তবে মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হবে। সেইজন্যে ভাবেব গীতে বলেছে:

মায়ের যোগ্য হলে মায়ের কৃপা হয়।
মা বলা বোল সত্য হলে সকলি মা-ময়॥

সেইজন্যে আমরা সব জায়গায সতী মাকে দেখতে পাই। ডালিমতলাতেও তিনি হিমসাগরেও তিনি। তিনি সর্বত্র রয়েছেন, তবে কর্মভেদে কেউ তাঁকে দেখে কেউ দেখতে পায় না।

আমি দেখলাম মহান্তর আলোচনা ক্রমেই ভাববাদী হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বরাতিরা ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে তাঁর কাছে পিঠে। তাদের চোখে মুগ্ধতা আর সমর্পণ। এ অবস্থা চলতে দিলে বিপদ। এসব ক্ষেত্রে আমি ঝপ ক'রে একটা উলটো কথার টান মারি। এবারেও তাই সবাইকে সচকিত ক'রে ব'লে বসলাম, 'আচ্ছা অনেকে যে বলে খাদ্যের সঙ্গে শরীরের যোগ আছে তা মানেন? কুমীরদহ গাঁয়ের শিবশেখর বললেন তিনি নিরিমিষ খান। আপনিও তাই? মাছ মাংস খান না?

মহান্তর ভাবের ঝিম এই এক প্রশ্নেই কেটে গেল। মানুষটি প'ড়ে গিয়েছিলেন কথার কুম্ভীপাকে। সেখান থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'আঁশ নিরিমিষ ব'লে কিছু নেই। সবই তাঁর সৃজন। তবে শরীরের মধ্যে খাদ্যের ক্রিয়া আছে বৈকি। তার কাজ তাপ বাড়ানো। তাই সাধক মানুষ তাপ এড়াতে চান। শুধু তো ত্রিতাপ নয়। দেহের তাপও বিঘ্ন ঘটায় জপে তপে। আমি নিরিমিষ আমিষ বাছি না। তবে মাছ খাই কিন্তু মাংস খাই না।'

: কেন ? কোন কারণ আছে ? নাকি রুচি হয় না ?

: সাধক কখনও কারণ ছাড়া কাজ করে ? সে তো অনেক বুঝে, অনেক নেড়েচেড়ে, অনেক দেখেশুনে, তবে খাঁটিপথে দাঁড়ায় । মাছ খাই কেন জানো ? মাছের মধ্যে কাম নেই । কামে তাদের জন্ম নয় ।

দুই বন্ধু কানখাড়া করি । লৌকিক মানুষ অদ্ভুত কতকগুলো লজিকে চলে । তার খানিক মনগড়া, খানিক গুরুর বানানো । মাছের মধ্যে কাম নেই, কামে তাদের জন্ম নয়, কথাটার মধ্যে অভিনবত্ব আছে বেশ । তাই বলি, 'মাছের কাম নেই ? তাহলে সৃষ্টি হয় কেমন করে ?'

মহান্ত বললেন, 'মাছের যোনি লিঙ্গ নেই । তাই কথায় বলে : মাছের মাছা নেই । ঘর্ষণে তাদের সৃষ্টির বীজ । যাকে বলে রতি । রতি বা তাপ থেকে ডিমের সৃষ্টি । তাই মাছ খেলে মানুষের কামপ্রবৃত্তি আসে না । কি বলো গো তোমরা ?'

সবাই তারিফচোখে মাথা নাড়ে । একজন শিষ্য বলে, 'আমরা আর কি বলবো ? গৈ-গেরামের মুরুখ্যু মানুষ । কি জানি বলো ? তাই তোমারে গুরু মেনেছি ? তুমি যা বলাও তাই বলি । তুমি যা জানাও তাই জানি । তুমি ছাড়া আমাদের তিলার্ধ চলে না ।'

মহান্ত বললেন, 'মাছ হলো সবচেয়ে সাত্ত্বিক প্রাণী । তার মধ্যে সাধক লক্ষণ । দেখেছেন মাছের চোখে পলক নেই, চোখ স্থির ? তার মানে সদাই ধ্যানস্থ । আমি তো তাই কাঁদি : সতীমা কেন পলক দিলে ? কেন মীনের মত নয়ন দিলে না ? তাহলে অপলক তোমার লীলা দেখতাম ।'

কাণ্ড দেখে আমি তো থ । সেবিকা শিষ্যা আঁচল দিয়ে গুরুর চোখ মোছায়, জোরে জোরে পাখার বাতাস করে । মা-গোঁসাই ভেতর থেকে ব'লে ওঠেন, 'মানুষটার মনে বড় তাপ' ।

মহান্তর ক্রন্দনপর্ব খানিক ধাতস্থ হলে জিগ্যেস করলাম : মাংস খেলে কি কাম বৃদ্ধি হয় ?

: শুধু কাম নয়, সব প্রবৃত্তিই বাড়ে । রাগ দ্বেষ হিংসা । আবার বিবেচনা নষ্ট হয় । কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না ।

: তাই নাকি ? কেন ?

: কি বোঝাই আপনাকে বলুন তো দেখি ? আপনি শিক্ষিত মানুষ । কোন্ মাংস খাবেন ? পাঁঠা ? তাদের সঙ্গম দেখেছেন ? মা-মাসী জ্ঞান আছে তাদের ? সে মাংস খেলে মানুষের কি দশা হয় বোঝেন না ?

বাপরে । কথার কি ঝাপট । বাক্যের কি শক্তি । সংকোচে কারুর দিকে তাকাতে পারি না । লজ্জা এড়াতে বলি, 'এত সূক্ষ্ম চিন্তা তো করিনি কখনও ।

তাই আপনাকে নেড়ে বসেছি। মাপ করবেন।'

ততক্ষণে মানুষটা শান্ত, জল। প্রসন্ন হেসে বললেন, 'জানতে চাওয়ায় ভুল কোথায় ? তবে সব জানার জবাব নেই। কেননা সব কিছুর' নামভেদ আছে রূপভেদ আছে। রকম আলাদা স্বাদ আলাদা। যেমন ডাব আর নারকেল, যেমন মুড়ির চাল আর ভাতের চাল। যেমন বেণু মুরলী বংশী বাঁশী....'

মহান্তর কথা থামিয়ে বলে বসি, 'কি বললেন ? বেণু মুরলী বংশী বাঁশী কি এক নয় ? তফাৎ কিসে ?'

: অনেক তফাৎ। বেণুর পাঁচ ছিদ্র। মুরলীর তিনছিদ্র। বাঁশী সাত ছিদ্র। বংশী নয় ছিদ্র। তফাৎ নেই ? আকারে তফাৎ প্রকারে তফাৎ। বুঝলেন না ?

বুঝলাম বৈ কি মনে মনে। খুব ছিদ্রান্বেষী নই অবশ্য। তবু মহান্তর কথায় কি একটা ধন্দ আছে। সবটাই তার বানানো না বাগ্‌বিভূতি। এই কথার পাকেই লোকটা শিষ্য বানায় নাকি ? তবে এলেম আছে। লোকটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত। কিন্তু ততক্ষণে মহান্ত এক রাউণ্ড জিতে আমাকে আবার পেড়ে ফেলে বলেন, 'আধারে ছিদ্র না থাকলে আসা-যাওয়া হবে কোথা দিয়ে ? মানুষের দেহে কটা ছিদ্র বলুন তো ?'

আঃ, খুব কমন কোশ্চেন পেয়ে গেছি এবারে। মৌজ ক'রে বলি, 'মানুষের শরীরে নটা ছিদ্র। যাকে বলে নবদ্বার। দুই চোখ দুই নাক দুই কান আর মুখ পায়ু উপস্থ। ঠিক বলেছি ?'

: পুরুষের ক্ষেত্রে ঠিক। নারীর তা ছাড়া আছে যোনি। তাকে বলে দশমীদ্বার।

এত সোজা কোশ্চেনেও পুরো নম্বর না পেয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকলাম। তখন মহান্ত বললেন, 'মানুষের সাধন যখন হয় তখন একেক অবস্থার একেক নাম। এই যে বাঁশী বংশী মুরলী আর বেণু। এসব সাধকের এক এক অবস্থাকে বলে। শুনবেন ?'

: নিশ্চয়ই। এমন সব কথা কখনও শুনিনি।

: শুনবেন কি ক'রে ? ঘরে ব'সে তো শোনা যায় না। বেরিয়ে পড়তে হয়। মেলা মচ্ছবে মিশতে হয়, মিলতে হয় মানুষের সঙ্গে। মানুষের কাছেই সর্ব জিনিস বাবাজী। মানুষের বাইরে কোন প্রাপ্তিবস্তু নেই।

খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে আমি বলি, 'বেণু মুরলী বংশী বাঁশী সম্পর্কে কি যেন বলবেন ?'

'হ্যাঁ বলবো। সেইটাই সবচেয়ে নিগূঢ় কথা' ত্রৈলোক্য মহান্ত গলাটা খুব খাদে এনে সোজা চাইলেন আমার দিকে অন্তর্ভেদী চোখে তারপর বললেন, 'মানুষের

চেতনা যখন থাকে নিদ্রিত তখন তিন ছিদ্রে বাজে, তাকে বলে মুরলী অবস্থা। তিন ছিদ্র হলো সত্ত্ব রজ তম। এরপরে সত্তার ঘটে উত্থান! তাকে বলে বেণু। তাব পাঁচ ছিদ্র। মন, দুই নাসিকা আর দুই চোখ—এই পাঁচ। এর পরে বাঁশী অবস্থা যখন মানুষ সচৈতন্য হয়। তখন সাতছিদ্রে বাজে। তার মানে বেণুর পাঁচ ছিদ্রের সঙ্গে তখন যোগ হয় দুই কর্ম অর্থাৎ মনকর্ম আর কায়কর্ম। ব্যাস্ সবশুদ্ধ সাত। মানুষের চতুর্থ অবস্থার নাম বংশী। তখন নয় ছিদ্র। অর্থাৎ বাঁশীর সাতের সঙ্গে তখন যোগ হয় পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ। এই হলো সাধকেব চরম অবস্থা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম মহান্তর বাক্যের বিন্যাসে। খানিক পরে কথার ঘোব কাটলে জিগ্যেস করলাম . আপনাদের ধর্ম স্বকীয়া না পরকীয়া?

: স্বকীয়া আর পরকীয়া বলতে কি বোঝেন? নিজের স্ত্রী আর সাধনসঙ্গিনী?

: হ্যাঁ। তাইতো শুনি।

: সবটাই ভুল। আমাদেব আইনপুস্তকে বলে :

সতীনারী ব্যভিচারী দুয়ের কর্ম নয়।
সহজ দেশে করণ করা দেশ আলাদা হয়॥

তার মানে নিজের স্ত্রী বা অন্যের নারী কেউই নয়। স্বকীয়া কথার মানে একেবারে আলাদা। আমরা মনে কবি, দেহের মধ্যেই নারী-পুরুষ—তারই রমণকে বলে স্বকীয়া। তার বাইরে সব সঙ্গমই পরকীয়া। কর্তাভজা ধর্মে এই স্বকীয়া সাধনা। এবারে বলুন এ ধর্মে কি কাম থাকতে পারে? আমাদের মত আলাদা।

: তা বুঝলাম। কিন্তু আউল বাউল সাঁই দরবেশ—আপনারা কোন্‌টা?

মহান্ত বললেন : ও সব একেবারে অন্য রাস্তা। ফকিরি তত্ত্বের ব্যাপার। এসাহক তুমি কিছু জানো নাকি?

আখড়ার মধ্যে থেকে গুঁড়ি মেরে সামনে উঠে এল এক মাঝবয়সী মুসলমান। এরই নাম এসাহক। জানা গেল সে কর্তাভজা নয়। তবে ব্যান্যাডার দলের সঙ্গে এসেছে মেলায়। ত্রৈলোক্য মহান্তকে খুব খাতির করে। এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললো, 'আমি সব তেমন জানি না। তবে একবার ছেঁউড়েয় লালনের আখড়ায় গিয়েলাম। সেখানে একটা শ্লোক শুনে মনে মনে গেঁথে নিয়েছি সেটা বলতে পারি। বলবো?'

: বলো।

: আউলে ফকির আল্লা
বাউলে মহম্মদ

দরবেশ আদম সফী
এই তক্ হক্।
তিনমত একসাথ
করিয়া যে আলী
প্রকাশ করিয়া দিলো
সাঁইমত বলি ॥

আমি থম্ মেরে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে মহান্তকে বললাম, 'কিছুই তো বুঝলাম না। এ যে কেবলই পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ছি। সব কিছু জানতে চাই ঠিকই কিন্তু আমার কি অত সামর্থ্য আছে? আপনি কি বলেন?'

মহান্ত বললেন, 'মানুষের সামর্থ্যের কি সীমা আছে? তবে গুরুব কৃপা লাগে। যাইহোক, দুঃখ করবেন না। আপনাকে একটা আস্তানায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে একজন ফকির আছেন। সতী মার মেলায় তিনি বরাবব আসেন। বেনোয়ারী ফকির। আমাদের ঘরের মহাশয় নন। তবে আসেন প্রতিবাব।'

: মহাশয় নন তবু আসেন কেন?

: এটা একটা সিদ্ধপীঠ তো? তাই অনেকে আসেন। মেলামেশা হয়। ভাবের লেনদেন হয়। চেনাজানা হয় পাঁচজনে। চলুন দেখি যদি পেয়ে যাই।

অনেক ঘুরেও বেনোয়াবি ফকিরের দেখা মিললো না। তবে একজন জানালো ফকির অসুস্থ তাই আসেননি এবাব। আমি বললাম . অসুখ? ফকিরের অসুখ হয় না শুনেছি যে?

লোকটা নির্বিকারভাবে বললো : আজ্ঞে, গা থাকলেই ঘা হবে।

কি চমৎকার এইসব লৌকিক বুলি। 'গা থাকলেই ঘা হয়'। হঠাৎ মনে পড়লো রয়েল ফকিরের কথা। সেই তো বলেছিল মেলামচ্ছবে গেলে অনেক মানুষ অনেক অভিজ্ঞতা হয়। সে-ই তো প্রথম হাতে ধ'রে অনেকগুলো মেলা ঘুরিয়েছিল। মানুষটা আজ মাটির তলায় ঘুমোচ্ছে বটে, তার কথাগুলো কিন্তু জেগে আছে। তার কাছ থেকে ঘোষপাড়ায় যেসব ফকির ও মহাশয়দের পরিচয় পেয়েছিলাম তা জীবনের অক্ষয় সম্পদ। আজ শেষবারের মত ঘোষপাড়ার মেলা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আউলচাঁদ-রামশরণ-রামদুলাল-সতীমা সবাইয়ের কথা মনে পড়লো। একদল ক্লিষ্ট অবমানিত মানুষকে তাঁর শাস্ত্রবর্ণকলংকিত ধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্ত ক'রে এনেছিলেন উদার মানুষভজনের অসীম সম্ভাবনায়। তাঁদের উত্তরপুরুষরা যদি সে-ধর্মে এনে থাকেন লোভের কলংক, দ্বেষের কালিমা আর শোষণের নিষ্ঠুরতা তবুও তো মূলধর্মের মহিমা অমলিন থেকে যায়। থেকে যায় তার শুদ্ধবিধান আর ভাবের

গীত। গ্রাম থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদে কর্তাভজাধর্মের বিশ্বাসী মানুষগুলির আকুতি আর উৎসর্জন তো সত্যি। নিজের চোখে দেখেছি এই আবেগের টানে এমনকি বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে আসে কত মহাশয় আর বরাতি। আজও।

সারাদিনের সমস্ত ক্রিয়াকরণ সমাপনের পর মেলা তখন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। আখড়াগুলোয় জ্বালা হচ্ছে সাঁঝবাতি। ক্লান্ত দণ্ডীখাটা মানুষগুলো অপরিসীম শ্রমের শেষে নিঃশেষে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রতিবন্ধী বালক বালিকাগুলি মুখ গুঁজেছে মা-বাবাব সন্তপ্ত বুকে। শুধু এক একটা সমাবেশে একটানা চলছে ভাবের গান। সে গানে আত্মধিক্কারের আর অনুতাপের সুর :

অপবাধ মার্জনা কর প্রভু।
এমন মতিভ্রম জন্মজন্মান্তরে তোমার সংসারে
হয় না যেন কভু
বিকলে কবলে বড কাবু।
আমার ত্রুটি কত কোটিবার
লেখাজোকায় লাগে ধোঁকা সংখ্যা হয় না তার।

গভীর নির্জন পথ নয়, অসংখ্য সহস্র মানুষের উদ্বেল উপস্থিতিতে ভরা, কত সশংক ভরসা আর বিশ্বাস, কত সুগভীর আশাঘেরা আত্মনিবেদন এ মেলায় দুশো বছর আছড়ে পড়েছে। চারদিকের অজস্র মানুষ আর তাদের সম্মিলিত ভক্তিকে আলোকিত সম্মান জানাতেই আজ যেন উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। সেই উদ্দীপ্ত প্রান্তর আর চঞ্চল জনস্রোত দেখে লালশশীর মত আমারও মনে হয় 'রাস্তার ওপর বাসাঘর নাগর দোলনা'। মনে হ'লো, লালশশী বাউলদের মত মনের মানুষ খুঁজে সারাজীবনের কান্না গেঁথে রাখেননি তাঁর গানে। মনের মানুষ ছিল তাঁর ভেতরেই। শুধু মনে হয়েছিল তাঁর 'কাজ কি সেই মনের মানুষ বাইরে বার করে ?'

●

কলকাতার নামকরা খবরের কাগজে খবরগুলো বেরোয় না কিন্তু মফঃস্বলের চার পাতার ছোট কাগজে মাঝে মাঝে হেডলাইন হয় : বাউল নিগ্রহ। আমি এমনতর অনেক খবর কেটে ক্লিপিং ক'রে রাখি। খবরের ধরনটা প্রায় একরকম। অর্থাৎ নদীয়া বা মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামে এক বা একদল বাউল কিংবা মারফতী ফকিরের মাথায় ঝুঁটি চুল দাড়ি কেটে, একতারা ভেঙে দিয়ে,

মারধোর করেছে কট্টর ধর্মান্ধরা। কাগজের খবরটা ঐখানেই শেষ হয়। জানতে মন নিশপিশ করে যে তারপর কি হলো ? ব্রাত্য বাউলফকিররা কি এ নিগ্রহ বারে বারে মেনে নেয় না প্রতিরোধ গড়ে ? প্রশাসন কি করে ? গ্রামের রাজনীতিকরা এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ? জানা যায় না।

কিন্তু আমার নিজস্ব সূত্রে কেবলই খবর আসে বেনোয়ারি নামে একজন ফকির সদাসর্বদা এমন ঘটনা ঘটলেই বাউলদের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মোল্লাদের সঙ্গে ধর্মীয় 'বাহাস' অর্থাৎ বিতর্কে নামেন। প্রায় সব জায়গাতেই শেষ পর্যন্ত বেনোয়ারির জিৎ হয়। অনেকবার ভেবেছি যাবো বেনোয়ারির কাছে। হাল হদিশ পাইনি তেমন কোন। মানুষটা কি তবে অরণ্যদেবের মত নেপথ্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন—এমন পরিহাসভরা চিন্তা ক'রে নিজেই হেসেছি। শেষমেশ এবাবের সতী মার মেলায় ত্রৈলোক্য মহান্ত মানুষটির ঠিকানা দেন। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বর্ডারে সর্বাঙ্গপুরের কাছে মাঠপুকুর গ্রামে বেনোয়ারি ফকিরের স্থায়ী সাকিন। মানুষটার সম্পর্কে কিছু খবর বাতাসে ওড়ে শিমুলতুলোর মত। ফকিরের কোরাণ আর হাদিশ নাকি কণ্ঠস্থ। মানুষটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাকি স্টেনগান ধরতেন। এ দিগরের সমস্ত বাউল ফকির নাকি বেনোয়ারির গোলাম।

কি দরকার এসব গুজবে ভর ক'রে ? মানুষ তো ? একদিন দেখে আসলেই হবে। হাডিরামের একটা গান মনে আসে, 'মানুষ মানুষ সবাই বলে/ কে করে তার অন্বেষণ ?' তা মানুষের অন্বেষণে আমার তো অন্তত কোন ক্ষান্তি নেই। একদিন চালচিঁড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম।মাঠপুকুর খুব একটা তেপান্তর নয়, তবে আমার ডেরা থেকে সেখানে যাবার রাস্তাটা খুব ঘুর পাকেব। তবু শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাই বেলা বারোটায়। আগে একটা আন্দাজী পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলাম অবশ্য। ডাক বিভাগের প্রসিদ্ধ তৎপরতায় ফকির তা পাননি। তাতে ক্ষতি নেই। বিশাল লম্বা একবগ্‌গা চেহারার শক্ত কাঠামোর মানুষটার মধ্যে একজন নরম লোক বাস কবে। হৈ হৈ ক'রে সম্বর্ধনা করলেন : আরে আসুন আসুন। চিঠি পাইনি তো কি হয়েছে ? আপনার মনের চিঠি এই তো পেলাম, তাতে খোদার শিলমোহর। ব্যাস্ তাহলেই হলো। উঠুন দাওয়ায়। বসুন গরীবের এবাদতখানায়। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার নাম শুনেছি বৈকি ! শুধু চেহারাটা মেলানো বই তো নয়। চেহারায় তো মানুষের আদলই দেখছি। হাঃ হাঃ। গরীবের কুঁড়েয় দুটো সেবা হবে তো ? ওহে সহিতন বিবি, এ বাবুর জন্যে দুটো চাল লাও।

নজর ক'রে দেখি উঠোনে একজন অল্পবয়সী মুসলমান বউ গাঢ় বেগুনফুলী শাড়ি প'ড়ে উনুন ধরাচ্ছে কাঠকুটো নারকেল পাতা দিয়ে। বিরাট এজমালি

উনুন। তাতে একটা শানকি চাপা দেওয়া থাকে সাধারণত। হঠাৎ অতিথি-পথিক এসে পড়লে চট ক'রে দুটো রেঁধে দেওয়া যায়। আপাতত জ্যৈষ্ঠের খরতাপে সহিতন বিবির গৌরী তনু ঘামে সারা। ভাবলাম, তার দিকে চেয়ে, বেনোয়ারি ফকির বেশ কমবয়সী বিবি জোগাড় করেছেন। হঠাৎ বেনোয়ারি ঘর থেকে এক মস্ত খেজুরপাতার পাটি এনে দাওয়ায় পাতলেন। দুটো হাতপাখা জোগাড় হ'লো। সহিতন বিবিকে বেশ হেঁকে তিনি এক প্রস্থ চা আর মামলেটের হুকুম দিয়ে যেন অন্তর্যমীর মত আমার মন পড়ে নিয়ে বললেন, 'যা ভাবছেন তা নয়। সহিতন বিবি আমার মাইনে-করা কাজের লোক। একা মানুষ তো আমি। বয়সও হয়েছে। দুটো দানাপানি ফুটিয়ে দেয় আর আমার ঐ ঘরের দাওয়ায় প'ড়ে থাকে একটা বাচ্চা নিয়ে। বরে তালাক দিয়েছে। আশ্চর্য হবেন না। গ্রামদেশের গরীব মুসলমান ঘবে তালাক-খাওয়া মেয়ে দুটো-একটা সর্বদা মজুত থাকেই।'

কথাটা খুব নির্বিকারভাবে বললেও বেনোয়ারিব গলাব স্বরে একটা মর্মজ্বালা, একটা গাঢ় বেদনা যেন মেদুব হয়ে ওঠে। আমি অবস্থাটা সামলাতে ব'লে বসি, 'একেবারে একা থাকেন। সময়কালে বিয়েয় বসেন নি কেন ? তখন থেকে ফকিরির নেশা ?'

'আরে না না' মানুষটা খুব দেল্‌খোলসা ভঙ্গীতে জোরে হেসে বলেন, 'ফকিরি নিই অনেক পবে। আসলে কি জানেন ? বাড়ির গাছে কুমড়ো কি লাউ প্রথম যেটা ফলে সেটা হয় ঠাকুবসেবায় লাগে নয়তো বীজ করে। তো আমি হলাম পিতামাতার জ্যেষ্ঠ ছেলে, তাঁবা আমাকে বিয়ে সাদি না দিয়ে বীজ ক'বে গেছেন। হাঃ হাঃ। কারুব ভোগে লাগলাম না। কি বলেন ?'

মানুষটা তো ভারি চকচকে ! সঙ্গে সঙ্গে বেনোয়ারি ফকিরকে ভালবেসে ফেললাম। বললাম, 'বীজই তো আসল। তবে সে বীজ কোথায় পড়ছে সেটাই মূল কথা, মাটিতে না পাষাণে। মনে হয় আপনার বীজে অরণ্য হয়ে যাবে। ঠিক নয় ?'

'বিলকুল ঠিক' দাড়িতে আঙুলেব চিরুনি চালিয়ে ফকির বললেন, 'হ্যাঁ, শিষ্যশাবক চাড্ডি আছে বটে আমার। এখনই সব আসবে। জলিল, মানউল্লা, আবু বক্কর, অমরেশ, উমিদ। ঐ দেখুন বলতে বলতে আবু বক্কর হাজির। যাক, আপনার কপাল ভাল। বক্কর ভাল গাহক। আজ ক'টা গান শুনতে পাবেন।'

শাদা ধুতি লুঙ্গি ক'রে পরা, শাদা আলখাল্লা, একটা শাদা ঘেরাটোপে মোড়া দোতারা। আবু বক্করের শুভ্র মূর্তি দাওয়ায় উঠে নতজানু হ'ল বাবু-হয়ে-বসা বেনোয়ারির সামনে। বক্কর তার মুখখানি একেবারে ডুবিয়ে দিল গুরুর কোলে।

গুরু তার ঝুঁটি বাঁধা চুলে বিলি কাটলেন, পিঠে দিলেন হাতের উষ্ণতা। প্রণাম-পর্ব শেষ হ'ল গুরুর পায়ের দুটো বুড়ো আঙুলে যখন শিষ্য চুম্বন করলো।

প্রণামের পদ্ধতিটা ভারী নতুন ধরনের। জিগ্যেস করলাম, 'একেই কি আপনারা বলেন সেজদা ?'

বেনোয়ারি বললেন, 'সেজদা বা অভিবাদন নিয়ে তর্ক আছে। আমাদের মুসলমান আলেমগণ বলেন একমাত্র আল্লা ছাড়া আর কাউকে সেজদা হারাম। তারা বলেন, তবে কেন ফকিররা মানুষ হয়ে মানুষকে সেজদা করে ? এ ব্যাপারে আমাদের জবাব সাফসুফ। সেজদা করি মানুষে খোদা আছে বলে। এ জবাবে ওরা খুশি হয় না। আমাদের সঙ্গে এই নিয়ে বেধে যায় মাঝে মাঝে। না না দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়। শুধু বাহাছ অর্থাৎ তর্ক '

আমি বললাম, 'একটা গানে শুনেছিলাম—যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।'

: 'গান আপনি এখন চোপরদিন শুনবেন কত। আবু বক্কর এসে গেছে। ও হ'ল গানের পাখি। ও হ্যাঁ ভালকথা, পাখি কোথায় গেল বলো তো বক্কর ?'

বক্কর বললো, 'পাখি ? আবার উড়েছে ? দেখি কমন্‌দিকে গেল ; নড়া ধ'রে ধ'রে আনি।'

আমি বললাম, 'এ কি ? আপনি ফকির মানুষ পাখি পুষেছেন ? সে তো বন্ধন ?' বেনোয়ারি আপন মনে হাসেন আর দাড়িতে আঙুল বোলান। হঠাৎ বাড়ির কানাচ থেকে আবু বক্করের গানের টুকরো ভেসে এল :

আমি একটা পাখি ধরেছি।
যতই ক'রে ঝটর পটর
পোষ মানাবো দিয়ে মটর
শিক্‌লি দিয়ে আটকে রাখার
ফন্দী করেছি।
ধরেছি ধরেছি পাখি ধরেছি ॥

কী কাণ্ড ! সত্যিই আবু বক্করের হাতে-ধরা এক কিশোরীর বিনুনি। সবুজ শাড়ি জড়ানো তেরো-চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে আর আবু বক্করকে ঘুঁষি মারছে। তার ফরসা মুখখানা রাগে গনগনে। মাথা নীচু ক'রে জেদী ভঙ্গীতে মেয়েটা দাওয়ার সামনে দাঁড়ালো। বক্কর বললো, 'ছাঁচতলায় ব'সে লুকিয়ে আচার খাচ্ছিলো। এই দেখুন আমার আলখাল্লায় আচার মাখিয়েছে, আমাকে খামচে দিয়েছে, ঘুঁষি মেরেছে। এর প্রিতিকার নেই ? আমি বিচার চাই।'

'বিচার কাঁচকলা' মেয়েটা বুড়ো আঙুল দেখালো জিভ ভেঙিয়ে।
বেনোয়ারি বললেন, 'বিচার হয়ে গেছে। সে ছোঁড়া আজ তোকে নিতে এলে যেতে দেব না। ব্যাস'। মেয়েটি পা দাপাতে দাপাতে মল বাজিয়ে সারা উঠোনে ঘুরে ঘুরে একসা। বেনোয়ারি বললেন, 'আমিও বিয়ে সাদি করিনি আবু বক্করও না, দ্যাখো একবার ঐহিকের মায়া। হ্যাঁরে, ইয়াকুব তোকে এত ভালবাসে ?' মেয়েটি পালালো।
সংসারবিবাগী ফকিরেব বাড়ি এমন মধুর জীবনের ছবি দেখে খানিকটা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফকির সে অবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে বললেন, 'ভাইপোর মা-মরা মেয়ে। নাম পাখি। ওকে এনে পুষেছিলাম পাঁচ বছর বয়সে। টিয়ে পাখির মত ঘুবতো ফিরতো, দানাপানি খেতো। ঠুকরিযেও দিত খুব। তারপরে সবে পোষ মানছে এমন সময় আমারই এক শিষ্যের জ্যাঠা পাখিকে পছন্দ ক'রে তার ছেলে ইযাকুবের সঙ্গে সাদী দিয়েছে। ব্যাস। ভাবলাম মায়া কাটলো। কোথায কি ? রোজ পালিয়ে আসে। পাখি তো পাখিই।'
ইতিমধ্যে চা ডিমভাজা এল। পাখিই এনেছে। যেন কত নম্র শান্ত এখন। লাজুকলতা। খাবাব নামিয়ে দিযেই দৌড়।
খাওয়া-দাওযা চুকলে আমি বললাম, তখন যে সেজদার কথা বলছিলেন। ইসলামী শাস্ত্রে এ বিষযে কি বলে ?
: দেখুন অত শাস্ত্রপ্রমাণ দিযে কি সব কিছু হয় ? আমরা তো শাস্ত্রছুট। আমরা ফকির। আমরা বলি 'খদ' মানে ব্যক্তি বা মানুষ। 'সেই মানুষ না ধরিলে/ খোদা কভু না মিলে।' আবু, তোমাব সেই আর্জান শাহ্ ফকিরের গানটায় কি বলে যেন ?

: খদ আর খোদা উভয়ে একজন।
খদকে ধ'রে ক'রো ভজন ॥

: একেবারে হক্ কথা। তা খদকে যদি মানি তবে তারমধ্যে খোদাকেও মানি। নয়কি ? তাহলে খোদাকে যদি সেজদা করি তবে খদকে সেজদা করতে আর বাধা কি ? আসলে কি জানেন ? সেজদা দু'বকমের। 'সেজদা অবুদিয়ত' বা এবাদত আর 'সেজদা-এ তাহিয়া' বা তাজিম। কি আবু বক্কর বাবুকে বোঝাতে পারবে ? বোঝাও দেখি। আমিও বুঝে নিই তোমাব এলেম কতটা বাড়লো।
আবু বক্কর বললো, 'মুর্শেদের কৃপায় যেটুকু বুঝেছি আপনাকে বলছি। বাবা, ভুল হ'লে শুধরে দিবা কিন্তুক। শুনুন বাবু। 'সেজদা অবুদিয়ত' শুধু আল্লার উদ্দেশ্যে যে প্রণাম তাকে বলে। তার বহু নিয়ম আছে। আর 'সেজদা-এ তাহিয়া' বা 'তাজিম' আলাদা জিনিস তাজিম মানে হ'ল গিয়ে সম্মান। তার মানে

সম্মান ক'রে সেজদা সকলকেই করা যায়। আমরা ফকিররা সেইজন্য সেজদা করি সব মানুষকে।'

আমি বললাম, 'আমি যখন কুবির গোঁসাইয়ের গান সংগ্রহ করতাম তখন তাঁর একটা গানে সেজদার কথা পেয়েছিলাম কিন্তু মানে বুঝিনি। এখন যেন বুঝতে পারছি।'

: কি বলুন তো গানখানা ?

: নামাজ পড়ো যত মোমিন মুসলমানে।
আল্লাজী সদর হন না দিদার দেন না
সেজদা করি কার সামনে ?
হয় আপনি আল্লা আপন মনে।

বেনোয়ারি একেবারে হৈ হৈ ক'রে উঠলেন, 'আরে এতো খাঁটি মারফতী গান। 'আল্লাজী সদর হন না দিদার দেন না' ঠিকই তো। আল্লা সামনে আসেন না, দর্শন দেন না। তাহলে কাকে সেজদা করি ? কাজেই আপন মনে বসতি যে আল্লার তাকেই সম্মান করো। সব খদের মধ্যেই যে খোদা তাকেই দাও সম্মান। বাঃ বাঃ। মনটা ভাল হয়ে গেল।'

এদিকে জ্যৈষ্ঠের তাপ বাড়ছে। গরম ভাতের গন্ধ উঠছে। চুপিসাড়ে ফকিরের আর ক'জন শিষ্য কখন সামিল হয়ে গেছে দাওয়ায় কথায় কথায় খেয়াল হয়নি। খেয়াল হ'লো যখন পাখির ধমকানি শুরু হলো, 'তোমরা ছ্যান করবা না ? খাবা না ? বেলান্ত ব'সে ব'সে গজালি করলেই চলবে ?'

আবু বক্কর বলল, 'উঠুন বাবাসকল। পেছনে ছাতারে পাখির খ্যাচর ম্যাচর শুরু হয়েছে। এ না ঠুকরে থামবে না'। অচিরে তার ঝুঁটি ধ'রে টান মারলো পাখি। 'বাপরে' ব'লে খুব মায়ালী হেসে বক্কর উঠলো। পেছনে আমরা। তেল গামছা তৈরি। ঝাঁপিয়ে পড়া গেল আখড়া সংলগ্ন ঠাণ্ডা পুকুরে। স্নান ক'রে এসে দেখি দাওয়ায় ভোজনপর্ব সাজানো। তবে শুধু ফকির আর আমার। ভাত, ডাল, ভাজা, পটলের তরকারি আর পাকা আম। সামনে বসে থাকলো চার শিষ্য। খেতে খেতে একসময় হঠাৎ দেখি চারশিষ্য মেটে দাওয়ায় উটপাখির মত নাক ডুবিয়ে ডান হাত প্রসারিত ক'রে দিলো গুরুর দিকে। গুরু তাদের চারখানি অঞ্জলিতে দিলের চারগ্রাস অন্নপ্রসাদ। ভক্তিভরে প্রসাদ খেয়ে তারা মাথায় হাত মুছলো।

ফকিরদের আচরণবিধি একটু অন্যরকম। সারাদিনে আরও কত কি দেখবো না জানি। খাওয়া শেষ হ'তে আমরা শুলাম দুদণ্ড খেজুর পাটিতে। কথা চলতে লাগলো। ওদিকে হেঁসেলের দাওয়ায় শিষ্যশাবকরা খাচ্ছে। সঙ্গে পাখির কিচির

মিচির। আমি বেনোয়ারিকে বললাম, 'এখন ফকিরিতন্ত্রে কি নতুন নতুন মানুষ আসছে? বেশির ভাগ গৌণ সম্প্রদায় তো পড়তির দিকে।'

: ফকিরির পথে চিরকাল মানুষজন কম। এখন আরও কম। পথটা কঠিন তো। ক্রিয়া-করণের চেয়ে এতে উপলব্ধির দিক বেশি, দমের কাজ আছে। শ্বাসের কাজ। ভুল হ'লে শরীর ভেঙে যায়। এ পথে দাঁড়ানো কঠিন, ধ'রে বাখাও কঠিন। আমাদের একটা গানে বলেছে;

ফকিরিতে ফিকিরি করলে
নরকপুরী যেতে হবে ভাই।
সেই নরক ভক্ষক জনার
নরকেতেই ঠাঁই॥

গানটা বুঝলেন তো? ফকিরিতে ফিকিরি চলবে না। ফিকিরি মানে ভুয়োতাল, ফাঁকি। মিথ্যেকথা। কাম-লোভ-হিংসা-দ্বেষ একেবারে ত্যাগ করতে হয়।

: আচ্ছা, আপনি তো বিয়ে করেননি। সব ফকিরই কি তাই?

: না সংসারী ফকিরও আছে। তবে তারা গৃহীদের মত কামের বশীভূত নয়। বীর্যরক্ষা আমাদের প্রধান কাজ। আমরা বলি বিন্দু। এই বিন্দু বা কীটকে বলে শুক্র। আমরা বলি নফ্‌স্।* এই নফ্‌স্ বা কামকে সর্বদা শাসনে রাখতে হয়।

: আপনাদের ফকিরি মতে তাহলে শারীরবিদ্যার স্থান খুব বেশি।

: মারফৎ কথার একটা মানে তো সেইটাই। একে বলে 'এল্‌মে তশরীহ', মানে শারীরস্থান বিদ্যা। যাকে বলে অ্যানাটমি।

আমার মনে হতে লাগলো যেন এই মধ্যদুপুরের মায়ায় কোন্ একটা অজানা রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। তার দারুণ আকর্ষণ। সামনে আমার যিনি শুয়ে শুয়ে অবহেলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাচ্ছেন তিনি যেন বেনোয়ারি নামে কোন মনুষ্যদেহধারী নন, যেন ফেরেশ্‌তো। স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আর তার ভাষ্যরচনায় ওস্তাদ। তার চেয়েও বেশি আত্মজ্ঞানে যাকে বলে খুব মজবুত ইনটেলেকচুয়াল। পাশাপাশি যেন তাঁর জ্ঞানের রাজ্যে আমি নিতান্ত নিউটন। সেই কথা মনে রেখে অজ্ঞানতার নিম্নদেশ থেকে আমি জানতে চাইলাম এই এলেমদার ফেরেশ্‌তার কাছে, 'দেহের খবর কিছু বলবেন?'

: বলবার কথা তো অনেক। দেহের একটা অংশ তো ধড়। অনেকটাই দেল্। আসল পড়া পড়তে হয় দেল্‌কেতাব থেকে। আর মানুষের এই শরীরের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো বিন্দু।

পথে নামলে যেমন পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, আমাদের মারফতী পথেও

* নফ্‌স্ কথাটির মূল অর্থ আত্মা।

তেমনই নানা মত এসে মেলে। সে সব জানতে বুঝতে হয়। তবে জ্ঞানের পথে বেশিদূর যায় না ফকিররা। তাদের পথ দেলের। দেলই আল্লার ঘর।

বেনোয়ারির কথায় একটা গভীরতর টান আছে। সে টান কেবলই ভেতরদিকে আরো টান দেয়। মনে হয় মানুষটির কাছে যেন আমার সব জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু তাই কি হয়? হ'তে পারে? আমার জিজ্ঞাসা তো অসীম নয়। কথার টানে যে কথাটুকু জাগছে, কথার আভা যে প্রশ্নকে আলোকিত করছে আমি শুধু সেটুকুই জানতে চাইতে পারি তাঁর কাছে। কিন্তু জ্ঞানী মানুষটার কাছে আমি একটানা মূর্খের মত প্রশ্ন করছি না তো? বেনোয়ারির উত্তরে রয়েছে গহন গভীরতা কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর মান নিতান্ত শিশুসুলভ হচ্ছে কি? ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করি এবারে, 'ফকির সাহেব, আমি নানা আনশান প্রশ্ন করছি না তো? আপনি হয়ত বিরক্ত হচ্ছেন'।

: মোটেই না। আরে আমার কারবার সব মূর্খ চাষাভুষোদেব নিয়ে। তাদের জ্ঞান খুব বেশি হ'লে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত, আপনি তো জ্ঞানের পথ সেরে এসেছেন। আর শুনেছি আপনি বেশ কিছু সাধু সন্ন্যেসী নাড়াচাড়া করেছেন। আপনার কথাতেও তা ধরা পড়ছে। আমরা ফুট দেখলেই বুঝি মিরগেলের ঝিম।

· শেষ কথাটার মানে বুঝলাম না।

: কথাটা বোঝা কঠিন নয়। তবে আপনার পথ আলাদা তো তাই বুঝলেন না। ব্যাপারটা হ'লো জলের খুব ভেতর দিকে থাকে মিরগেল মাছ। তাদের নিঃশ্বেস থেকে জলের ওপরে যে বুজগুরি বা ফুট ওঠে তাই দেখে জেলেরা বুঝে নেয় কোথায় মিরগেল আছে, সেইখানে জাল ফেলে। তেমনই আপনার কথাতেও আপনার নিশানা ধরা পড়ছে। আপনি কোথায় আছেন। কত ভেতরে।

এবারে সাহস পেয়ে আমি পুরানো ফেলে-আসা প্রসঙ্গটায় ফিরতে চাই। তাই ব'লে বসি, 'আপনি বলছিলেন ফকিরিতত্ত্বের মূল কথা বিন্দুধারণ। তো এই বিন্দু বা শুক্রের সূচনা কীভাবে, পরিণতিই বা কি?'

: তাহলে শুনুন। আমাদের মারফতী মতে বলে, দেহের ওপরে হলো চামড়া, চামড়ার মধ্যে রক্ত, রক্তের মধ্যে মাংস, ম্যাংসের মধ্যে মেদ, মেদের মধ্যে অস্থি, অস্থির মধ্যে মজ্জা আর সেই মজ্জার মধ্যে শুক্র। এখন বুঝুন শরীরের পঞ্চদশ বস্তুর মধ্যে শুক্রই প্রধান। সেই শুক্রের মধ্যে আছে প্রাণের বীজ। এবারে বুঝে নিন সেই প্রাণের মধ্যে আছে আত্মারাম, আত্মারামের মধ্যে পুষ্প, পুষ্পের মধ্যে কলি, কলির মধ্যে চিৎশক্তি, চিৎশক্তির মধ্যে মন, মনের মধ্যে ভাব, ভাবের মধ্যে রস, রসের মধ্যে প্রেম। আর সেই প্রেমের মধ্যে আছে সহজবস্তু। আমরা শেষপর্যন্ত সেই সহজবস্তুর সন্ধানী তাই প্রেম আমাদের অবলম্বন। এ সব কিছুর

মূলে শুক্র, তাই শুক্র রক্ষা করতে হবে। শুক্রহানি ঘটলেই তাই সহজের পথ টলে যাবে।

চমৎকার যুক্তির বুনোট। প্রায় মেনে নিতে সাধ যায়। বেনোয়ারির বলবার ক্ষমতা যেমন, তেমনি তারিফ করবার মত স্মৃতিশক্তি। হয়তো বিন্দুধারণ থেকে এসব ক্ষমতা আসে। কে জানে ? আপাতত তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির শস্ত্রে ধরাশায়ী হ'তে হ'তে আমি জিগ্যেস করলাম, 'শুক্রই যদি প্রধান উপাদান তো সেই শুক্রের উৎপত্তি কোথা থেকে ? সেও কি রক্ত মাংস মেদ মজ্জার মত মানুষের জন্মগত অর্জন ?'

: জন্মগতই যদি হবে তাহ'লে যৌবনের আগে বিন্দু আসে না কেন ? পরাজয় মেনে নিয়ে বলি, 'আপনিই বুঝিয়ে দিন'।

বেনোয়াবি হেসে বলেন, 'ভাববেন না আমি পয়গম্বর পীর। অনেকদিন ধ'রে বহু গুরু মুর্শেদের সঙ্গ তারপর অনেক কামেল ফকিবের বাহাছ শুনে তবে এ সব মনের মধ্যে গেঁথেছে। যাইহোক, এখন প্রশ্ন হলো, বিন্দুর উৎপত্তি যদি জন্মগত নয় তবে আসে কোথা থেকে ? এ প্রশ্নেব এককথার জবাব, পঞ্চভূত হ'তে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের প্রভাবে জন্মায় খাদ্যশস্য দানাপানি। সেই থেকে তৈরি হয় জীবাহার। মানুষ সেই আহার্য থেকে বস টানে। সেই বস চামড়া থেকে শেষপর্যন্ত বিন্দুতে তৈরি হয়। সেইজন্য বারো চৌদ্দ বছর লাগে মানুষের দেহে বিন্দু সৃজন হতে।'

মানি আর না মানি লোকধর্মেব এই এক সবল দিক। এরা আমাদের মত কথায় কথায় শাস্ত্র দেখায় না। এদের আছে এক নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ। কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৌলানা বা উলেমা সে জগৎ বানান নি। এঁরা নিজেরাই দিনে দিনে বানিয়েছেন। তাতে আছে জৈবনিক দৃঢ় কাঠামো। কাম আর স্খলন তাতে একভাবেই স্বীকৃত ও ধিক্কৃত। প্রেম মহিমময়। লোকধর্মের তত্ত্বে আবেগের চেয়ে লজিক বেশি তার কারণ এ-ধর্মে যারা আছে তাদের অনবরত যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজের মতামত পোক্ত করতে হয়। এ ধর্মে যাদের ছিনিয়ে আনা হয় তাদেরও বোঝাতে হয় যুক্তি তর্ক দিয়ে। গ্রামের লোক ভাষণে বড় একটা মজে না কিন্তু যুক্তিতে ভেজে। তাদের জীবন যে যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা। বীজ পুঁতলে শস্য হয়, বৃষ্টি পড়লে শস্য দানা ভাল ফলে, সার দিলে আবাদ ফলন পরিমাণে বাড়ে। আবার উলটো যুক্তিতে বীজ খারাপ থাকলে আর সব কিছু ভাল হলেও ফসল কেঁচে যাবে। সব কিছু ঠিকঠাক হলেও বন্যা বা খরা হলে সে বছর নির্ঘাৎ মরণ। সেই লজিকের জগৎ থেকেই বেনোয়ারিকে খোঁচা মারি, 'বিন্দুরক্ষা করতে গেলে তো দমের কাজ জানতে হয়। সবাই তো তা জানে না। গৃহীরা কি স্ত্রীসঙ্গ

করবে না তবে ?'

'কেন করবে না' বেনোয়ারি বোঝান, 'সন্তান চাইলেই সঙ্গম। তবে স্বসুখ বাসনার জন্যে কাম হ'লো পাপ। আমাদের একটা চলিত গ্রাম্য কথা আছে—

মাসে এক বছরে বারো
তার কমে যতটা পারো।

বুঝলেন ?'

: বুঝলাম। সেইজন্যেই কি আপনি বিয়েই করলেন না ? সকালে যে লাউ কুমড়োর বীজ রাখার কথা বললেন, সে তো নিতান্ত পরিহাস। আসল ব্যাপারটা কি ?

'আসল ব্যাপার জন্মদ্বারে ঘৃণা' নরম মানুষটি হঠাৎ কঠিন হয়ে গেলেন। টানটান হয়ে বললেন, 'স্ত্রীজাতিকে যদি মা ভাবি তবে কাউকেই কি কামনা করা যায় ? যেখান দিয়ে আমার জন্ম সে স্থান তো আমার বাবার। তাহ'লে সব নারীতেই তো রয়েছে আমার জন্মচিহ্ন। আমি কেমন ক'রে নিজের মাকে কামনা করি ? আমি কি পশু ?'

ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলো আমার মন। ঝিমঝিম করতে লাগলো সারাশরীর। কী জমাট নীরবতা। কী গুমোট। বেনোয়ারির মুখ ক্ষোভে ধিক্কারে জর্জরিত। দু'চোখে টলটল করছে জল। হঠাৎ গম্ভীর স্বরে হাঁকলেন, 'আবু বক্কর। সেই গানটা শোনাও এঁকে। বুঝেছো ?'

আবু বিনয়ে মাথা নেড়ে বসলো। ঘেরাটোপ খুলে দোতারা বাঁধলো। তারপর চোখ বুঁজে তীব্র তারসপ্তকের পঞ্চমে তার ক্ষুব্ধ কণ্ঠকে বাজিয়ে তুলে গাইল :

কেন ঝাঁপ দিলিরে মন
বাবার পুকুরে।
কামে কিন্তু পাগলপ্রায় তোরে ॥

এ সব গানের কি শক্তি। যেন ঝাপটের মত আমার কানে এবং সেখান থেকে সোজা মনকে বিদ্ধ করলো। কী স্পষ্টতা অথচ কতখানি ব্যঞ্জনা। গান তো নয়, যেন কামী মানুষের পরিতপ্ত আর্তনাদ। আবু বক্কর যত গাইছে তত কাঁদছে। জলিল, মানউল্লা সবাইয়ের চোখে জল। আবু বক্কর অনায়াসে পৌঁছে গেল অন্তরা থেকে আরেক অন্তরাতে :

কেনে রে মন এমন হলি ?
যাতে জন্ম তাইতে মলি ?
ও তোর ঘুরতে হবে লক্ষ গলি

হাতে পায়ে বেড়ি সার করে ॥

দীপের আলো দেখে যেমন
উড়ে প'লো পতঙ্গজন
অবশেষে হারায় জীবন
তাই করলি হা রে ॥

ততক্ষণে বেনোয়ারি অনেকটা আত্মস্থ হয়েছেন। তাই দেখে আমারও খানিকটা স্বস্তি হয়। পরিবেশের গুমোট কাটে। 'আহা', 'বেশ বেশ' এসব তারিফের ধ্বনি ওঠে ফকিরের গলা থেকে। ব্যাপার দেখে পাখিও এমনকি সাহস ক'রে উঁকি মারে ঘরের চৌকাঠ থেকে। আবারও ভাবি, এসব গানের কি শক্তি! মনের তাপও গানে গ'লে গ'লে প'ড়ে সবদিক শীতল ক'রে। আবু বক্কর এবারে গানের ভণিতায় এসে পড়ে :

সিরাজ শা দরবেশে তাই কয়
শক্তিরূপে ত্রিজগৎময়
কেন লালন ঘোরে বৃথাই
আপ্ততত্ত্ব না সেরে ॥

বেনোয়ারি আমার পাশে উঠে এসে বসেন। আমার হাঁটুতে হাত রেখে বলেন, মন হঠাৎ বড় চঞ্চল হয়ে গেল। শক্তিরূপে ত্রিজগৎময় সেই সহজবস্তু মনের মানুষ তো মনের মধ্যেই রয়েছে। তাইলে তাকে আর কেন নারীর মধ্যে আলাদা ক'রে খোঁজা? কেন বন্ধন? কেন মায়া?'

আবু বক্কর গান থামিয়ে আবক্ত চোখে নেহার করলো তার গুরুর দিকে। 'গান চলুক' নির্দেশ এল। হেসে সে আবার দোতারা বাঁধে। সেই সুযোগে মানউল্লা বলে ওঠে, 'বাবুকে হাতীর গানডা শোনাও দিকি বক্কর।' পাখি হাততালি দিয়ে সায় দেয়।

হাসিমুখে বক্কর গায় :

বাজারে হাতী দেখা হয়েছে।
চার কানায় দেখে এসে
আপন আপন বলতেছে ॥

বাইরে একটু কি হাল্‌কা হাওয়া উঠেছে দিনশেষে? ঘরে অন্তত মানুষগুলির মনে একটু ঝিরঝিরে বাতাসের ছোঁওয়া লাগে। ফকিরের চোখ নিমীলিত, মুখে হাসি। জলিল বলে, আমার কানে, 'বাবার দশা হয়েছে। মনের ব্যথা গলে গিয়েচে'।

আবু বক্কর গায় :

একজন বলে 'কই সবার কাছে
হাতী দেখা হয়েছে'—
নরম নরম সুপারির গাছ খাড়া রয়েছে।
তার উপর মোটা নিচে সরু
মাথা কুমড়োর মত ঝুলতেছে' ॥
আর একজন কয় 'তোমার কথা নয়
আমি ঠিক বলি তোমায়—
চারদিকে কাঁথা ঝোলে কুলোখানির প্রায়'।
যত অজ্ঞানেতে গল্প করে
তাতো সব দেখি মিছে ॥
আর একজন কয় 'শোনো বিবরণ
তোমরা যা বলো এখন,
একটি কথা নয়কো সাচ্চা বলো অকারণ।
হাতী পাকাঘরের থাম্বা যেমন
খাঁড়া হয়ে রয়েছে' ॥
গেল্লা ক'রে আরেকজনা কয়,
'বড় অসইলো তো হয়
দেখলাম হাতী আখ একগাছি
নিচে পাতা রয়'।
গোপাল কয় খেদেতে
চার কানাতে আচ্ছা মজা লাগিয়েছে ॥

গান শেষ হ'তে খুশিতে হাততালি দিলো পাখি। মানউল্লা বললো, 'পাখির মনে এখনও বালিকাভাব, তাই এতবড় ভাবের গানখানা শুনেও মজা পেয়েছে'।

'এ গানখানার মধ্যে খুব বড় ভাব আছে নাকি ?' আমার মুখ ফসকে কথাটা বার হয়ে গেল।

বেনোয়ারি বললেন, 'আল্লার চেহারা কেমন ? ভগবানের রূপ কেউ কি জানে ? একেক জন একেক রকম বর্ণনা ক'রে বলে তার আন্দাজী মতে, যেমন ঐ কানার হাতী দেখা। সাধনা অনুযায়ী স্তরে স্তরে তাঁর সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত ভগবান সম্পর্কে আর রূপের ধারণা থাকে না। একাত্ম হয়ে যেতে হয়। এটাই সুফীমত।'

: সুফীমতের ঐ স্তরগুলো বিষয়ে আর একটু বলবেন ?

ফকির বললেন, 'জলিল বল্ দেখি সুফীমতের তরিকা। দেখি কেমন শান আছে।'

জলিল বললো, বেল গাযেব একিন পেরথমে। তারপরে এল্মেল্ একিন। তাবপরে আয়নুল একিন। তারপব হাক্কুল একিন। ঐ যাঃ, বাবা শেষডা আর স্মরণ নেই যে!'

মানউল্লা বললো, 'তোর বড্ড বিস্মরণ হয়। শুনে নে। সবশেষে হ'লো হুয়াল একিন।'

জলিল লজ্জায় মাথা নিচু করে। বেনোয়াবি বলেন, 'সুফীমতে, নিজে না দেখে পরের মুখে শুনে আল্লার অস্তিত্ব বিশ্বাস করাকে বলে, 'বেলগায়েব একিন'। তারপরে জ্ঞানের দ্বারা আল্লাকে বিশ্বাস করাকে বলে 'এল্মেল্ একিন'। চোখে দেখে বিশ্বাস করাকে বলে 'আয়নুল একিন'। এর চেয়ে বড় স্তর আছে। সত্য জেনে পরিচয় ক'রে বিশ্বাস করাকে বলে 'হাক্কুল একিন'। আর সব শেষ স্তরে হ'লো 'হুয়াল একিন'। তার মানে আল্লাব সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এবারে বুঝলেন তো হাতীব গানের মূল্য। আল্লার সামনে আমরা সবাই কানা।'

শেষ জ্যৈষ্ঠেব সায়াহ্নে আমি জ্ঞানী মানুষটার দিকে শ্রদ্ধায় বিনতিতে নীরবনত হ'য়ে সেজদা জানাই। অন্তর্যামীর মত তা বুঝে মানুষটি বলেন, 'সেজদা দিন নিজের ভেতরের খদকে'।

পরদিন ভোর হতেই ফিবে আসি নিজের ডেরায় কিন্তু অচিরে আবার যাই মাঠপুকুর গ্রামে বেনোয়ারি ফকিরের কাছে। কেননা মাথায় ছিল বাউল ফকির নিগ্রহের প্রসঙ্গ। সে সম্বন্ধে তো কিছুই জানা হয়নি সেদিন। এবার তাই মাঠপুকুর পৌঁছে, চা-জলখাবার খেয়েই কথাটা তুলে বসি। কে জানে বেলা বাড়লে শিষ্যরা এসে পড়বে হয়ত। ফকিরি গান হবে। তারপর পাঁচতালে আসল কথাটা ভুলে যাব। সরাসরি বলি, 'মাঝে মাঝে খবর পাই নদীয়া-মুর্শিদাবাদে নাকি বাউলফকিরদের নিগ্রহ হয়। কি ধরনের নিগ্রহ? কেন হয়? কারা করে বলুন তো?'

: নিগ্রহ মানে প্রথমে শাসানি চোখ রাঙানি, তারপরে মারধোর, একতারা বাঁয়া ভেঙে দেওয়া। সবশেষে ঝুঁটি কেটে দাড়িগোঁফ জোর ক'রে কামিয়ে দেয়, এই আর কি। শেষেরটাই সবচেয়ে অপমান।

: কেন?

: বাউলদের ধর্মই হলো সর্বকেশরক্ষা।

: কিন্তু যারা এ অত্যাচার করে তারা কারা? সাধারণ মানুষ?

. আলেমরা এ কাজ করে। এলেম মানে জ্ঞান! যারা একাজ করে তাদেব

আমি বলি বেআলেম অর্থাৎ অজ্ঞানী। এ কাজ বহুদিন থেকে হচ্ছে। কয়েকশো বছর। শুনেছি লালন ফকির বা পাঞ্জুশাহ্ ফকিরের সময় কুষ্টিয়া যশোর রংপুরে বাউলদের ওপর ধ্বংসের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। বহু লোক মার খায়, পালায়, লুকিয়ে থাকে। এ তো নতুন কিছু নয়। আমি এসব প্রতিরোধের চেষ্টা করি। প্রতিবাদ জানাই সাধ্যমত।

বেনোয়ারির দিকে শ্রদ্ধার চোখে তাকাই। এঁদের কথা কোনদিন সভ্য সমাজ জানবে না। মনের মানুষ সন্ধান করতে এঁরা গভীর নির্জন পথ বেছে নেন বটে তবে মাঝে মাঝে সেই পথ ছেড়ে এঁদের বাধ্য হ'য়ে সন্তপ্ত অত্যাচারিত মানুষের পাশে এসেও দাঁড়াতে হয়। সেটাও মনুষ্যত্বের টানে। অনেকদিন আগে 'এক্ষণ' পত্রিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস কাঙাল হরিনাথের ডায়েরির কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছিলেন, একবার নাকি কুষ্টিয়ার ছেঁউরিযাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাঠিয়ালরা প্রজাদের ওপব অত্যাচার করছিল। তাই শুনে লালন ফকির তাঁর আশ্রম থেকে ভক্তদের নিয়ে লাঠিসোঁটাসহ বেরিয়ে এসে লেঠেলদের ফিরিয়ে দেন। সেই বিবরণ প'ড়ে লালন ফকিরের ওপব আমার শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেই রকম শ্রদ্ধা বেনোয়ারি ফকিরকে দেখে আমার মনে জাগলো। লোকধর্ম তাহ'লে অনেকটা নৈতিক শক্তি আনে মানুষের মনে। প্রতিবাদের প্রতিরোধের। হঠাৎ মনে হ'লো, লোকধর্মের জন্মই তো প্রতিবাদ থেকে। এ কথাও মনে হ'লো যে, আমার ধর্ম আমাকে কোন প্রতিবাদের শক্তি দেয়নি, প্রতিরোধের শস্ত্র দেয়নি।

আমি জিগ্যেস করলাম. নিগ্রহের ঘটনা কেন ঘটে বলুন তো?

: মূল কারণ ধর্মান্ধতা। বেশির ভাগ মানুষ অসহিষ্ণু অজ্ঞান মূর্খ। শাস্ত্র নিয়ে লড়াই করে কিন্তু শাস্ত্রই পড়েনি। আসল ব্যাপার হ'লো বাউলফকিরদের বেশির ভাগ আমাদের মুসলমান সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে গজিয়ে ওঠে। সেটা বেশ কিছু মোল্লা মৌলবীবা ভাল চোখে দেখে না। এই নিয়ে শুরু। আরো ব্যাপার আছে।

: আরও ব্যাপাব বলতে শরীয়তের সঙ্গে মারফতের লড়াই, তাই তো?

: খুব সংক্ষেপে তাই। আর একটা ব্যাপার হ'লো আমাদের এই গানবাজনা করা। সেটা নাকি হারাম, নিষিদ্ধ। সেবাব খুব মজা হযেছিল। চণ্ডীপুরের মোল্লার সঙ্গে আমার বাহাছ হচ্ছে ঐ গান গাওয়া নিয়ে। আশপাশের দশ পনেরোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছে। আমি আবু বক্করকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাকে বললাম, 'বক্কর, আমাদের মুসলমান ভাইদের দুদ্দুশা'র গানটা শোনাও তো'। সে গান ধরলো :

গান করিলে যদি অপরাধ হয়

কোরাণ মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়।
রাগ রাগিণী সুর
বাহিনী বলিয়া মশহুব
এত আলাপন আছে নিরাপন তাতে কেন হারাম নয় ॥
আরবী পাবসী সকল ভাষায়
গজল মরসিয়া সিদ্ধ হয
নবীজী যখন মদিনায় যায় 'দফ' বাজায়ে মদীনায় নেয় ॥
বেহেস্তের সুব নাজায়েজ নয়
দুনিয়ায় কেন হারাম হয়
দুদ্দু কয়, শুনি কোথায় গানের ফতোয়া কোথা পায় ॥

ব্যাস্। একগানে ফৌৎ। গানের সাব কথাটা হ'লো, স্বর্গে যদি গান অবৈধ না হয় তবে মর্ত্যে কেন গান হারাম হবে? অকাট্য গান। আর তার সঙ্গে বক্করের গলা। মৌলানার দল পালালো। হাজার হাজার লোক বলে 'গান চলুক চোপর রাত'। সে এক কাণ্ড বটে।

আমি বললাম, 'গান দিয়েই তো আপনাদের সব কথা বলা অভ্যাস। কিন্তু সব জায়গায় তো গান দিয়ে জেতা যায় না। তখন কি করেন?'

: বেশিব ভাগ বাহাছে কোবাণ শরীফ হাদিশ থেকে ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক হয়। যেমন ধরুন আমবা মারফতী ফকির, আমরা বিশ্বাস করি আল্লার চেহারা আছে তাঁকে দেখা যায। মুসলমান মৌলানারা সেকথা মানেন না। তাঁরা বলেন আল্লার রূপ নেই। আমি তখন বলি, 'হজরত মুহম্মদ মোস্তাফা বলেছেন—

ইন্নাকুম সাত্তারুনা রাব্বেকুম কামা
তারা উনা হাজল কামার*

এ কথার অর্থ—পূর্ণিমার চাঁদের মত আল্লাহ্কে স্পষ্ট দেখা যাবে। তাহলে? তবে এখানে কথা আছে।

: কি রকম?

: এই যে বলা হয়েছে আল্লাহ্কে পূর্ণিমার চাঁদের মত স্পষ্ট দেখা যাবে, তা কি সবাই দেখতে পাবে? না। এ দেখতে গেলে আমাদের মারফতী পথ নিতে হবে। এ পথ অজানা, তাই একজন পথপ্রদর্শক চাই। তিনিই পীর মুর্শিদ। একজন জান্‌নেওয়ালা (জ্ঞানী) কামেল পীরের কাছে বায়েত (শিষ্য) হয়ে তাঁর কাছে গোলামী খৎ লিখে তাঁর মন জয় করতে পারলে তবে সেই পথ দেখা যাবে।

* এ কথার শাস্ত্রীয় অর্থ নিশ্চয় তোমাদের দোষগোপনকারী প্রভুকে দেখতে পাবে (কেয়ামতের দিন) যেমন এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। [লেখক]

আমি যেন একটা নতুন জগতে ঢুকে পড়েছি। এ জগতের বিষয় যেমন ধূসর ভাষাও তেমনই ধূপছায়া। তবে শেষপর্যন্ত ভাবটা বোঝা যায়। তবু একটু খটকা থাকে। যেমন মুর্শিদ কি শুধুই পথপ্রদর্শক ? তিনিই তো অনেকসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। যেমন লালনফকির একটা গানে বলেন—

যেমন মুর্শিদ তেমন খোদা
মনে কেউ করোনা দ্বিধা।

তবে ? মুর্শিদকে দেওয়া এতখানি বড় আসন ? হতেই তো পারে গোলমাল। ঔদার্য তো সার্বজনীন হ'তে পারে না। কিন্তু বেনোয়ারি ফকিরকে সে তর্কে না নিয়ে গিয়ে একটা সামাজিক প্রশ্নে টেনে আনলাম এই ব'লে যে, 'এই যে আপনি বা জলিল বা মানউল্লা মাঠপুকুর গ্রামে ব'সে মারফতী সাধনা করছেন তাতে গ্রামসমাজে গোলমাল হয় না ? একদিনও মসজিদে যান না তাই নিয়ে ঝঞ্ঝাট হয় না ?'

বেনোয়ারি হাসেন। বলেন, 'আপনি একেবারে মোক্ষম জায়গাটা ধরেছেন। হয়, মাঝে মাঝে মন কষাকষি হয়। তবে আমরা তো কাউকে যেচে আনছি না আমাদের পথে। তাছাড়া বাহ্য আচরণে সবাইকে বলি 'নামাজ পড়ো' 'মসজিদে যাও'। আসলে আমরা নিজেদের মত গ্রামের একটি টেরে পড়ে আছি। কাউকে ঝামেলায় ফেলি না। গান বাজনা কবি। দল বেঁধে সবাই শুনতেও আসে।'

: কিন্তু বিয়ে থা ? সমাজ ?

: অসুবিধে নেই। আমাদের ঘরে অনেক মুসলমানই মেয়ে দিতে চায়। গরজ করেই দেয়। কেন বলুন তো ?

: কেন ?

: তালাকের ভয় নেই। ফকিরদের সন্তান হয় শান্তিপ্রিয়। তালাক তো ধর্মীয় অত্যাচার। আমরা ঘৃণা করি তালাক প্রথাকে। আমরা মানুষ ভজি। তাহ'লে মানুষের অপমান কেমন ক'রে করি ?

: আর আপনাদের ঘরের মেয়েদেব মুসলমান সমাজ বউ করতে চায় ?

: যেচে নেয়। দেখেন নি আমার পাখিকে ? ওর কি বিয়ের বয়স হয়েছে ? জোর ক'রে সেঙ্গে নিয়ে গেল আমার এক শিষ্যের জ্যাঠা। সে অথচ খানদানী মুসলমান, পঞ্জবেনা মেনে চলে রীতিমত।

'পঞ্জবেনা আবার কি ?' আমি বলি। 'পাঁচ ছশো বছর মুসলমানদের পাশাপাশি বাস করেও তাদের অনেক কিছুই জানলাম না, শিখলাম না। এমনকি জানতে চাইলামও না। এর কারণ কি ?'

: আপনাদের নাক সিঁটকানো আর আমাদের রক্ষণশীলতা দুটোই দায়ী। যাইহোক, পঞ্জবেনা সম্প ` জানতে চাইছিলেন। পঞ্জবেনা হলো শরীযতী মতে খাঁটি মুসলমানের জীবনে পাঁচটি অবশ্যকৃত্য। একেই বলে আরকানে ইসলাম।

: কি কি ?

: কল্‌মা, রোজা, হজ, যাকাত আর নামাজ। এব নানান খুঁটিনাটিও আছে অবশ্য।

: যেমন ?

: যেমন মূলে নামাজ দু রকম। জাহেরা নামাজ আর বাতুনে নামাজ। বাতুনে নামাজেব কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। সর্বদাই সে নামাজ চলে, শয়নে স্বপনে সর্বত্র। আব জাহেরা নামাজ পডতে হয় পাঁচবার বা পাঁচরোক্ত। পাঁচবারেব নাম আব সময় আলাদা আলাদা। শুনবেন ?

. বলুন। কিছুই তো জানি না। শুধু খানিকটা বাজে লেখাপড়া শিখেছি। এখুনি আপনাকে ব'লে দিতে পারি আমেবিকাব প্রেসিডেণ্টের কতখানি সাংবিধানিক ক্ষমতা, মারাদোনার হাঁড়ির খবর কিংবা বিশ্বব্যাংকের কাছে ভারতের ঋণ কত। অথচ....

'বেশ বলেছেন' ফকির বলেন।

'যে কথা জানতে চাইছিলেন। খুব ভোর বেলা যে-নামাজ তাকে বলে "ফজর"। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ যে-নামাজ তার নাম "জোহর"। "আসর" হলো বেলা তিনটে চারটে নাগাদ যে-নামাজ। সন্ধ্যেবেলার নামাজকে বলে "মগরেব"। আব রাতের নামাজ "এয়েসা"। কি মনে থাকবে ? লিখে নিন। আর সেইসঙ্গে এই কথাটা মানে লালনের এই কথাটাও লিখে নিন যে—

পাঁচরোক্ত নামাজ পড়ে
শরা ধ'রে কে পায় তারে ?'

: তারমানে আপনি বলতে চান নামাজ বাজে ? তার কোন মূল্য নেই ?

'তা বলি না' বেনোযারি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝান, 'আমরা বলতে চাই লোকদেখানো নামাজ দিয়ে কি হবে ? মসজিদে গেলেই কি ধর্ম ? আসল নামাজ তো মনে। তার চেয়েও বড় কথা হ'লো কার নামাজ ? তাঁকে কি জানি ? অন্যায় পাপ চুরি ক'রে তারপরে নামাজ পড়া চলে কি ? আল্লা বলছেন, আমি তোমাতে আছি তুমি কই আমাকে দেখছো না ? অফি আন ফোসেকুম আফালা

তোফসেরান।'

'বুঝলাম যে আপনাদের ধর্মসাধনা অনেকটা সহজিয়াদের "বর্তমান" সাধনার মত' আমি বেনোয়ারিকে বোঝাতে চাইলাম। 'ওরাও বলে অনুমানে ধর্ম হয় না। কোথাকার কৃষ্ণ রাধা মথুরা বৃন্দাবন—চোখেই দেখি নি কোনদিন। তার চেয়ে অনেক চাক্ষুস হ'লো মানুষ, তাকে ধরো। তারমধ্যেই খুঁজে নাও মথুরা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণ। আপনাদেরও তেমনই মনে হচ্ছে।'

: হ্যাঁ অনেকটা তাই। তবে শরীয়তের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে তফাৎ এইখানে যে ওটা আচরণগত আর আমাদের উপলব্ধি। ওদের বাহ্যধর্ম আমাদের অন্তরধর্ম। জলিলকে দেখেছেন তো ? সাধারণ মূর্খ কিষাণ, অবসরে ঘরামির কাজ করে। ও যখন কুড়ি বছর আগে আমার কাছে দীক্ষা শিক্ষা নেয় তখন জিগ্যেস করলাম, 'শরীয়তী ধর্মে মন ভরলো না তোমার ?' ও বললো 'গুরু, ঐ আন্দাজী ধর্মে আমার মন ভরলো না, আমি মানুষ ধ'রে সাধন করতে চাই'। তখন দীক্ষা দিলাম।

: তবে কি শরীয়ৎ ভুল ?

: কে বললো ভুল ? শরীয়ৎ কায়েম না হ'লে কি মারফৎ হয় ? লালন ফকির একবার বাহাছে কি বলেছিলেন জানেন ? বলেছিলেন—

শরীয়ৎ ঘরের সিঁড়ি
ঘর মারফৎ।
চড়িয়া সিঁড়ির পরে
খাড়া থাকি যদি
না হেঁটে কেমনে ঘরে যাই ব[illegible] দেখি ?
শরীয়ৎ হইলে হাসিল মারফতে যাবো।

কি বুঝলেন ? আমরা কি শরীয়ৎ বিরোধী ?

: 'না। বুঝলাম মারফৎ হলো শরীয়ৎকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, পেরিয়ে যাবার ধর্ম। শরীয়ৎ না হ'লে মারফৎ হয় না। কিন্তু মারফত হ'লে আর শরীয়তে ফেরা যায় না। ঠিক বুঝেছি কি ?

: একদম স্পষ্ট বুঝেছেন। শরীয়ৎ আর মারফৎ যেন দুধ আর মাখন। দুটোই মিলেমিশে আছে। কিন্তু মাখন বার ক'রে নিলে ঘোল পড়ে থাকে। তাতে আর কাজ কি ? সেইজন্যেই বলা হয়েছে—

মারফতের পথিক যারা
শরার কেতাব নেয় না তারা।

তাহলে আমাদের হজ রোজা যাকাত নামাজ কি হবে আর ? আমরা অনেক

ভেতরে চলে গেছি। আর তো লোক দেখানো কাজ করতে পারি না। তাই আমরা দেল-কেতাব পড়ি। খুঁজি সেই মনের মানুষ। যাকে পেলে আর কিছু চাইতে হয় না। থাকে শুধু হকিকৎ অর্থাৎ হকের পথে চলা। আর তরিকৎ অর্থাৎ বিচার। কিসের বিচার ? না আমি কি করেছি, আমি কি করছি। তাকেই বলে দরবেশ যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

ক্ষণিকের বিবতি ঘটলো। কেননা জলিল এসেছে আমাদের নিতে। আজ তার বাড়িতে আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া।

জলিলের বাড়ি নিতান্ত গরীবগুরবোর কুঁড়ে। তবে সেবাধর্মের আন্তরিকতার ত্রুটি নেই। এই বসাচ্ছে, এই পাখার বাতাস করছে, এই ঠাণ্ডা জল তালশাঁস দিচ্ছে, সঙ্গে গুড়।

বেনোয়ারি বলেন, 'গবীবদের বাহ্য চমকটা নেই তো, তাই ভগবান ওখানে আটকে থাকেন। আর ধনীর ঘবে নানা জেল্লা কাবদানী আর কেবামতী। তার ফাঁক দিযে ভগবান কেটে পড়েন। এ নিয়ে কত বাহাছ হয় আমার সঙ্গে আলেমদের। যেমন ধরুন এই হজ। হজ কি গরীবদের সাধ্য ? সেইজন্যে আমাদের একটা গানে বলে—

এখানে না দিদার (দর্শন) হ'লে
সেখানে পাবে না গেলে।
হজ করিতে মন তুই যাবি কোন্ কাবায় ?
হজের ঠিকানা না জেনে
দৌড়াদৌড়ি যাস্ কোথায় ?

হজ মানে কি জানেন ? মনকে বাইরে থেকে টেনে এনে অন্দরে বসানো। জলিল, তুমি বাবুকে সেই প্রকৃত হজের গল্পটা বলো তো'।

জলিল বললো, 'একজন অবিবাহিত সৎ ধর্মভীরু মুসলমান ঠিক করলো তার গ্রামেব ক'জনের সঙ্গে হজ করতে যাবে মক্কায়। যেতে তো অনেক টাকা লাগে। তা আল্লার কৃপায় সে টাকা জোগাড় হলো। যাবার আগে ভাবলো শহরে গিয়ে প্রাণেব দোস্তকে একবার দেখে আসি। কী জানি হজ ক'রে ফিরতে পারবো কিনা। পৃথিবীতে তার মায়ার টান বলতে ছিল সেই বন্ধুর ওপর। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখে বন্ধু ক'মাস আগে মারা গেছে। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বন্ধুর বউ অভাবে প'ড়ে নাকানি চুবানি খাচ্ছে। টাকা পয়সার অভাবে হাঁড়ি চড়ে না এমন অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ বাড়ির রসুইখানা থেকে মাংস-রান্নার গন্ধ লাগলো তার নাকে। সে ভাবলো, তবে কি বন্ধুর অভাবের কথা বানিয়ে বললো ? অভাবী মানুষ মাংস রাঁধে কি ক'রে ? খোঁজ করতে বন্ধুব বউ বল্ললো কাঁদতে কাঁদতে,

তিনদিন ধ'রে ছেলেমেয়েদের কিছু খেতে দিতে না পেরে আজ গো-ভাগাড় থেকে মরা গরুর রাং এনে পাক করছে। সেকি ? আমার বন্ধুর বউ মরা গরু রেঁধে খাচ্ছে গো-ভাগাব থেকে এনে ? আর আমি যাবো অনেকটাকা খরচ ক'রে মক্কা ? ছিঃ। মাথায় থাক আমার হজ। বাঁচলে কত হজ হবে ! এই ভেবে তার সব টাকা তাদের দিযে গ্রামে ফিরে হজ যাত্রীদের বললো এবারে তার কোন কারণে হজ হলো না। ইনসাল্লা আসছে বছর যাবে।

'এদিকে তার গ্রামের সেই মানুষগুলো তো হজে গেল। সেখানে গিয়ে সব জায়গাতেই সেই মানুষটাকে দ্যাখে আর ভাবে, কেমন হলো ? সে যে আসবে না বললো ? তবে কি অন্য দলেব সঙ্গে এলো ? ফিরে এসে খবর নিয়ে জানলো লোকটা সত্যি সত্যিই হজে যায়নি। তারা তখন তার কাছে গিয়ে বললো, ভাই তোমারই সত্যিকারের হজ হয়েছে, আমাদের হয়নি।'

বেনোয়ারি বললেন, 'এই হ'লো হজের সত্যিকারের মর্ম। আন্তরিকভাবে খোদার কাজ করলে তবে হজ হাসিল হয়। ঐ যে গরীবের পাশে দাঁড়ানো ঐ যে মানুষের দুঃখ ঘোচানো, যে তা ক'রে সেই ন্যায্য হাজী। এই গোলমালটা আমাদের যাকাত নিযেও হয়। যাকাত মানে দান। কিন্তু বেশির ভাগ মুসলমান যাকাতে জাঁক করে বেশি। আরে, আল্লা তোমাকে দিয়েছেন তাই তো তুমি দিচ্ছো। তাহ'লে তোমার অত জাঁক কিসেব ? নিজেকে দাও তাঁব সেবায়।'

আমি বললাম, 'কট্টর ইসলামী নীতিনির্দেশ আব আপনাদের মাবফতী চিন্তা দুয়ের মূলে কোন বিরোধ নেই যা বুঝলাম। বিরোধ শুধু ব্যাখ্যায আব আচরণে, তাই নয় ?'

: ঠিক তাই। তবে আমাদের চোখে আগে মানুষ আর তার মনের ময়লা মোচানো। এই যাকাতের ব্যাখাই ধরুন। যাকাত* দুবকম—'বাতুনী' আব 'জাহেরী'। বাতুন মানে গোপন। নিজের প্রিয়বস্তু আল্লার রাহে যাকাত দিতে হবে। নিজের প্রিয়বস্তু কি বলুন তো ?

: তার কি কিছু ঠিক আছে ? এক এক জনের এক এক রকম। যেমন ধরুন আমাদেব হিন্দুদের একটা সংস্কার আছে যে কাশী পুরী হরিদ্বার পুষ্কর এসব তীর্থে গেলে নিজের কোন লোভের জিনিস গঙ্গা বা সমুদ্রে ফেলে আসতে হয়। কেউ ফেললো আম, কেউ ফেললো কলা। সারাজীবন আর সে জিনিস খাবে না। অবশ্য এ নিয়ে মজার কথাও শুনেছি। যেমন একজন তেঁতুল বা আমড়ার টক সহ্য করতে পারতো না। সে কাশীর গঙ্গায় তেঁতুল আর আমড়া ফেলে এসে

* যাকাত বলতে বোঝায় আত্মাব পবিত্রতা সাধন কবা, ধুযে মুছে সাফ কববাব ক্রিযা।

বললে, 'বাবা বাঁচলাম'। আমাদের হিন্দুধর্মে এই এক সমস্যা। তাতে গাম্ভীর্য কম। ধর্ম নিয়েও আমাদের মজা করা স্বভাব। আসলে এগুলো তো ধর্মপালন নয়, কতকগুলো আচার পালন। আমাদের কোন আচার জোর ক'রে চাপালেই তা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হবেই। সেইজন্যে আমাদের সব বাড়ির অন্দরে সর্বদা খটাখটি। মেয়েরা বলে এইটা করতে হয়, আমরা বলি তাহলে করবো না। কিন্তু আপনার জবাবটা বোধহয় ঠিক দিতে পারিনি। সত্যি সত্যি আমাদেব প্রিয়বস্তু কি বলুন তো ?

: আমাদেব স্বসুখ বাসনা। যাকে বলে আত্মসুখ। বিচার ক'রে দেখবেন আমরা যাই কবি তার মূলে আত্মসুখ। একজন ভিখিরিকে যদি একটা পয়সাও দিই তাতেও আত্মসুখ থাকে। লোভ, ভোগ, কাম, ঐশ্বর্য এসব তো স্বসুখ বাসনা বটেই, এমনকি ত্যাগও একটা সুখ। স্বসুখ ত্যাগ খুব কঠিন। সেইজন্যে বলেছে—

থাকিলে স্বসুখ বাসনা
রাগেব উদ্দীপন হবে না।

আবার বলছি সববকম স্বসুখ বর্জন করা খুব কঠিন। কেননা কেউ কেউ কষ্টভোগ ক'রেও সুখ পায়। এমনকি বৈবাগ্যেও আত্মসুখ থাকতে পাবে। অর্থাৎ দ্যাখো, আমি কেমন সব ত্যাগ করেছি। এ নিয়ে একটা গল্প আছে খুব চমৎকাব। শুনবেন ?

. সব কিছু শুনবো বলেই তো আসা।

মৌজ ক'বে বেনোযাবি বললেন, 'তাহ'লে শুনুন। জলিলও শোন্। এ কিস্যা তোকে আগে বলিনি। একবাব হজবত মোহম্মদ ধ্যানে বসেছেন। বহুক্ষণ ধ্যানেব শেষে আল্লাতালা তাঁকে তিনটে বস্তু দিলেন—জহর, মধু আব আতর। জহর মানে বিষ, সাংঘাতিক বিষ। তো তিনি শিষ্যদের বললেন, 'এই নাও আল্লাতালা তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন মধু আর আতর। খাও মধু প্রাণ ভ'বে, আব আতরেব খোশবু তোমাদের জীবন মাত করে দিক'। কিন্তু তিনি নিজেব জন্যে রাখলেন জহব। সেইটাই তো ঠিক। কিন্তু তাতেও সমস্যা।'

জলিল বললো, 'সমস্যা কিসের ? হজরত মোহাম্মদ তো ঠিকই করেছেন। নিজেব জন্যে খারাপটা রেখে ভালটা দান করেছেন'।

· আরে ব্যাপাবটা আমি আগে বুঝিনি। আমি যৌবনে যখন মোহম্মদ শাহর কাছে সুফীমতে কল্‌মা সাবেদ (দীক্ষা) নিই তখন এই গল্পটা একদিন ওঠে। গল্পের শেষে মোহম্মদ শাহ বললেন, হজরত মোহম্মদ ঐ যে জহরটা নিজে নিলেন, তাতে পরে শিষ্যরা বলেছিল, তিনি নিজে কষ্টটা নিলেন আর আমাদের

দিলেন আনন্দ। সেটা কি ঠিক হলো ? কষ্ট করতে যে আমাদেরও ইচ্ছে হয়। হজরত আমাদের কষ্ট পাওয়া থেকে বঞ্চিত করলেন। কষ্ট না করলে কি আল্লাতালাকে কোনদিন পাওয়া যায় ? এ ব্যাখ্যা মহম্মদ শাহ-র কাছে শুনে আমি তো অবাক। সেই থেকে বুঝলাম কাকে বলে আত্মসুখ। নিজে কষ্ট পাওয়াও একটা বড সুখ। আল্লাব এ কি তাজ্জব বন্দোবস্ত।

আমি বললাম, 'চমৎকার এই কাহিনী। আত্মসুখের সংজ্ঞাটাও বেশ নতুন। তাহলে বোঝা গেল বাতুনী যাকাতের মানে হ'লো নিজের প্রিয়বস্তু দান করা। কিন্তু জাহেবী যাকাত মানে কি ?

: জাহেরী মানে আমরা বলি চল্লিশভাগের একভাগ দান। দেখবেন জুম্মার নামাজেব পর মসজিদেব বাইরে সার-দিয়ে-বসে-থাকা গরীব দুঃখী অনাথ আতুরকে ভক্ত মুসলমানরা দান খয়রাত করছে। সে তো খুব ভাল কাজ। কিন্তু শুধু দান করলেই হবে না। আসলে জাহেরী যাকাতের একটা অন্য মানে আছে। আমরা বলি, আল্লা আমাদের দেহভাণ্ডারে চল্লিশগঞ্জ মালসহ আমাদের পয়দা করেছেন। মুর্শিদ ধ'রে, মুবিদ ধ'রে, নিজের খাস মহব্বতের যে মাল আমাদের শরীরে আছে তার চল্লিশভাগের একভাগ আল্লার রাহে যাকাত দাও।

আমি বেনোয়ারি ফকিরের কথা শুনে বুঝলাম ধর্মের ব্যাখ্যায় একটা সমান্তরাল চিন্তা লোকধর্ম সর্বদাই ক'রে চলে। শাস্ত্র আপ্তবাক্য পুরোহিতের নির্দেশেব বাইরে একটা ব্রাত্য কিন্তু বলিষ্ঠ জীবনভাবনা লোকধর্মের মর্মমূলে প্রাণসঞ্চার করে। আন্দাজী কথাবার্তার অন্তঃসারশূন্যতা তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সঠিক পথটা ধরতে চায়। এ পথে বহুমানুষকে আকৃষ্ট করা যায় না। কিন্তু যে ক'জন এতে আসে তারা বুঝে শুনে যাচাই ক'রে আসে। আর তারা টলে না। 'আপনাকে আপনি ভুলে পশ্চিম তরফ খাড়া হ'লে'-ই যে নামাজ হয় না দুদ্দু শাহর এই কথা গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। 'না দেখে রূপ করে সেজদা, অন্ধ তারে কয়' দুদ্দুর এই কথাটা প্রকাশ্যে বললে লাঠি পড়বে মাথায়। বেনোয়ারিদের গহন পথ তাই কয়েক শতাব্দী ধ'রে হৃদয়বান মানুষের বোধ আর মুক্তবুদ্ধির দ্বারে মিশতে চায়। প্রতিহত হয় বারে বারে। অপমান নামে। আঘাত আসে। ক্লান্ত তবু ক্লান্তিহীন সেই মানবিক যাত্রা। সত্যিই এ পথ বড় নির্জন। আজকের এই মাঠপুকুর গ্রামের দুপুরের মত। সমস্ত গ্রামটা যেন ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কেবল একটা দুটো ঘু ঘু ডাকছে।

বিশ্রাম আধোনিদ্রা অনুচিন্তা আর টুকরো ভাবনায় কেটে গেল একটা পুরো দিন। পাশের ঘরে বেনোয়ারি তাঁর বিশ্রামের শেষে আমার দাওয়ায় এসে বসলেন। প্রশান্ত ধ্যানমৌন আনন। চোখ দুটির দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী। বোঝা যায়

কি একটা অন্তঃশীল মনের ক্রিয়া চলছে। ফকিরিতত্ত্বের খুব গূঢ় অন্তঃপুরে নাকি সুফীচিন্তাধারা মিশে আছে। সাতগেছিয়ার জাহান ফকির আমাকে একবার বলেছিল, 'যে আল্লাহ্ আমাদের সৃজন পালন ধ্বংস করেন তার তত্ত্ব বা সত্য অনুসন্ধানই সুফীদের প্রধান কাজ'। এই মুহূর্তে বেনোয়ারি কি সেই চিন্তায় অন্তর্মগ্ন ? নইলে দৃষ্টি কেন এত সুদূর ?

আমি জলিলকে ফিসফিস ক'রে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার গুরু যেন এ জগতেই নেই। কিসের ধ্যান করছেন ?'

জলিল খুব নীচুস্বরে আমাকে বললো, 'বাবা রোজায় রয়েছেন তো। এটা যে রমজান মাস'।

চমকে গেলাম একেবারে। এত সব কথাবার্তা, শরীয়ৎ নিয়ে বাহাছ আর শেষকালে রোজা ? তাছাড়া এ কেমন রোজা ? এই তো দুপুরে আমার সঙ্গে ভাত খেলেন দিব্যি। তাহ'লে ? মনটা খুব সংশয়ী হয়ে ওঠে। খানিক পরে বিরাট এক রেচক বায়ু ত্যাগ ক'রে জিকির দিয়ে বেনোয়ারি জপ শেষ ক'রে আমার দিকে সপ্রশ্ন তাকালেন। অর্থাৎ ভাবটা যেন, আপনার কি কোন বিশেষ জিজ্ঞাসা আছে ? জিজ্ঞাসা তো আছেই তবে আপাতত কাদেরিয়া ফকিরদের দমের প্রক্রিয়া দেখে কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা কাটিয়ে উঠে একটু পরে বললাম, 'আপনি রোজায় বিশ্বাসী ?'

প্রসন্ন হেসে বেনোয়ারি বললেন, 'কলমা-রোজা-হজ-যাকাত-নামাজ সবেতেই আমার বিশ্বাস কিন্তু তার আচরণ আলাদা। আমাদের কাজ ভেতরে ভেতরে। আমাদের অন্দরের মণিকোঠায় আল্লার বারামখানা। সেখানে যাওয়াই আমার হজ, সেখানে আমার বিশ্বাসই কলমা, সেখানে আমার সর্বদা চলছে বাতেনী নামাজ সেখানে আমার নফ্স্কে যাকাত দিয়েছি, সেখানে আমার রোজার ছিয়াম।'

: ছিয়াম মানে কি উপবাস ?

: উপবাসের সঙ্গে সংযম। নফ্সকে শাসনে রাখাই রোজা। দিনে উপোস রাতে খাওয়া ওতো বাদুড়ের ধর্ম। মুখে রোজা রেখে অন্তরে কাম সেটা রোজা নয়। কিছু খেলাম না অথচ একজনকে চড় মারলাম তাতে হাতের রোজা নষ্ট। সারাদিন উপোস দিলাম অথচ মনে রইলো হিংসা অসূয়া দ্বেষ তাহ'লে মনের রোজা নষ্ট। রোজা মানে আমরা বলি আত্মশাসন।

স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটির দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। যেন চেতনার প্রজ্ঞার কোন জটিল উৎস থেকে উঠে আসছে কথাগুলো। যেন আল্লার সেই আর্তি ফকিরের মুখে, যার ভাষ্য হ'লো, 'আমি তোমাতে আছি, তুমি কই আমাকে তো দেখছো

না ?' মানুষটা আমারই পাশে ব'সে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরে। কী আশ্চর্য, এই কি সেই পাখিপোষা মায়ালী মানুষটা ? ধ্যানের অন্তর্নিবিষ্টতার এতটা শক্তি ? একেই বোধহয় বলে সিদ্ধাবস্থা। জলিল কানে কানে খুব গাঢ় স্বরে বললো, 'বাবু, এনার শরীয়ৎ হাসিল হয়ে গেছে। উনি এখন মারফতের পাকা রাস্তার সোজা ডহরে উঠে পড়েছেন। ওঁকে সেজদা দিন।'

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াই। অভিবাদন করি।

সূর্য পাটে বসেছে। বাগ রক্তিম মাঠপুকুর গ্রাম থেকে এবার বিদায়লগ্ন। শেষবারেব মত বেনোয়ারি ফকিরকে বিনতি জানিয়ে বলি, 'চলে যাচ্ছি এবার। আবার কবে আসবো জানি না। শেষ কথাটা বলুন আপনার। কি পেলেন ? কি বুঝলেন ? মনের মধ্যে কোন্ কথাটা ভ'রে নিয়ে বাড়ি ফিরবো ?'

যেন ফেরেশ্‌তার মত মহামহিমাময় উঠে দাঁড়িয়ে বেনোয়ারি বললেন, 'তাঁকে জানা যায় না এইটে জানাই চরম জানা। চিরপবিত্র আল্লাহ্ তাঁর কাছে পৌঁছোবার রাস্তাটাই তাঁর তৈরি মানুষের সামনে খোলা বাখেননি। একটা রাস্তাই খোলা আছে শুধু—সেটা হচ্ছে তাঁকে জানা যায় না এই কথাটা জানার পথ'।

অনেকটা রাস্তা গিয়ে, প্রায় মাঠপুকুর গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে, একবার ফিরে তাকালাম জলিলের বাড়ির দিকে। দিগন্তবিসারী ধানক্ষেত পেরিয়ে একটা কুঁড়েঘর। তার সামনে দুটো মানুষের স্পষ্ট সিল্যুয়েট।

‘পৃথক, আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী’

যারা দেহাত্মবাদী সহজিয়া তাদের সাধনার স্থূল কথা হলো মানুষভজন। তারা কথায় কথায় বলে ‘মানুষ ধরা’। প্রশ্ন হলো কোন্ মানুষকে ধরা যায়, কেই বা যথার্থ মানুষ ? তারা রহস্য করে বলে মানুষের আবার বাছাবাছি কি ? সব মানুষই সমান। কার মধ্যে যে কখন কি পাওয়া যাবে তা নাকি আগে থেকে বলা যায় না। কথাটার একটা লৌকিক উপমা দিয়েছিল, জেহান বলে এক দরবেশ। পরনে তার এক বর্ণরঙিন আলখাল্লা, মাথায় এক অদ্ভুত টুপি। গলায় একগাছা পাথর আর কী সবের তসবি-মালা। হাতে খেলকা, করোয়া কিস্তি আর চিম্‌টে। চোখ-দুটি নিমীলিত করে সে ধ্যানস্থ ছিল কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়ার লালন ফকিরের মাজারে। সন্ধে হয়ে আসছে তখন। মাজার শরীফের বড় বড় থাম আর গম্বুজ-ঘেরা সৌধ ভেদ করে শেষ সূর্যের একটা দ্যুতিহীন আলো সমস্ত এবাদতখানায় এক আধোছায়ার ম্লানতা এনেছিল। আলো কমে এলে যেমন রঙিন পাখির রঙ মরে আসে তেমনই জেহান দরবেশের আলখাল্লা আর তসবি-মালার বহুবর্ণদ্যুতি এক মলিন সিল্যুয়েটে জেল্লা হারাচ্ছিল ক্রমশ। ধীরে নেমে আসছিল শীত সন্ধ্যার কালিমা। সেই সময় জেহান দরবেশ তার আশ্চর্য লৌকিক চিন্তার মৌলিক উদ্ভাবন থেকে বলেছিল, ‘সুতোর ফুঁপি দেখেছেন তো ? সেই রকম সব জিনিসের ফুঁপি থাকে। কোনো জিনিস ফুরোয় না। টান দিলেই পরেরটুকু এসে যায়। তেমনই মানুষ। কার টানে যে কোন্ মানুষের খবর আসে কে বলতে পারে ?’

ভাবলে এখন অবাক লাগে যে দরবেশের কথার প্রমাণ মিলল কত দিন পরে গাইঘাটা থানার মোড়লডাঙার পৌষসংক্রান্তির মেলায়। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে বেশ চন্‌মনে খিদে পেয়েছে। দেখি একটা বিরাট মিষ্টির দোকানে গরম গরম ঢাকাই পরোটা আর অমৃতি জিলিপি ভাজা হচ্ছে। টেম্পোরারি দোকান। নড়বড়ে হাইবেঞ্চ আর কাঠের চেয়ার। টিনের গেলাসে জল আর পদ্মপাতায় করে খাবার দেওয়ার চল। আমার নাক-বরাবর বিরাট উনুনের সামনে বসে মোটা মার্কিনের ন্যাকড়া টিপে টিপে অদ্ভুত শিল্প গড়ছিল অমৃতি জিলিপির কারিগর। মাঝবয়সী মানুষ, গালে পাঁচ-ছ দিনের নাকাটা পাকা দাড়ির

কদমফুল। মানুষটা যে রকম একাগ্র নিষ্ঠায় জিলিপির প্যাঁচ বানাচ্ছিল তাই দেখেই কথা বলতে ইচ্ছে হলো। ব্যস, বেরিয়ে পড়ল ফুঁপি। হরিণঘাটার নগর উখরা গ্রামে থাকে এই মন্মথ অধিকাবী। ভেকধারী বোস্টম। বাড়িতে পরিবাব বলতে বিধবা এক বোন আর তিন ছেলেমেয়ে। 'বিয়ে-থাওয়া করি নি বাবু, বর্ষার কালটা বাদ দিলে সম্বৎসর মেলা থেকে মেলা এই কাজে ঘুরি। মানুষজন দেখি। বেশ কেটে যায। আর বর্ষাব সময় হরিণঘাটার আশপাশে হালুইকরের কাজ করি। বিয়ে পৈতে শ্রাদ্ধ যা জোটে। এখন আবার নতুন দুটো ভোজকাজ হয়েছে, আপনাদের ঐ যাকে বলে, বিবাহবার্ষিকী আব জন্মদিন। এই-সব কবে টেনেটুনে চলে যায়।'

এই হলো, যাকে বলে, খাঁটি প্যাবামবুলেটিং ট্রেড। একটা থোক মূলধন জোগাড় করে জনকযেক কর্মচারী, বাসন-কোসন, বেঞ্চি-চেয়াব, বাঁশ আর ত্রিপল নিয়ে কেবলই ঘোরাঘুরি। এক মেলা থেকে আরেক মেলা। সব চন্দ্রমাসেব হিসেবে। মালিক বরিশাল থেকে আসা যোগেশচন্দ্র দেবনাথ। ফতুযা পরা ষাট-বয়সী, ঝানু আর ধূর্ত। জিজ্ঞেস করতেই ঝটিতি মেলাব নামাবলী পেশ করলেন, 'প্রথমে ধরেন এই গাইঘাটার পৌষসংক্রান্তি মেলা। চলবে একমাস। সেখান থেকে মাঘী পূর্ণিমায় স্বরূপনগর থানায় দেওবার মেলা বা যমুনার মেলে। সেখান থেকে ঠাকুরনগরে চৈত্র একাদশীতে বাকনীর মেলা। সেখান থেকে গাইঘাটা থানার জলেশ্বরে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। এইভাবে চলতে চলতে শেষ হবে বানপুর মাটিয়ারিতে অম্বুবাচীর মেলা আষাঢ় মাসে। বর্ষার দুমাস বাদ দিয়ে আবার আশ্বিন থেকে শুরু হবে সিজন।'

মন্মথ অধিকারী আমার হাতে-ধরা পদ্মপাতায় দুখানা সদ্য ভাজা গবম জিলিপি দিয়ে বলল, 'বাবু, গৌরাঙ্গের কৃপায আমি এই কাজে গত বিশ বছর নানা মালিকের দোকানের সঙ্গে অন্তত সত্তর-আশিখানা মেলা দেখেছি। কত মানুষ। কত কাণ্ড। কত ব্যাপারী। কত কেলেঙ্কারী। কত ঝড় জল। কত হাঙ্গামা। কিন্তু সব মিলিয়ে ভারি আনন্দ, যাই বলুন সবই গৌরাঙ্গের খেলা।'

এইভাবে 'গৌরাঙ্গের কৃপা' আর 'গৌরাঙ্গের খেলা' শব্দ দুটিকে অনর্গল অব্যয়ের মতো ব্যবহার করে মন্মথ অধিকারী আমার সঙ্গে জমিয়ে নিল। কথায় কথায় প্রসঙ্গের ফুঁপি বেরোয়। প্রসঙ্গ থেকে স্বচ্ছন্দে আরেক উল্‌টো প্রসঙ্গে যেতে পারে মানুষটা। সেই সুযোগে আমি আমার মনে-পুষে রাখা অনেক দিনের একটা প্রশ্ন খালাস করে ফেলি : 'এই যে পাঁচ-ছ মাস ধরে সব বাড়িছাড়া। সবাই কি সংযম করে থাকে নাকি? শরীরের ব্যাপার-স্যাপার আছে তো, না কি?'

জিভ কেটে মন্মথ বলে, 'বিলক্ষণ। গৌরাঙ্গের খেলায় এই দেহ নিয়েই যত

গোলমাল। আছে, তারও ব্যবস্থা আছে। সব মেলাতেই উস্‌কো মেয়েছেলে থাকে বৈকি। তারা চোখে সুর্মা টেনে, পায়ে মল বাজিয়ে আমাদের জানান দিয়ে যায় সময়মত। যার দরকার যোগাযোগ করে নেয়। সব মেলাতেই এ-সব চোরাগোপ্তা ব্যবস্থা থাকে। এক অগ্রদ্বীপের মেলা বাদে।'

: হঠাৎ ঐ মেলাটা বাদ কেন?

: গৌরাঙ্গের কৃপায় ঐ মেলা সব চেয়ে সাত্ত্বিক আর পবিত্র। ওখানে গিয়ে কুচিন্তা কি কাম একেবারে ত্যাগ করতে হবে। ও মেলার খুব মাহিত্ম্য। শুনতে চান কি বকম মাহিত্ম্য? তবে শুনুন। গৌরাঙ্গেব খেলায় অগ্রদ্বীপেব মেলার তিন দিনে লক্ষ লোক আসে কিন্তু দেখবেন একটাও কাক নেই, একটাও কুকুর নেই, কখনও ঝড় বৃষ্টি হয় না। আরো নিগূঢ় ব্যাপার আছে। সে-সব স্বযং গেলে বোঝা যায়। আপনি যাবেন? তা হলে আপনাকে নিশানা দিয়ে দেব সব-কিছুব। অগ্রদ্বীপের মেলা সব চেয়ে পুরানো মেলা বাবু।'

আমি বললাম, 'গৌবাঙ্গেব কৃপায় অগ্রদ্বীপের মেলা চালু করেছিলেন কে?'

মন্মথ শূন্যে হাত ছুঁড়ে বলল, 'আরে গৌরাঙ্গেব খেলা। অগ্রদ্বীপেব মেলা তো গৌরাঙ্গেরই তৈবি। তা হতেই সূচনা।'

চমকে বলি, 'সে কি? গৌরাঙ্গই অগ্রদ্বীপের মেলা শুরু করেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ' মন্মথ বিনয়নম্র বৈষ্ণবের মতো বলে, 'গৌরাঙ্গের খেলায় আমি লেখাপড়া শিখি নি। মুরুখ্যু মানুষ। তবে আমার গুরুপাট পাটুলিতে 'অমিয়নিমাইচবিত' পাঠ হয়। সেখানে আর শ্রীগুরুর শ্রীমুখে শুনেছি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর পরিকর গোবিন্দ ঘোষকে দিয়ে ওখানে গোপীনাথ জিউ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই গোপীনাথ মন্দিরকে ঘিরে তিন দিন মেলা বসে অগ্রদ্বীপে বারুণীর সময়ে। যাকে বলে আম-বারুণী। আমি কতবার গেছি দোকানের সঙ্গে।'

: আম-বারুণী কোন্‌ সময়ে হয়?

: আজ্ঞে ঐ মধুকৃষ্ণাতিথি। তার মানে গৌরাঙ্গের খেলায় যাকে বলে বসন্তকাল। অর্থাৎ যাকে বলে চৈত্র মাসের কৃষ্ণাতিথির একাদশীতে মেলা শুরু।

: কেমন করে যেতে হয়?

: নবদ্বীপধাম স্টেশন থেকে রেলে চেপে কাটোয়ার দিকে যেতে হবে। কাটোয়ার আগের স্টেশন দাঁইহাট। তার আগের স্টেশন অগ্রদ্বীপ। স্টেশন থেকে পুব দিকে মাইল দুই গেলে গঙ্গা। গঙ্গা পেরোলে গোপীনাথের মন্দির। তা গৌরাঙ্গের খেলায় একটু পথশ্রম আছে। তিনি ভক্তকে একটু বাজিয়ে নেন বৈকি। তবু যাবেন।

যাবার আগে একটু তথ্যসংগ্রহ করে নেওয়া আমার রীতি। ১৯১০ সালে বেরোনো পিটারসন সাহেবের লেখা বর্ধমান জেলা গেজেটিয়ারের লেখাটুকু বড় নিষ্প্রাণ :

Agradwip is a famous place of pilgrimage and contains a temple of Gopinath at which some ten thousandpilgrims gather every April.

এর চেয়ে একটু সজীব বর্ণনা জোটে বিজয়রামের লেখা 'তীর্থ মঙ্গল' কাব্যে। ১১৭১ বঙ্গাব্দে, তার মানে দুশো বছরেরও আগে ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের বাবা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করছিলেন বিজয়রাম। সেই সময় ত্রিস্থলী থেকে ফেরার পথে তাঁরা অগ্রদ্বীপে নামেন। গোপীনাথের মন্দির দেখে তাঁদের মন ভরে যায়। বিজয়রাম লেখেন :

অগ্রদ্বীপে আসি হৈল উপস্থিত।
সেইখানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব নির্মাণবাটি দেখিতে সুন্দর ॥

ইতিহাস বলছে, অগ্রদ্বীপের মূল মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে। এখনকার মন্দিরটি তৈরি করে দেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তার মানে বিজয়রাম যে অপূর্ব নির্মাণ বাটি দেখেছিলেন সেটি কৃষ্ণচন্দ্রের তৈরি।

কিন্তু নদীয়ারাজা কৃষ্ণচন্দ্র খামখা বর্ধমান জেলার এই মন্দিরটি বানালেন কেন ? এ প্রশ্নের ফুঁপি থেকে উঠে আসে আরেক মজার কাহিনী। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাবা রাজা রঘুরামের আমলে একবার অগ্রদ্বীপের মেলায় হয়েছিল প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা। দু-চার জন মারাও গিয়েছিল। খবর পেয়ে নবাব আলীবর্দীর প্রতিনিধি তখন মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠালেন বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ আর পাটুলির জমিদারকে। যে যার প্রতিনিধি পাঠালেন। দারুণ রেগে নবাবের পক্ষ প্রথমেই জানতে চাইলে অগ্রদ্বীপ কার এক্তিয়ারে ? ভয়ের চোটে বর্ধমান আর পাটুলির লোক মুখে কুলুপ আঁটল। সেই সুযোগে নদীয়ার ধূর্ত প্রতিনিধি বললে, 'অগ্রদ্বীপ নদীয়া রাজেরই এক্তিয়ারে। এবারে নানা কারণে গাফিলতি হয়ে গেছে। আর কখনো এমন হাঙ্গামা হবে না হুজুর।'

ব্যস্। অপরাধ মকুব। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ চলে এলেন রাজা রঘুরামের দখলে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোপীনাথ কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে বছরে অন্তত ছ মাস থাকেন। সেবা পূজা শেতল হয়। অবাক কাণ্ড। এমনই

নাকি ছিল সেকালেব নবাবী প্রশাসন ?

অগ্রদ্বীপেব বেশ প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ওড়িয়া কবি দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' বইতে। বইটি সতের শতকে লেখা। ঐ বইতে ওড়িয়া ভাষায় লেখা আছে—

অগ্রদীপ ঘাট যা কহি
তঁহিরে শ্রীঘোষ গোঁসাই।

এই শ্রীঘোষ গোঁসাই মানে গোবিন্দ ঘোষ। যাঁব নামে এই মেলার নাম এখনো অনেকে বলেন 'ঘোষ ঠাকুরের মেলা।'

ঘোষপাড়াব কর্তাভজাদের বিখ্যাত নেতা দুলালচাঁদ ওরফে লালশশীর মতো মান্যগণ্য লোকও যে অগ্রদ্বীপ গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর গানের এই উক্তিতে ধবা আছে যে,

একবাব অগ্রদ্বীপেব মহোৎসবে দেখতে গেলাম একা
আখডাধাবী কত পুরুষ-নাবী হয না লেখা জোখা।

এ বিববণ থেকে অগ্রদ্বীপেব মেলায আখডাধাবী অনেক সহজিয়াদেব বর্ণনা পাওয়া যায়। এব চেযেও স্বাদু বর্ণনা মেলে সাহেবধনী-গীতিকার কুবিব গোঁসাইযের লেখায়—

যত নেডানেড়ি ঘোষেব বাড়ি প্রসাদ মাবে বোজ দুবেলা।
রামাতনিমাত ব্রহ্মচারী
আউল বাউল কপ্নিধাবী
যত শুদ্ধাচারী জপে মালা।
উদাসীন দরবেশ গোঁসাই
ফুৎকাব অবধৌতি নিতাই
উন্মত্ত সদাই গেঁজাচলা।

এর পাশে সহজিয়া নাগর-নাগরীর প্রেমচিত্রও কম আকর্ষণীয় নয়। সেখানে দেখা যায়—

নাগরী চারিদিকে বেড়াচ্ছে পাকে পাকে
দ্যাখে যারে তাইরে ডাকে 'এসো প্রাণবন্ধু' বলে।
এই মনের মত হলে পরে
নামের মালা দেয় তার গলে।
বলিতেছে ধরো ধরো', ধরো ভাই যত পারো,
প্রেমসেবা যদি করো মনের সাধে সকলে।'

অবশ্য অগ্রদ্বীপের মেলা নিয়ে যে খারাপ কথাও চালু আছে তা আমি জানতাম

না। জানালেন এক বহুদর্শী ফকির। বললেন, 'মেলায় নানারকম মানুষ আসে নানান তালে। সবাই তাদের মধ্যে ভালো নয়। ঠগ, জোচ্চোর, দেহব্যবসায়ী, কামপাগল, শয়তানও থাকে বৈকি। আমাদের চলতি কথায় ঐজন্যে অগ্রদ্বীপের মেলা সম্বন্ধে বলে : অগ্রদ্বীপের মেলা/ কে কার পাছায় মারে ঢেলা। 'তার মানে জায়গাটায় অশৈল কাজটাজও হয়। আমি ঐ জন্যে অগ্রদ্বীপে আর যাই না। আশেপাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা আজকাল মেলায় এসে নোংরামি করে। ও মেলার মর্যাদা চলে গেছে।'

বাংলার মেলা নিয়ে তেমন সমাজতাত্ত্বিক কাজ হয়েছে বলে শুনি নি। হলে, মেলার আকার প্রকার স্বভাবের বিবর্তন থেকে সমাজ-বিবর্তনের একটা ছক পাওয়া যেত। যেমন দেখা যায় আশি বছর আগে মরুটিয়ার স্নানযাত্রার মেলা দেখে যে বিবরণ দীনেন্দ্রকুমার রায় এঁকেছিলেন তাঁর 'পল্লীচিত্র' বইতে তার সঙ্গে এখানকার মেলার মিল বেশ কম। তিনি লিখেছেন :

> বারবিলাসিনীগণের 'দোকান'-এ অঞ্চলের মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেলায় ইহাদের সমাগম যত অধিক হয় জমিদারদের লাভও তত অধিক হইয়া থাকে ; এইজন্য তাঁহারা মেলাক্ষেত্রের একটি অংশ ইহাদের জন্য ঘিরিয়া রাখেন। ইহারাই মেলার কলঙ্ক। ইহাদের প্রবেশাধিকার না থাকিলে, শুনিয়াছি, মেলা জমে না! এক একটি রূপজীবিনি তিন চারি হাত লম্বা টোঙ্গে' রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। মেলার একপ্রান্তে এরূপ শত শত টোঙ্গ'! অর্থোপার্জনের আশায় এখানে নানা পল্লী হইতে তিন শতাধিক রূপজীবিনীর সমাগম হইয়াছে।...শিকারের সন্ধানে অনেকে চারিগাছা মলের ঝন্ঝনিতে গ্রাম্য চাষীদের ও পাইক পেয়াদা নগদীগণের তৃষিত চিত্ত উদভ্রান্ত করিয়া মেলার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। জনারণ্যে নারীদেহে যেন সাপ, বাঘ!

জমিদারতন্ত্রের প্রশ্রয়ে গড়ে-ওঠা দেহব্যবসা এখন কোনো মেলাতেই নেই। দেহব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা এখন মেলায় থাকে না। টোঙ্গে আর শত শত স্বৈরিণী এখন কল্পনাতীত। তার কারণ শরীরী ব্যবসা এখন শহরকেন্দ্রিক এবং অনতিপ্রকাশ্য। অথচ আগেকার দিনে কৃষিভিত্তিক গ্রামদেশের মানুষের যৌনতার দীক্ষা হতো সম্ভবত মেলাখেলায়। সেই জন্যে শিষ্ট সমাজে আজও গ্রাম্যমেলা সম্পর্কে একটা সশঙ্ক ধারণা আছে। সেকালের কত মেলায় যে কত মেয়ে হারিয়ে যেত।

সে কথা থাক। কিন্তু আমার যে কথাগুলো জানা ছিল না তার মধ্যে বড় কথা

হলো গোপীনাথকে সবাই বলে 'গুপিনাথ' । স্বরসঙ্গতির ব্যাপার । এ কথাটাও জানতাম না যে অগ্রদ্বীপের উচ্চারণ অঞ্চল বিশেষের গ্রাম্যতায় দাঁড়াতে পারে 'রগ্‌গদ্বীপ' । জানলাম প্রথম যেবার অগ্রদ্বীপে যাই সেবার ট্রেনে উঠে সহযাত্রী দলেব বৈরাগী একজন আমাকে বললে : বাবু কি আমাদের মতোই রগ্‌গদ্বীপে যাচ্ছেন ? চলুন । অন্য বার আমরা নদী পথে যাই এবারে যাচ্ছি এলে চড়ে ।

'এল' মানে রেল । আশ্চর্য বর্ণবিপর্যাস । রেল হলো এল, কিন্তু অগ্রদ্বীপ হলো রগ্‌গদ্বীপ ।

যাই হোক, প্রথম বারে আমার রগ্‌গদ্বীপের গুপিনাথ দেখতে যাওয়া 'এলে চড়ে ।' 'এল' যে স্টেশনে থামল তার নাম অগ্রদ্বীপ । যদিও জায়গাটার নাম অগ্রদ্বীপ নয় । জায়গাটার নাম বহড়া । অগ্রদ্বীপ বহড়া গ্রাম থেকে আড়াই মাইল পুবের একটা গ্রাম । দুইগ্রামকে ভাগ করেছে গঙ্গা । আড়াই মাইল দূরের গ্রামের নামে স্টেশন ? একেই বোধ হয় বলে অগ্রদ্বীপের মাহিত্ম্য ।

চৈত্রের মাঝামাঝি সময়, কাজেই মাটিতে তাত উঠছে বেলা দশটাতেই । তার উপব গঙ্গার মস্ত চড়া আর বালিয়াড়ি । অন্তত একমাইল চড়া পেরোতে গৌরাঙ্গের কৃপায় বেশ ভালরকম ভক্তির পরীক্ষা ঘটে যায় । তবে ক্লান্তি লাগে না, কেননা সঙ্গে চলে অনেক মানুষজন, তাদের কলকাকলি । খুব তেষ্টা লাগলে কিনে খাওয়া যায টাটকা তালের রস । কিংবা চড়ায় মাঝে মাঝেই কিনতে পাওয়া যায় 'বাখারি' অর্থাৎ এক রকমের লম্বাটে কাঁকুড । সরস স্নিগ্ধ । কেউ চলেছে মাথায় করে একটা মিষ্টি কুমড়ো নিয়ে । 'বিক্রি করবা নাকি কুমড়ো' ? জবাবে সে বলে 'না গো, গাছের প্রথম ফল, গুপিনাথকে দেব' । যত মানুষ চলেছে তার বারো-আনাই মহিলা । বেশির ভাগ মানুষের ভাষা থেকে মালুম হয় যে তারা পুববঙ্গের মানুষ । ব্যাপারটা কি ? পুববঙ্গের এত মানুষ এই রাঢ়ের অগ্রদ্বীপে কেন ?

কী ভাবে ?

এ কৌতূহলের ফুঁপি থেকে আরেকটা রহস্যের জট খুলে যায় । পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্গের বেশির ভাগ ম্যনুষ গৌরভক্ত । দেশ ভাগের সময় তাদের অনেকে পুনর্বসতির জন্যে তা বেছে নেয় 'গৌরগঙ্গার দেশ' অর্থাৎ নবদ্বীপ আর তার আশপাশ । দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের যে-সব গ্রামীণ মেলায় কৃষ্ণের অনুষঙ্গ আছে সেগুলি বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে এ ব্যাপারটা অনেকে খেয়াল করেননি । সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা হয়নি যে বেশির ভাগ অন্যান্য মেলার নাভিশ্বাস উঠেছে । কেননা গ্রামে গ্রামে এখন সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা টেম্‌পো আর ম্যাটাডোরের কল্যাণে এত সুনিশ্চিত যে মেলায় গ্রামীণ মানুষের কেনার সামগ্রী

অনেক কম। মেলা এখন শুধুই বিনোদন আর প্রচল। শীর্ণ প্রথা কিংবা নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অগ্রদ্বীপের রমরমাই আলাদা। মানুষ, শুধু মানুষ। দশটা খেয়া নৌকো মানুষ পরাপারে কিছুতেই সামলে দিতে পারে না।

পথে যেতে লক্ষ করা যায় সকলেরই কেমন যেন একটা পৌঁছবার তাড়া রয়েছে। যেন ছুটছে। 'ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব তো ?' 'দেরি হয়নি তো ?' কিসের ঠিক সময় ? দেরিই বা কেন ? এক জনকে জিগ্যেস করতে বলে, 'এগারটার মধ্যে তো শ্রাদ্ধ হয়ে যাবে। তাই এত তাড়াতাড়ি।'

: শ্রাদ্ধ ? কার শ্রাদ্ধ ?

: আপনি কোনোদিন আসেন নি বুঝি ? শ্রাদ্ধ মানে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ।

: ঘোষঠাকুর মানে গোবিন্দ ঘোষ ? তার শ্রাদ্ধ কে করে ?

: কে আবার করবে ? করেন স্বয়ং আমাদের গুপিনাথ। আজকে আম-বারুণীর একাদশী। আজ গুপিনাথ কাছা পরে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ করবেন। চলুন, পা চালান।

উর্ধ্বশ্বাসে চলমান এই বাহিনীর সঙ্গে আমি তাল রাখতে পারি না বোধ হয় চাইও না। আমার মনে এ-সব ঘটনা বড় জোর কৌতূহল আর কৌতুক জাগায়। এপ্রিলের মাঝামাঝি যে মধুকৃষ্ণা একাদশী তা কি আমার কোনো ভাবেই খেয়াল থাকে ? আম-বারুণীর কোনো আহ্বান কি আমার জীবনে থাকতে পারে ? অথচ আমার সঙ্গে দ্রুত ধাবমান এই ভক্ত-জনতা প্রতি বছর সে-সব আলাদা করে মনে রাখে আর দিন গোনে। ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ দেখার জন্যে তাদের এই মুক্তকচ্ছ দৌড় আর খেয়া নৌকোয় বিপজ্জনক লাফ দেওয়া, তার পিছনে যে-মনের টান, হিসেব করে দেখি, তার একটা অনুকণা আমার মনের অতলে জমা নেই। এরা কি তবে জীবনানন্দ-কথিত 'পৃথক, আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ?' পৃথক তো বটেই। কেননা এই বিরাট সৌর পৃথিবীর অন্তর্গত আমাদের প্রতিদিনের যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-করা জীবন তার সঙ্গে এদের অটল ভক্তিবিশ্বাসের জীবন একেবারে পৃথক। স্পষ্ট, কেননা এদের লক্ষ্য স্থির, বিশ্বাস ধ্রুব, আচরণ সুনির্দিষ্ট, চলাচল ভক্তির পথে। সেখানে তাদের সংশয় সন্দেহ নেই। আমার পিছন পিছন দুই মাঝবয়সী বিধবা যাচ্ছিলেন বহু রকম কথা বলতে বলতে। তাঁদের আলোচনার একটা গুরুতর প্রসঙ্গ হলো সঠিক গুরুনির্বাচন। চলার পথে গুরুনির্বাচনে ভুল হলে নাকি সমূহ সর্বনাশ। একজন আর একজনকে বলছেন, 'আমি ঐ কালোর দিদির মতো নাপিয়ে নাপিয়ে গুরুসঙ্গ করতে পারব না।' এ কথা শুনে মনে হলো 'নাপিয়ে নাপিয়ে' শব্দটার মানে যদি হয় উল্লম্ফন তবে

কালোর দিদির মনের চাঞ্চল্য বোঝা যায়। অর্থাৎ তিনি কেবলই গুরু পাল্‌টান। সেটা খারাপ।

এ কথার জবাবে অন্য মহিলা বললেন, 'গুরু পাওয়া কি সোজা কথা? পেরথমে লোকের মুখে সাধু কথা শুনে জন্মায় ছেদ্দা। পরে সাধুদর্শনে লোভ জাগে। সেই লোভ থেকে হয় সাধুসঙ্গ। সেই সাধুতে আসে গুরুজ্ঞান। এ-সবের মূলে থাকে গুরুর কথা। আমার গুরুলাভ হয়েছে। হ্যাঁগো, তোমার গুরুলাভে শান্তি হয়েছে?'

: খুব শান্তি। নইলে তাঁর কাছে এত ব্যগ্র হয়ে ছুটে যাচ্ছি কিসের জন্যে? আমার তো অত গুপিনাথ দেখার লোভ নাই। সেখানে গুরু গেছেন, তাঁর আদেশ হয়েছে, তাই আমার যাওয়া। আমার মনের দুঃখ কি জানো? গুরুকে আমি তেমন আপন করে নিতে পাবি নি এখনও। তিনি আমাকে আপন করে নিয়েছেন।

এ-সব শুনতে শুনতে এদের স্পষ্ট পৃথক অস্তিত্ব আবার টের পাই। পিছিয়ে এসে জিগ্যেস করে বসি, 'আপনাদের গুরু কে? থাকেন কোথায়?'

: 'ও বাবা। তুমি বুঝি আমাদের কথা শুনে ফেলেছ? কী লজ্জা। তা যাক্‌গে। বাবা আমাদের গুরুর নাম গগন বৈরাগ্য। গুরুপাট বামুনডাঙ্গা। এখানে তিনি এসেছেন মচ্ছব দিতে। তুমি যেয়ো আমাদের আখড়ায়। খুব শান্তি পাবে। গুরু আমাদের মাটির মানুষ। কি করে আখড়া চিনবে? লোকজনকে জিগ্যেস কোরো, চরণ পালের আখড়া কোথায়। সেই চরণ পালের আখড়া তো খুব নাম করা। তারি পশ্চিমে আমার গুরুর আখড়া পিটুলি গাছতলায়। হ্যাঁগো ছেলে, যাবা তো?'

কথা দিয়ে এগিয়ে চলি। বেশ পরিশ্রান্ত লাগে। একটু বসতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু তপ্ত বালির চড়ায় বসি কোথায়? শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো গেল গঙ্গার ধারে। এবারে এই ধারের পথ ধরে অন্তত সিকি মাইল হাঁটা রাস্তা শেষ হলে খেয়াঘাট। আপাতত গঙ্গার ধারে বহুলোক স্নান করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চোখে পড়ে এক বৈষ্ণবী স্নান সেরে, গৌরিক বাস পরে, আপন মনে একটা ছোট আয়না মুখের সামনে ধ'রে ব'সে ব'সে মুখে নাকে কপালে রসকলি আঁকছে। পাশে তার প্রৌঢ় বৈষ্ণব বাবাজী বসে গাঁজা সেবা করছেন। পৃথক এই মানুষটার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে জাগল। বাবাজী খাতির করে তাঁর সতরঞ্চির একটা কোণে বসতে বললেন। আঃ কী শান্তি।

এবারে শুরু হয় আমার শহুরে নির্বোধ প্রশ্নমালা। আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব? আপনাদের কোন্ ধারা? মাধবাচার্য না নিম্বার্ক না রামানুজ? কোথায়

থাকেন ? গুরু পাট কোথায় ? মানুষটা গোঁফদাড়ির ফাঁকে আমার জন্যে ভরে রাখেন এক করুণার হাসি। বলেন, 'বৈষ্ণব কি এক রকম ? আমরা রাতটহলিয়া। কিছু বুঝলেন ?'

: রাতটহলিয়া ? মানে কি ?

: মানে আমাদের কাজ হচ্ছে সারা রাত টহল দিয়া নামগান করা।

: এমন কথা আগে শুনি নি। শুনেছি বৈষ্ণব দু রকম। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব আর সহজিয়া বৈষ্ণব। আরো অনেক বৈষ্ণব আছে নাকি ?

: আছে বৈকি ? আমার অজানা অনেক আছে। আর জানা বোষ্টমদের কথা শুনলেই ভিরমি খাবেন। শুনুন। জাত বৈষ্ণব আর সহজিয়ার বাইরে আমার জানিত সম্প্রদায় হলো রাধাশ্যামী, রূপকবিরাজী, রাধাবল্লভী, হরিবোলা, গুরুদাসী বৈষ্ণব, খণ্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব, কিশোরীভজনী, গৌরবাদী আর আমাদের রাতটহলিয়া।

: এরা সব কোথায় থাকেন ? চেনেন কি করে ?

: লক্ষণে চেনা যায়। ক্রিয়াকরণ আলাদা। বীজমন্ত্র আলাদা। মেলা মহোৎসব আলাদা আলাদা স্থানে। যেমন ধরুন আমাদের দীক্ষামন্ত্র আর কণ্ঠিবদল হয় মোহনপুর কেঁদুলিতে।

ততক্ষণে বৈষ্ণবীর রসকলি পবা এমন-কি সর্বাঙ্গে গৌর ছাপ দেওয়া সারা। কুচকুচে কালো গায়ের চামড়ায় সেই তিলক-মাটির রঙ ক্যাট ক্যাট করছে। তিনি আমার দিকে এক মোহিনী কটাক্ষ করলেন। আমার জানাচেনা সমাজের বাইরে এক স্পষ্ট পৃথক পারমিসিভ সোসাইটির রূপরেখা ঐ কটাক্ষে আঁকা ছিল। আমি চট করে উঠে পড়ে বললাম 'আপনাদের কণ্ঠি বদল কত দিনের ?'

বৈষ্ণবী তার আতার বিচির মতো মিশিমাখা দাঁত বার করে বললে, 'এবারেই পৌষ মাসে আমাদের কণ্ঠিবদল হয়েছে গো। দেখে বুঝছেন না আমাদের নবীন নাগরালি ? বসুন বসুন। সকালে একটু জল-বাতাসা সেবা করুন। ঘেমে তো নেয়ে গেছে অঙ্গ।'

প্রৌঢ়ের সঙ্গে যুবতীর এই নবীন/নাগরালি সুস্থ মনে সওয়া কঠিন। এ মেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বোষ্টমকে ঘোল খাইয়েছে। আমি অবশ্য আপ্ত সাবধান আছি। বৈষ্ণব বাবাজী খুব নির্বিকার উদাসী ভঙ্গিতে গাঁজায় দম মারছেন। এ জগতের কোনো ইশারা আপাতত তাঁর কাছে খুবই মূল্যহীন। পেতলের রেকাবীতে বাতাসা আর কদমা, ঘটিতে গঙ্গাজল। বৈষ্ণবী ভক্তিভরে আমাকে নিবেদন করে এবারে চুল বাঁধতে বসলেন। সঙ্গে গানের গুনগুনুনি। সে গানের বাণী শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম :

সখি পিরিতি আখর তিন
পিরিতি আরতি যেজন বুঝেছে সেই জানে তার চিন
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে
তাহাতে জন্মিল 'পি'
অধরে অধরে সুধা পরশনে
তাহাতে জন্মিল 'রি'
আর হৃদয়ে হৃদয়ে ভাব বিনিময়ে
তাহাতে জন্মিল 'তি'।

গানের শেষে আর-এক মোক্ষম কটাক্ষ। সেই বাণ কোনোরকমে সামলে আমি উঠে পড়ি। খেয়াঘাট অদূরে। এখুনি পাব হতে হবে।

মন্দিরে পৌঁছে দেখা গেল শ্রাদ্ধ শেষ। একজন বললে, 'দেরি করে ফেললেন গো। ছেরাদ্দ এবারের মতো শেষ।' আপনাব দেখা হলো না। গুরুবল নেই। তা কি আর করবেন ? আজ তো চিঁড়ে-মচ্ছব। বসুন আমাদেব আখড়ায়। দই চিঁড়ে খান।'

গোপীনাথের মন্দির-চত্বরের পাশে ঘোষঠাকুরের সমাজ ঘর। তার মানে গোবিন্দ ঘোষের সমাধি। সেখানে নাকি শ্রাদ্ধের সকালে গোপীনাথকে আনা হয় কাছা পরিয়ে। তার হাতে দেওয়া হয় পিণ্ড আর কুশ। খানিক পরে তা স্খলিত হয়ে পড়ে মাটিতে। হৈ হৈ করে ওঠে ভক্তজন। প্রধানত গোপসম্প্রদায়। মেলাচত্বরের চার দিক মানুষে মানুষে গিজগিজ করছে।

সেখান থেকে এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে উঠে ভেতরে তাকাই। অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি কষ্টিপাথরের। খুব নিপুণভাবে কাছা পরানো। এক অভিনব দৃশ্য বৈকি। সারা ভারতবর্ষে কৃষ্ণমন্দির তো অজস্র। কিন্তু কোথাও কৃষ্ণ কাছা প'রে তাঁর ভক্তদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন এমন কেউ শোনে নি। পূজারী মন্দিরের একপাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আপন মনে। তাঁকে বিরক্ত করলাম নানা প্রশ্নে। জবাব এল সোজাসুজি ; 'এ হলো ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা। জগতের কোথাও এমন ঘটে নি। এই যে মূর্তি দেখছেন এ স্বয়ং বিশ্বকর্মার নিজের হাতে তৈরি। কষ্টিপাথরের মূর্তি। চোখ দুটো শাঁখের।'

বিশ্বাসী জগতের মানুষটিকে আঘাত করতে ইচ্ছে করল না আজকের দিনে। তাই প্রসঙ্গ পালটে বলি, 'আপনারা কি বংশানুক্রমে গোপীনাথের পূজারী ?'

: ঠিক তা নয়। যদ্দূর খবর শুনেছি, রাজা রঘুরামের আমলে প্রথম পূজারী ছিলেন অগ্রদ্বীপের নিত্যানন্দ ভটচাজ্জি। তাঁর হাত থেকে আমাদের বংশে

পৌরোহিত্য আসে। আমরা নদীর ওপারে বহড়ার লোক। আমাদের বংশে গোপীনাথের প্রথম পুরোহিত হন মধুসূদন। তাঁর ছেলে ত্রয়োনিধি, তাঁর ছেলে ত্রিলোচন। তাঁর ছেলে তারাপদ। তাঁর ছেলে শ্যামাপদ। তাঁর ছেলে আমি। তা হলে ক'পুরুষ হলো ? ছ'পুরুষ ? এই ছ'পুরুষ ধরে আমরা গোপীনাথের পূজা করছি।

: আপনার ছেলেও কি গোপীনাথের পূজারী হবেন মনে হয় ?

'কি করে বলি বলুন তো ?' পূজারী বলেন, 'আমার নিজেরই তো এ কাজ করার কথা নয়। আমি তো চাকরি করতাম বেঙ্গল পটারিতে। কোনো দিন কি ভেবেছি এখানে এই ফাঁকা মাঠে মন্দিরে পড়ে থাকব ?'

: কিভাবে পূজারী হলেন ?

: বাবাই বরাবর পুজো করতেন। হঠাৎ বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে আমাকে তার করলেন। আমি ছুটি নিয়ে এসে ক-দিন সেবাপুজো চালালাম। কিন্তু বাবা আর তেমন সুস্থ হলেন না। তখন বললেন, 'পুজোর দায়িত্বটা তুইই নে। হাজার হলেও গুপিনাথ আমাদের বাড়ির ছেলের মতো।' কথাটা ফেলতে পারলাম না। রয়ে গেলাম। তা চার-পাঁচ বছর তো হয়েও গেল।

: কেমন লাগে ?

: প্রথম প্রথম খুবই খারাপ লাগত। কলকাতার জীবনের জন্যে মন টানত। এখানটা একটা ফাঁকা মাঠ বৈ তো নয়। মানুষজন কোথাও নেই আশেপাশে। আমি আর গুপিনাথ পড়ে থাকি। ক্বচিৎ কদাচিৎ যাত্রী বা ভক্ত আসে। নইলে সারা দিন একা। রাতেও। ভোগ রাগ দিই, পুজো করি, বৈকালী আর সন্ধেবেলার শেতল দিই। তা ছাড়া বালা ভোগ। মাসে একদিন হয়তো বাড়ি যাই। ঐ আছি আর কি!

: এখন আর খারাপ লাগে না তা হলে ?

: গুপিনাথ রয়েছেন তো। এখন মন বসে গেছে। একটা টানই বলতে পারেন। কোথাও গিয়ে শান্তিও পাই না। ভাবি তাঁর হয়তো অযত্ন হচ্ছে। কেবল ভাবি কখন ফিরব। একটু দেখব গুপিনাথকে।

: এর কারণ কি মনে হয় ?

: কারণ আর কি ? গুপিনাথের মায়া সব। সাংঘাতিক মানুষ তো। ঈশ্বরের নরলীলা তাঁর শক্তি কি কম ? মাঝে মাঝে যেমন রাতে ঘুম ভেঙে দেখি চার দিক ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা। অথচ ফুল কই ? কখনও কখনও অনেক রাতে গুপিনাথের ঘরের দরজার খিল খোলা বা বন্ধের আওয়াজ পাই। মনে হয়, রাতের দিকে উনি কোথাও যান, আবার ভোরের দিকে ফেরেন। টের পাই।

পৃথক এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী পূজারীর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের আর তল পাই না। তাঁকে এ কথা আর জিগ্যেস করতে পারি না যে সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী দেবতার কোথাও যেতে কেন খিল খুলতে হয় ? বরং জানতে চাই, 'ঈশ্বরের নরলীলার শক্তির কথা বলেছিলেন, সেটা কি ব্যাপার ?'

'আপনি ঘোষঠাকুরের ঘটনা জানেন না দেখছি' পূজারী খানিকটা করুণা মিশিয়ে বলেন, 'তবে শুনুন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশের সন্তান ছিলেন গোবিন্দ, বাসুদেব আর মাধব ঘোষ এই তিন ভাই। কাটোয়ার কাছে অজয় নদীর পারে কুলাই গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডে লেখা আছে :

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোঁসাই ॥

তো সেই গোবিন্দ ঘোষ আর অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একবাব প্রভু চলেছেন রামকেলির দিকে। পথে যেতে যেতে যে গ্রামে দুপুর হয়ে যেত সেখানেই হতো মধ্যাহ্ন ভোজন। এক গ্রামে সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে মহাপ্রভু বললেন, 'একটু মুখশুদ্ধি পেলে হতো।' সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ এক টুকবো হত্তুকি জোগাড করে তাঁকে দিলেন, আব এক টুকরো নিজের কাছে রেখে দিলেন। পরদিন মহাপ্রভুর দল পৌঁছাল এই অগ্রদ্বীপে। এখানে দুপুরেব খাওয়া শেষ হতেই গোবিন্দ এগিয়ে দিলেন বাকি হত্তুকিটুকু। প্রভু তো অবাক। 'কোথায় পেলে হত্তুকি ?' যখন শুনলেন গতদিনের অংশ এটা, বললেন, 'হলো না। গোবিন্দ তোমার সন্ন্যাস হলো না। তোমার আজও সঞ্চয় বাসনা যায় নি। তুমি গৃহস্থ হও। বিবাহ কর। থাকো এখানেই।'

'কি আর করেন। প্রভুর আদেশ। রয়ে গেলেন। এক দিন গঙ্গায় স্নান করছেন গোবিন্দ। গায়ে কি যেন একটা ভেসে এসে ঠেকল। শ্মশানের পোড়া কাঠ নাকি ? না। মনে প্রত্যাদেশ পেলেন ওটা ব্রহ্মশিলা। ওটাকে ধরো। বাড়ি নিয়ে যাও। প্রভু এলেন আবার। ঐ ব্রহ্মশিলা দিয়ে বিগ্রহ বানালো ভাস্কর। গোবিন্দের চালাঘরে মহাপ্রভু নিজে বসালেন গোপীনাথকে। এই সেই গোপীনাথ।'

পূজারী থামলেন। আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি যে তখন বললেন এ মূর্তি বিশ্বকর্মার গড়া ?'

বিরক্ত পূজারী বললেন, বিশ্বকর্মাই তো। মানুষরূপী বিশ্বকর্মা। জানেন না গোপীনাথ গড়েছিল বলে আজও দাঁইহাটের ভাস্করদের কত সম্মান ? যাই

হোক। গোবিন্দ তো তার পর বিয়ে করলেন। সেবাপুজো করেন। ক্রমে পুত্র সন্তান হলো একটি। ইতিমধ্যে হঠাৎ স্ত্রী মারা গেল। মহা মুস্কিল। একদিকে সন্তান পালন অন্য দিকে গোপীনাথের পুজো। কোনোটাই ভালো করে পারেন না। গোলমাল হয়ে যায়। এদিকে পাঁচ বছর বয়স হলে ছেলেটি মারা গেল। গোবিন্দ শোকে পাগল মতো হয়ে গেলেন। ভাবলেন সন্ন্যাস হলো না। গোপীনাথকে বললেন, 'তোমার কথায় সংসারী হলাম। স্ত্রীকে নিলে, একমাত্র সন্তানকেও নিলে ? যাও তোমার সেবা পুজো বন্ধ। তোমাকেও খেতে দেব না নিজেও খাব না। আত্মঘাতী হব। দেখি তোমার বিচার।' তখনই ঘটনাটা ঘটল।

: কি ঘটনা ?

: গোপীনাথ বললেন, 'তোমার কি দয়ামায়া নেই ? একটা ছেলে যদি দৈবগতিকে মরেই থাকে তাই বলে আর এক ছেলেকে তুমি না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারবে ?' সটান উঠে বসে গোবিন্দ। বলে, 'তুমি আমার ছেলে ? তুমি ছেলের কাজ করবে আমার ?' 'কি কাজ ?' গোপীনাথ জানতে চান। গোবিন্দ বলেন, 'শ্রাদ্ধ। ছেলে থাকলে আমার শ্রাদ্ধ করত। তুমি তা করবে ?' 'করব। কথা দিলাম।' সেই থেকে এই ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ চলছে। প্রতি বছর তিনি তিন দিন কাছা পরে থেকে একাদশীতে শ্রাদ্ধ করেন।

: 'তিন দিন কেন ?' আমি জানতে চাই।

: বৈষ্ণবদের শ্রাদ্ধ তো তিন দিনেই হয়। কিন্তু আসল কথাটা কি ধরতে পারলেন ? ভক্তবৎসল ঈশ্বরের আসল মহিমাটা খেয়াল করলেন ?'

: কি বলুন তো ?

: নিজের ছেলে যদি বেঁচে থাকত গোবিন্দ ঘোষের তবে বড় জোর সে যে-ক' বছর বেঁচে থাকত সে-ক' বছর শ্রাদ্ধ করত বাবার। কিন্তু ভক্তবৎসল প্রভু যে এখানে পাঁচশো বছর ধরে শ্রাদ্ধ করছেন। যতদিন সৃষ্টি থাকবে ততদিন এখানে এই ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডদান করবেন গুপিনাথ। এ কি সোজা কথা ? সেইজন্যে এখানকার এত মাহাত্ম্য। এত মানুষ। সব রকমের সাধু সন্ন্যেসী বাউল বৈরাগী দরবেশ অবধূত এখানে আসেন। এখানে এসেই চরণ পাল তাঁর দীনদয়ালকে পেয়েছিলেন। সেইজন্যে ঐ উত্তর দিকে চরণ পালের 'আসন' বসে প্রত্যেক বছর। যান দেখে আসুন।

উত্তর দিকে এগিয়ে যাই। সত্যিই নদীর ধারে চরণ পালের আসন। বসে আছেন এক ফকির। তাঁর সামনে রক্তাম্বরধারী এক সাধক। অগনিত নরনারী আসনে নিবেদন করছে দৈ চিঁড়ে কলা মুড়কি। আজ যে চিঁড়ে মহোৎসব।

সুযোগ পেয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে এসে চরণ পাল তাঁর দীনদয়ালকে পেয়েছিলেন সেই বৃত্তান্ত কি জানেন ? দীনদয়ালই বা কে ?'

লোকটি বলল 'দীনদয়াল দীনবন্ধু আমাদের সাহেবধনীদের উপাস্যের নাম। আর চরণ পাল আমাদের গুরুবংশের একজন আদিগুরু। তাঁর নিবাস নদে জেলার দোগাছিয়ায়। জাতে গোপ। তিনি একদিন মাঠে গরু চরাচ্ছিলেন, এমন সময় এক উদাসীন এসে দুধ খেতে চাইলে। গরুর পাশে বেশিবভাগ এঁড়ে আর বলদ। কেবল একটা বাঁজা গাই ছিল। চরণ তাই বললেন : 'দুধ কোথায় পাব ?' উদাসীন বললেন, 'ঐ বাঁজা গাইতেই দুধ দেবে।' কী কাণ্ড, সত্যিই তাই। চরণ পাল কেঁড়ে ভর্তি দুধ দুইয়ে চেয়ে দেখেন উদাসীন কোত্থাও নেই। এই যে ছিল, তবে হঠাৎ মানুষটা গেল কোথায ? খোঁজ্ খোঁজ্। হাতে দুধের কেঁড়ে নিয়ে চরণ পাল ছোটে। দৃষ্টি এলোমেলো। কোথায় গেল উদাসীন ? মাঠের পর মাঠ পেবিয়ে ভব-সন্ধ্যেবেলা এই অগ্‌গদ্বীপে এসে তাঁকে এই গাছতলায় পেলেন। উদাসীন সেই দুধ খেয়ে বললেন, 'যাঃ তোর মনস্কামনা পূর্ণ হযেছে। তুই দীনদয়াল পেয়ে গেছিস। আজ থেকে তুই বাকসিদ্ধ। তোর পরের ছ'পুরুষ থাকবে বাক্‌সিদ্ধ।' তো বাবু, এই তো বিত্তান্ত।'

আমি বললাম, 'বাক্‌সিদ্ধ কাকে বলে ?'

: আজ্ঞে, যাঁর বাক্য ফলে যায়। এই যেমন ধরুন বাক্‌সিদ্ধ বললেন, ল্যাংড়া সেরে যাবে, বোবায় কথা বলবে, অন্ধ চোখে দেখবে, বাঁজার সন্তান হবে, তো তাই হবে। তিনি পশ্চিমে সূর্য উদয় দেখাতে পারেন। বাক্যের বলে লক্ষ লোককেও অন্ন-মচ্ছব করাতে পারেন। এই যেমন ধরুন, এখানে চরণ পালের হুকুম আছে তাই কোনোদিন এ মেলায় ঝড়জল হয় না, গাছে একটা কাকপক্ষী নেই, নেই কুকুর শেয়াল। এ-সব বাক্‌সিদ্ধ সাধকের হেকমৎ।

: বাক্‌সিদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো রকম সিদ্ধপুরুষ হয় নাকি ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। তাকে বলে সাধনসিদ্ধ। আমাদের চরণ পালের শিষ্য কুবির গোঁসাই ছিলেন সাধনসিদ্ধ। তাঁর একটা গান আছে—

সাধনেতে সিদ্ধ হয়েছি।
ভক্তিভাবেতে কেঁদে প্রেমের ফাঁদে
অধর চাঁদকে ধরেছি।
অতি যত্ন করে রত্ননিধি
  হৃদয়মাঝে রেখেছি।
ঘুচায়ে মলামাটি হযেছি পরিপাটি

করিনে খুঁটিনাটি
খাঁটি পথে দাঁড়িয়েছি ॥

বাবু, এই অগ্‌গদ্বীপ খুব পবিত্রস্থান। এখানে ঘোষঠাকুরকে নিয়ে গুপিনাথের লীলা, এখানেই চরণচাঁদ তাঁর দীন দয়ালকে পেয়ে হন বাক্‌সিদ্ধ, এখানেই কুবিরের সাধনসিদ্ধি।

আমি সেই ঐশী মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গার দিকে চাইলাম। অস্তরাগ বিধুর অপরাহ্ন। সেই ম্লানতার বর্ণরঞ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেঙে-পড়া অগ্রদ্বীপের বিখ্যাত জমিদার হরি মল্লিকের বাড়ি। সে বাড়িও অস্তমুখী। আমি মনে উচ্চারণ করলাম দাশরথি রায়ের পদ :

ধরাধামে হরি মল্লিক বংশ ধন্য।
অগ্রদ্বীপ অগ্রগণ্য
যেথায় গোপীনাথের লীলা ॥

হঠাৎ অন্ধকার নেমে এল। আখড়াগুলোয় জ্বলে উঠল সাঁঝবাতি, লণ্ঠন আর হ্যাজাকেব আলো। চারি দিকে অসংখ্য মানুষের কথা বলার শব্দ, একতারা দোতাবা গুপিযন্ত্র আর বাঁয়ার শব্দ, মেলার ব্যাপারীদের চিৎকার, বাউল ফকিরদের শব্দগানের তান। কেবলই মনে হয়, এখন, এই অগ্রদ্বীপে প্রায় লক্ষ লোকের বসত, আর কালবাদে পরশু সকালে আম-বারুণীর স্নান সেরে সবাই ফুরুৎ। শুধু পড়ে থাকবে এই বিরাট মাঠের শূন্যতা, পশ্চিমের গঙ্গা, কয়েকটা গাছ, ভেঙে পড়া মল্লিক বাড়ির উদাসী রিক্ততা আর পাঁচশো বছরের কিংবদন্তী গুপিনাথ।

একটা আখড়ার আলোকে নিশানা করে এগোই। অন্ধকারে আর মানুষের চলমানতায় ভালো করে এগোনো যায় না। এখনও একাদশীর চাঁদটুকু ওঠেনি। রাত বাড়বার আগে একটা জুতসই আখড়া খুঁজে না নিলে সারা রাতের খাওয়া শোওয়ার খুব দিগদারি হবে। দেখা যাক সামনের আখড়ায় একটু নাক গলিয়ে, এই ভেবে ভিড় ঠেলে মানুষের কাঁধ ডিঙিয়ে ভেতরে তাকাই। ভেতরে গানের লড়াই হচ্ছে। আমি সোজা সেঁধিয়ে যাই একেবারে আসরের মাঝখানে। ভব্যিযুক্ত চেহারা দেখে একজন বলে ; 'বাবু বসুন'। আড় চোখে আমাকে দেখে নিয়ে গায়ক গেয়ে চলে :

জগতে ব্রহ্ম বস্তু সার।
এই ব্রহ্মা হতেই সৃষ্টি সবার।

তোমরা অন্য তত্ত্ব খুঁজো না॥

গানটা যখন সাঙ্গ হয়ে আসে তখন এই গায়কের যে প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক সে ধীরে সুস্থে পায়ে ঘুঙুর বাঁধে। তার পরে গান শেষ হতেই সবাই বলে, 'কি গানের তত্ত্ব কাটান দেবে নাকিন ?'

'দেব বৈকি। এ-সব গানের তত্ত্ব তো আমার কাছে শিশু। হাড়িরামের কৃপায় আমার ঝুলিতে গান কি একটা ?' মানুষটা সদর্পে বলে।

হাড়িরামের কৃপা ? একেবারে যাকে বলে কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি বুঝলাম নিশ্চিন্দিপুরের বিপ্রদাসের বাইরেও তা হলে হাড়িরামের গাহক আছে। 'কি নাম গাহকের ?' 'বাড়ি কোন্ গ্রামে ?' আমার প্রশ্নের জবাবে গাহক বলে : আজ্ঞে নিবাস বেতাই জিৎপুর। হাড়িরামের এই অধম সেবকের নাম রামদাস সরকার।'

এবারে একতারা কানের কাছে ধরে হেঁকে বলে রামদাস .

বলরামচন্দ্র হাড়ি গোঁসাই।
হাড় হাড্ডি মনি মগজ
তারকব্রহ্ম রামনারায়ণ।
জগৎপতি জগৎপিতা
হেউৎ মউতের কর্তা।
তুমি আমায় রক্ষা কর ॥

রামদাস এর পর আসরের সবাইকে উদ্দেশ করে বলে :

'রসিক শ্রোতাগণ আর আমার মরমী স্বাল্লাদার গাহক বন্ধু, আমি এবারে যে গানের তত্ত্ব করব তা আমাদের হাড়িরামের নিগূঢ় তত্ত্ব। এ আসরে এতক্ষণ তত্ত্ব করা হলো যে ব্রহ্মাই আসল। আর আমরা বলি,

আরে তা না, না, না, না, না, না, না, না।
শুনি এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি
সে কি কথার কথা হয় ?
হাড়িরাম অন্য কথা কয়।
শুনি ব্রহ্মা হন সৃজনকর্তা
বিষ্ণু হন পালনকর্তা
আর শিব হন সংহারকর্তা
তবে এক ব্রহ্মা কীসে কয় ?'

গানটি আরো যুক্তির পথে এ গিয়ে যখন শেষ হলো তখন সবাই বললে,

'বলিহারি। এ যে অকাট্য গান।'

রামদাস বললে, 'গান অকাট্য নয়। এ গানেরও কাটান আছে। তবে সে গান গেয়ে আমি নিজের গানের কাটান তো দেব না। আমি শুধু বলি আমাদের হাড়িরামের তত্ত্ব অকাট্য। তাই বলেছে—

হাড়িরামের তত্ত্ব নিগূঢ় অর্থ
বেদবেদান্ত ছাড়া।
এ তত্ত্ব জেনে নিমাই সন্ন্যাসী
এ তত্ত্ব জেনে শিব শ্মশানবাসী ॥

শ্রোতাগণ, তোমবা হাড়িরামের নামে বলিহারি দাও।'

সবাই বললে, 'বলিহারি বলিহারি বলিহারি।'

এ-সব সুযোগ সাধারণত আমি ছাড়ি না। আসর থেকে বামদাস যেই বাইরে বেরিয়েছে ধূমপান কবতে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে একটা ফাঁকা জাযগায় বসে পড়ি। ইতিমধ্যে আকাশে একাদশীব চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় রামদাস মানুষটার স্পষ্ট নিরিখ হয়। সরু খড়্গেব মতো নাক, নির্মেদ চেহারা, মাঝখানে সিঁথিকাটা চুল, চোখ-দুটি সুন্দব। এ-সব মানুষেব শরীর সম্পর্কে দুর্বলতা থাকেই। কথাটা তাই সেদিক থেকেই তুললাম, 'নাকটা তো তোমার বেশ লক্ষণযুক্ত। তোমার তো এত নীচে পড়ে থাকার কথা নয়।'

কথায় চিঁড়ে ভেজে। লাজুক হেসে রামদাস বলে, 'বাবু তবে ধবেছেন ঠিক। সবাই বলে আমাব মধ্যে সাধক লক্ষণ আছে। এই গরুড় নাসা ঐহিক মানুষের হয় না। আমাদের হাড়িরামের প্রধান শিষ্য তনু, তার এমন নাক ছিল। আপনি তনুর সম্পর্কে বাঁধা গান শুনেছেন?'

'শুনি নি তো?' আমি বললাম; 'আমি মেহেরপুরে গেছি, নিশ্চিন্দিপুরে গেছি। বিপ্রদাসের কাছে অনেক গান শুনেছি। এমন-কি তোমাদের হাড়িরামের সৃষ্টিতত্ত্ব পর্যন্ত জানি কিন্তু তনু সম্পর্কে গান তো শুনিনি।'

নিমেষে বামদাস গাইল:

ত্রেতাযুগে ছিল হনু
মেহেরাজে তার নাম তনু
পেয়ে পায়ের পদরেণু
চার যুগে সঙ্গে ফেরে।

হঠাৎ গান থামিয়ে রামদাস আকাশের দিকে চেয়ে প্রণাম সারল। তার পর বিড়

বিড় করে বলতে লাগল—

হাড়িরাম হাড়িরাম। স্বয়ং রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।

সীতাপতি হনুমানকে যেমন করে
করিলেন উৎপত্তি—
তেমনই নিজগুণে কৃপাদানে
এ অধমের করো গতি।
তুমি আমার মাতাপিতা তুমি আমার পতি
শ্রীচরণে করি এই মিনতি।
জয় হাড়িরামের জয়। জয় হাড়িরামের জয়
জয় হাড়িরামের জয়।

আমি এত দিন এত লোকধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু কারুদেরই প্রায় পুরোপুরি বাংলা মন্ত্র নেই। সব হ্রীং ক্লিং শ্লিং বোঝাই মন্ত্র। কেবল এই হাড়িরামের মন্ত্র সব দিক থেকে ব্যতিক্রম। এরা চলতি বাংলা ভাষায় মন্ত্র বানিয়েছে। তার উচ্চারণে তাই বিশ্বাসের জোরটাও শোনবার মতো। আমি রামদাসকে এই কথা ভেবে বললাম, 'তোমাদের মন্ত্রে সংস্কৃত নেই কেন?'

: এটা বুঝলেন না। সংস্কৃত তো বৈদিক ধর্মের ভাষা। আর হাড়িরামের তত্ত্ব বেদবেদান্ত ছাড়া। তার বাদে আরো যুক্তি আছে।

: কি রকম?

: আমরা তো অনুমানের সাধনা করি না। আমাদের সব বর্তমান। তো বাংলা ভাষা তো বর্তমান। এই তো আপনি-আমি তাইতেই কথা কইছি, নাকি বলেন? আর সংস্কৃতে কি কেউ কথা বলে? ওটা অনুমানের ভাষা।

চমৎকার অনুমান-বর্তমান তত্ত্বের একটা নতুন ভাষ্য পাওয়া গেল যা হোক। হাড়িরামের লোকেরা বেশ মেধাবী আর বিচারশীল দেখছি। তার একটা কারণ হলো এ সম্প্রদায় বহু দিন ধরে বৈষ্ণব আর বাউলদের থেকে আলাদা পথে চলেছে। পদে পদে তাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক লড়াই করে তবে হাড়িরাম তত্ত্বকে টেকাতে হয়েছে। এই যেমন আজকের শব্দগানের আসরে 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি' তত্ত্বটা রামদাস তাদের গানে চমৎকার কাটান দিল। অবশ্য আমি রামদাসকে সত্যি কথাটা বললাম না যে, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মা এক নয়। লৌকিক গাহকের অতখানি জ্ঞান থাকে না। তারা খানিকটা শব্দের ফেরে বা বাক্যের ধন্দেও পড়ে যায় কখনো কখনো। যাই হোক, আমার কাজ এখন রামদাসের পেট থেকে কথা বার করা। তাই প্রশ্ন তুললাম, 'রামদাস, তোমাদের ধর্মে তো

গুরু নেই।

কথা শেষ হবার আগেই রামদাস বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের গুরু নেই বাউল-বোষ্টমদেব মতো। আমাদের এক তত্ত্ব হাড়িরাম। সে আবার—

কোটি সমুদ্র গভীর অপার
যে জানে সে নিকট হয় তার
কলমেতে না পায় আকাব
শুদ্ধ রাগেই করণ ॥

তো সেই হাড়িরামের তত্ত্ব রাগের পথে জানতে হয়। বুঝতে হয় তিনিও যা আমিও তা। তবে তফাত আছে। তিনি কিঞ্চিৎ ঘন/আমি কিঞ্চিৎ কণ।'

: তার মানে ?

. তার মানে তিনি কিছুটা ঘন-গভীর আর আমি তার কণ মানে কণা। তবে তাই বলে নিতান্ত ফেলনা নই। হাড়িরামের মহিমা যে জেনেছে সে কি ফেলনা হতে পারে ?

আমি বললাম, 'তোমাকে যে কথাটা জিগ্যেস কববো ভাবছিলাম তা এই যে, তোমার তো গুরু নেই তা হলে এত কথা শিখলে কোথায় ?'

: আজ্ঞে হাড়িরামই বলাচ্ছেন। তাঁবই হেকমৎ। তবে হ্যাঁ, সঙ্গও করেছি বৈকি। আপনি তো নিশ্চিনপুরে গেছেন, সেখানে পূর্ণদাস হালদারকে দেখেছেন ?

: হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। অবশ্য তখনই তাঁর অনেক বয়েস।

: তিনি দেহ বেখেছেন। তো সেই পূর্ণ হালদারের সঙ্গে আমি অনেক ঘুরেছি সেই কোথায় কোথায়। ধাপাডা, ধোপট, পলশুণ্ডো, কোমখানা, হাঁসপুকুর, বান্নে, ফুলকলমী। সব ঘুরে ঘুরে কত তক্ক-বিতক্ক শুনেছি বোষ্টমদের সঙ্গে বাউলদের সঙ্গে। তার থেকেই আপ্তজ্ঞান হয়েছে। এখন আমিই বেশ তক্ক করতে পারি। একটা ঘটনা শুনবেন ?

: বলো।

: সাহেবনগবের ফণী দরবেশের নাম শুনেছেন তো ? তার ঘটনা। সেই সাহেবনগরের কাছে ভিতে এক বোস্টমদের আখড়া আছে। সেখানে একদিন তারক ব্রহ্ম নাম হচ্ছে। আমি তখন ফণী জ্যাঠার বাড়ি ক-দিন রয়েছি। তো জ্যাঠা বললে, 'চল্ নাম শুনে আসি। নামেই তো মুক্তি।' গেলাম দুজনে। নাম শুনলাম। তার পর বোষ্টমরা সব নিতে বসল সার বেঁধে, মালসাভোগ। আমরা তো বোষ্টমদের মালসাভোগ নেব না।

'কেন ?' আমার খটকা লাগল 'প্রসাদে আপত্তি কি ?'

'ও, আপনি বুঝি নিষেধবাক্য জানেন না ?' রামদাস খুব আত্মপ্রসাদ নিয়ে বলল, 'তবে খেয়াল রেখে শুনুন :

না করিব অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।
না করিব অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ ॥

ব্যাস্। সাফ কথা।

: তখন কি হলো ?

. যতই ওরা মালসাভোগের সেবা নিতে বলে ততই ফণী জ্যাঠা না না করে। আসল কথাটা, মানে হাড়িরামের নিষেধের কথা তো বলতে পারে না। পাছে ওবা আঘাত পায়। কিছুতেই শেষ পর্যন্ত পার পাই না আমরা। একজন বোষ্টম হুল ফুটিয়ে বললে, 'সেবা ধর্মে আপত্তি কিসের ? আমাদের ঘেন্না কবো ?' জ্যাঠা আব সামলাতে না পেবে বললে, 'কথাটা কি তুমি না বলিয়ে ছাড়বে না বাবাজী ? তবে শোন। প্রশ্ন হলো, সেবা তো নেব কিন্তু দেব কাকে ?' শুনে তো বাবাজী থ। বলে, 'বাপরে, তোমার কথার তো খুব ভাঁজ আছে ? চলো তোমাকে মোহান্তের কাছে নিয়ে যাই।' নিয়ে গেল আমাদের দুজনকে মোহান্তের কাছে। বাবু, মোহান্ত বোঝেন তো ?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তা বুঝি। মানে ঐ আখড়ার যিনি প্রধান বৈষ্ণবগুরু।'

রামদাস বললে, 'তাঁর কিন্তু খুব মান্যতা ! তেমনই চেহারা। একেবারে যাকে বলে কিনা ঘৃতপক্ক। সংসারের আঁচ তাঁর গায়ে লাগেনি। তাঁকে বাবাজী সব সাতকাহন করে তো বলল। তিনি সব শুনে হাসলেন, তার পর চাঁদির চশমা পরে খানিকক্ষণ জ্যাঠাকে নিরীক্ষণ করে পরিহাস করে বললেন, 'সাধনার পথে তুমি খানিক কাঁচা রয়েছ দেখছি। তা এই যে আমরা দুজন বসে আছি, আমাদের তফাত কোথায় ? দুজনেই তো মানুষ, ভক্ত, সেবক। তা হলে ?'

: তখন ফণী দরবেশ কি জবাব দিলে ?

: ও, সে মোক্ষম জবাব। বললে, 'আপনাতে আমাতে বসে আছি বটে, তবে অনেকটাই তফাত। কেমন তফাত শুনবেন ? আপনি বসে আছেন যে পাটিতে, তার ওপর রয়েছে ধোকরা, তার ওপরে কাঁথা, তার ওপরে চাদর। এত সব কিছুর ওপরে আপনি। আর আমি মাটিতে জন্মে এই মাটিতেই তো বসে আছি। আপনাতে আমাতে তফাত নেই ?'

: তারপর কি হলো ?

: মোহান্ত থম মেরে বসে রইলেন খানিক। তার পরে একটু পরে বললেন,

'যাই হোক, সেবা নেবে না কেন ? সেবা দেবার লোক পাচ্ছ না ? কেন ? পরমাত্মাকে সেবা দাও। কি ? জবাব নেই যে ? হেরে গেলে তো এবার ?' জ্যাঠা আমাকে টোকা মেরে বললে, 'কি রামদাস ? এ কথার কি জবাব হবে বলো দেখি ?' আমি হাড়িরামকে স্মরণ করে বললাম, 'মোহান্তজি, এই মালসাভোগ তো আপনার পরমাত্মাকে উৎসর্গ করেছেন, তো সেই এঁটো জিনিস কেন আমার পরমাত্মার সেবায় দেব বলুন ?' মোহান্ত চুপ। জ্যাঠা বললে, 'সাবাস রামদাস। বলিহারি। তুই হাড়িরামের মুখ রেখেছিস।'

একাদশীর রাত এমন একটা মোক্ষম তর্কসভার বিবরণ শুনে আমি তো রীতিমত শিহরিত। সত্যি কথা কোন্ ফুঁপি থেকে কোন্ কথা যে এসে পড়ে। হাড়িরামের সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণবদের যে এত আড়াআড়ি তা জানতাম না। ব্যাপারটা কৌতূহলজনক। আর একটু গভীরে যাবার জন্যে আমি রামদাসকে উস্‌কে দিয়ে বললাম, 'তোমার জ্ঞানবুদ্ধি তো ফণী দরবেশের চেয়েও পাকা মনে হয়। বলো দেখি বৈষ্ণবদের সঙ্গে তোমাদের প্রধান তফাত কি ?'

রামদাস বলে, 'ওদের পঞ্চতত্ত্ব, জপতপ আর তুলসীমালা। আমাদের ওসব নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আখড়াধারী বোষ্টমদের যা নিয়ে বাধে তা এই যে ওরা প্রকৃতির ছায়া মাড়ায় না আব আমরা গৃহী।'

আমি বললাম, 'প্রকৃতি সাধনা না করলে ক্ষতি কি ? নিষ্কাম ধর্ম নেই ?'

: আজ্ঞে, প্রকৃতিকে কি এড়ানো যায় ? নিষ্কাম বৈষ্ণবের কি স্বপ্নদোষ হয় না ? সে স্বপ্নদোষ কি প্রকৃতি দেখে হয়, না পুরুষ দেখে ? বাবু, আপনি কিন্তু আমাকে চটিয়ে পেটের কথা বার করছেন। আমি এবারে আপ্ত সাবধান হব কিন্তু।

আমি হেসে বললাম, 'যাঃ। বুঝে ফেলেছ । তা হলে এখন আর কথা নয়। কথা হবে আবার রাতে। এখন একটা গান শোনাও। কিন্তু তোমাদের হাড়িরামের গান নয়। ও গানে বড্ড তত্ত্বের কচকচি। তুমি অন্য গান গাও।'

রামদাস বলল, 'এমন একটা গান গাইছি যাতে আপনি বোষ্টমদের স্বরূপ বুঝে ফেলবেন খুব সহজে। শুনুন। এ গান আমাদের নয়, তবু আমরা গাই—

নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
সে শাক্ত ভারতীর কাছে শক্তি মন্ত্র লয়॥
পরে গিয়ে রামানন্দের কাছে
বাউল ধর্মের নিশানা খোঁজে
তবে তো মানুষ ভজে পরমতত্ত্ব পায়॥

বাউল এক চণ্ডীদাসে
মানুষের কথা প্রকাশে
সেই তত্ত্ব অবশেষে বৈষ্ণবেরা নেয় ॥
মর্কট বৈরাগী যারা
এক অক্ষরও পায় না তারা
গীতা ভাগবত শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত সবায় ॥
তিলক মালা কৌপীন আঁটার দল
জানে শুধু মালসা ভোগের ছল
দিন রাত কিছু না বুঝে মালা জপে যায় ॥

রামদাসের সঙ্গে আবার হাড়িরাম-বৈষ্ণব বিরোধের কথা তুললাম রাতের খাওয়া দাওয়ার অনেক পরে। তখন সমস্ত মেলাটা ঝিমিয়ে পড়েছে। রাত এগারটা হবে। অত্যুৎসাহী কয়েকটা আখড়ায় শুধু গান হচ্ছে। ও-সব বেশির ভাগ গেঁজেলদের আসর। তাদের গানে মাথামুণ্ডু থাকে না—অভিজ্ঞতায় দেখেছি। আসলে নিশিপোহালেই সব আখড়ায় অন্ন-মচ্ছব হবে। তার ব্যবস্থা করা কি চাট্টিখানি কথা ? তাই সবাই যথাসম্ভব বিশ্রাম আর ঘুম সেরে নিচ্ছে। আমার ঘুম নেই। মেলায় আমি ঘুমোতে পারি না। অগত্যা রামদাসকে ভর করি। সে ব'সে ব'সে হাড়িরামের নাম জপ করছে। সরাসরি বলি 'তোমার পেট থেকে কথা বার করবার জন্যে নয়, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি জানতে চাই বৈষ্ণবদের সঙ্গে তোমাদের এত বিরোধ কেন ? বোধ হয় হিংসে, নয় ? ওরা যে সংখ্যায় বেশি। তোমরা আর ক-জন ?'

রামদাস খুব বেদনাহত মুখে বলল, 'বাবু, আপনি জ্ঞানী মানুষ। সংখ্যা দিয়ে কি সত্য-মিথ্যার বিচার হয় কোনো দিন ? হয়তো মূলে কর্তা হাড়িরাম চন্দ্রের সঙ্গে সেকেলের বোষ্টমদের বেধেছিল। কোনো বিরোধ কি বাধতে পারে না ?'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে' আমি ভেবে বলি, 'প্রথমত বৈষ্ণবেরা দ্বৈতবাদী, তারা শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে মানে, নিজেরা থাকে ভক্ত হয়ে। আর তোমাদের ধর্ম অনেকটাই অদ্বৈতবাদী। হাড়িরাম তো নিজেকেই স্রষ্টা বলেছেন। এটা বৈষ্ণবেরা মানবে কেন ? তারা তো মানুষ ভজে না। তারা অবতারতত্ত্বে বিশ্বাসী। তারা কিছুতেই হাড়িরামকে অবতার বলে মানবে না ?'

'তবে আমরাও তাদের মানব কেন ?' রামদাস যেন বিদ্রোহীর মতো ফুঁসে ওঠে। 'ওসব তিলকমালা রসকলি চন্দনের ছাপ আর ডোর কৌপীনে কি ভগবান থাকে ? ওদের কাণ্ড তো জানি। মুখে বলে সব জাতি এক এদিকে বামনাই কি কিছু কম ? ওদের সব ভাগ আছে তা জানেন ? ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব,

নেমো বৈষ্ণব, টহলিয়া নানান ভাগ। তবে গৌরাঙ্গের মূল কথাটার মানে দাঁড়াল কি ? আচণ্ডাল কি ওদের এক ? তা হলে সহুজে বোষ্টমদের ওরা মানে না কেন ? আসল ব্যাপারটা কি জানেন, সব বিটলে বামুনদের কারসাজি।

. রামদাস গায় :

মানুষ মানুষ সবাই বলে
ও ভাই কে করে তার অন্বেষণ ?
পঞ্চম স্বরে মনের সুখে ডাকেন তারে ত্রিলোচন।

বাধা দিয়ে আমি বলি, 'এ গান আমি বিপ্রদাসের গলায় শুনেছি। এতে আব গোলমাল কোথায় ? এর তত্ত্ব খুব সোজা।'

অভিমানভরে রামদাস বলে, 'তবে ঐ গানের এ জায়গাটা শুনুন :

রাসলীলা হয় বৃন্দাবনে
জানে কোন ভাগ্যবানে
রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে
নাহি জানে গোপীগণ ॥

কিছু বুঝলেন ?'

: আলাদা করে কিছু বোঝবার আছে নাকি এখানে ?

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে রামদাস বলে, 'এই খানটায় আসল তত্ত্ব। বৈষ্ণবরা কীর্তন করে বৃন্দাবনলীলা। তাতে কৃষ্ণ রাধা গোপীগণ থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ মূলে যে বৃন্দাবনলীলা করেনই নি।'

: সে কি ?

: হ্যাঁ। ভেবে দেখুন, ব্রহ্মা সৃজনকর্তা। তাঁর স্থান আমাদের মস্তকে। বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা। তাঁর স্থান বক্ষে। শিব হলেন সংহারকর্তা। তাঁর স্থান লিঙ্গে। বৃন্দাবনলীলা কি বলুন তো বাবু ?

: সে কি যোনি-লিঙ্গে সঙ্গম ?

: বিলক্ষণ। তা হলে বক্ষস্থলে থেকে কৃষ্ণ কী করে বৃন্দাবনলীলা করেন ? করেন না। বৃন্দাবনলীলার আস্বাদ বা রূপ তবু কিঞ্চিৎ জানেন মহেশ্বর। কিন্তু কৃষ্ণ রাধা গোপীগণ বৃন্দাবনলীলার কি জানেন ? এইখানে বোষ্টমদের মস্তবড় ভুল। সে ভুল ধরিয়ে দেন আমাদের হাড়িরামচন্দ্র। কে বুঝিবে হাড়িরাম এ ভুবনে তব মহিমে ?

মাঝরাতের ভাঙ্গা চাঁদ যেমন, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে অগ্রদ্বীপের এই

মেলার মাঠের দিকে, আমি তেমনই অবাক হয়ে রামদাসের দিকে চেয়ে রইলাম। এতগুলো নির্বাচন, সবুজ বিপ্লব, পঞ্চায়েত, পারমাণবিক সন্ত্রাস, বৈদ্যুতিক কৃৎকৌশল, জন্মনিয়ন্ত্রণ, ক্যাসেটের সাম্রাজ্যবাদ এদের বিশ্বাসকে এতটুকুও টলাতে পারে নি ? মেলার এতগুলো মানুষের গাঢ় ঘুমন্ত শরীরে এমন গভীরভাবে মনও রয়েছে ঘুমিয়ে ? আমার তুলনায় এরা এতটাই স্পষ্ট আর পৃথক আরেক জগতের অধিবাসী ? সকাল হলেই এই বিপুল সংখ্যাধিক্য মানুষের জেগে ওঠার পর তাদের স্থির বিশ্বাসের অভিঘাতে আমি কতটা বিধ্বস্ত হয়ে যাব সেই আশঙ্কিত ভাবনায় মেলা ছেড়ে পালাই। কেবলই পালাই।

●

সেই পালানো আর এবারের এই গত চৈত্রে অগ্রদ্বীপ যাওয়া, মাঝখানে দশ বছর কখন খেয়ে গেছে। অবশ্য মাঝখানে একবার এসে দু-রাত্তির কাটিয়ে গেছি শরৎ ফকিরের সঙ্গে এই মাঠেই। কিন্তু এবার এসে কি দেখলাম ? চরণ পালের ঘরসমেত সেই বিরাট কদমগাছ আর তার চারপাশের অন্তত চল্লিশ বর্গগজ এলাকা একেবারে গঙ্গাগর্ভে।

হঠাৎ দেখলে একটু ধন্দ লাগে। ঠিক যে চত্বরে আগে এসে বসেছিলাম, যেখানটায় রামদাস বুঝিয়েছিল বৃন্দাবনলীলার রহস্য, সেখানটা জলের তলায় ? সাহেবধনী মত বা বলা হাড়ির ঘরও এই রকম করে সমাজের অতল তলে সুনিশ্চিতভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। তার মানে ক্রমশ মানুষ থেকে মানুষের ফুঁপি বার করা কঠিন হয়ে যাবে। ভাঙা মন জোড়া লাগিয়ে তবু আবার খুঁজি মানুষেরই সূত্র। প্রথমে এসে দাঁড়াই চরণ পালের আস্তানায়। ঘরটা তো নেই। করোগেটের টিন আর পলিথিনের ত্রিপল টাঙিয়ে টেম্পোরারি আস্তানা গেড়েছেন এবারকার সাহেবধনী ফকির। শরৎ ফকির দেহ রাখায় ইনিই এখন নতুন ফকির। বসেছেন ফকিরি দণ্ড বুকে নিয়ে শাদা চাদরের ঘোমটা টেনে, যা নিয়ম। বসেছেন নতুন কেনা পাটিতে। তাতে জমছে ভক্তদের ছুঁড়ে দেওয়া টাকা আধুলি সিকি দশ পয়সা আর নোটের রাশি। সম্বৎসরের রোজগার। হঠাৎ সেই করোগেটের টিনের পেছন থেকে বেরিয়ে আসেন সুতোষপাল। পুরনো আলাপী। ইনি চরণ পালেরই বংশ। তবে ফকিরি পথে নামেননি। সাহেবধনীদের মূল আসন বৃত্তিহুদাতেও থাকেন না। থাকেন নতুন গ্রামে। সেখানে দীনদয়ালের পূজা হয় বংশানুক্রমিক।

সুতোষবাবু বললেন, 'কি ব্যাপার ? হঠাৎ এত বছর পরে ? নতুন কোনো

গবেষণার সূত্র পেলেন বুঝি ?'

আমি বলি, 'লোকধর্মের গবেষণা তো অন্তহীন। এবারে এসেছি দেখতে অগ্রদ্বীপের মেলা দশ বছরে কতটা পালটালো। এখানে এসেই তো ব্যাপাব দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি। গঙ্গার ভাঙন এতটা ?'

: ফরাক্কার জল ছাড়ার ফল। ওপারে আরো বেশি ভাঙন হয়েছে বলে শুনেছি। আসুন। আমার তাঁবুতে জিনিসপত্র রাখুন। এখানেই দুটো সেবা হোক। কি বাজি ? বেশ বেশ।

অবশ্য তখনও তাঁবু তৈরি হয়নি। নিমেষে চারজন গ্রামীণ মানুষ চারটে বাঁশ পুঁতে তাতে পলিথিন সিট বেঁধে আচ্ছাদন করল। এবারে বসা দরকার। কিন্তু কিসে বসা হবে ? সঙ্গে সঙ্গে বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে একজন কিনে আনল একটা মাদুর। তাতে বসে আমার মনে হলো অগ্রদ্বীপে বেশ একটা বাউণ্ডুলে বোহেমিয়ান ভাব আছে। অর্থনীতিতে যাকে বলে' 'ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফেসিলিটি' তা এখানে কিছুনেই। শুধু কিছু মাটির হাঁড়ি কলসী আর জ্বালানির ডালপালা ছাড়া আর কিছু মেলে না। সবই তাই বয়ে আনতে হয়। অবস্থাটা বেশ মজার। যেমন সুতোষ পালের তাঁবুতে মাদুর পেতে বসেই বললাম, 'খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল পাওয়া যাবে ?'

সঙ্গে সঙ্গে একজন ছুটল টাকা নিয়ে। ফিরে এল একটা কলসী আর সরা কিনে। তাতে জল আনা হলো গঙ্গা থেকে। জল খেয়ে প্রাণটা বাঁচল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ সামনের মানুষটি, যার নাম রমজান, এগিয়ে দিল একখানা সদ্য কেনা হাতপাখা। বলল, 'এটা হুকুম হবার আগেই কিনে আনলাম। আপনি যা তোয়াজী মানুষ।' লজ্জা পেলাম। সুতোষবাবু বললেন, 'আজ অন্ন-মচ্ছব। তার এখন অনেক দেরি। কিছু খেতে হবে আপাতত, কি বলেন ?'

কি আর বলি ? মুখ ফুটে সে কথা কি জানান দেবার বয়স আছে আমার ?

'ওহে, মোজাম্মেল, কিছু আছে নাকি তোমার ?' সুতোষ পাল হাঁকলেন, দাও দেখি কিছু খেতে।'

: আজ্ঞে, আছে বৈকি। বাড়ি থেকে এনেছি টাটকা মুড়কি বানিয়ে আর ঢেঁকিতে কোটা চিঁড়ে। সেবা হোক বাবুদ্বয়।

আমি বললাম, 'বাঃ, দীনদয়াল ভালোই জোটালেন।'

শুকনো চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে তার পর একপেট গঙ্গাজল। আঃ খুশির উদ্‌গার উঠল একটা। রমজান বলল, 'বাবু যা খেলেন একেবারে সিমেন্টের ছল্যাব ঢালাই হয়ে গেল পেটের মধ্যে। বেলা দুটো পজ্জন্ত নিশ্চিন্তি।'

আমি হেসে তাদের কাজ দেখতে লাগলাম। চারজন মানুষ। রমজান,

মোজাম্মেল, ফড়িং আর বদন। সুতোষ পালের নতুন গ্রামের ধান-পাটের জমি ভাগে চাষ করে। এখানে তাদের না-আসলেও চলে। তবু আসে কেন? আমাকে চুপি সাড়ে বলে মোজাম্মেল, 'বাবু কেনাকাটায় গেছেন, এই ফাঁকে বলি, আসি বাবুর টানে। না এলে উনিতো এখানে খেতে শুতে বসতে পাবেন না। তাই আসা। এ তো একপুরুষের নয়। ওঁব বাবা তাঁর বাবা সব আমলেই কেউ-না কেউ আসবেই। আমাব বাবা চাচারাও আসত। সেটাই নিযম।'

: উনি যেখানেই যান সেখানেই তোমরা সঙ্গে যাও নাকি?

জিভ কেটে ফড়িং বলে, 'সব জায়গায় যাওয়া আব বগ্‌গদ্বীপ কি এক? এ হলো সিদ্ধ জায়গা। এখানকাব মহিমে মাহিত্ম্য আলাদা। সত্যি কথাটা তবে বলি বাবু। আমরা এই সুযোগে এসে দীনদযালেব অন্ন-মচ্ছবও একটু ভোগ করে যাই। এখানে তো হিন্দু মুসলমানে কোনো তফাত নেই। রগগদ্বীপে সবাই সমান। তুমি সব আখডা ঘুরে ঘুরে দ্যাখো। হিন্দু রাঁধছে বা মুসলমানে রাঁধছে আব সবাই গোল হযে বসে খাচ্ছে।'

: তোমাদের দুজনের নামে তো বোঝা যাচ্ছে মুসলমান। আর দুজন কি হিন্দু?

: আজ্ঞে ফড়িংটা হির্দু আর বদনটা মুসলমান। বদন বিশ্বেস। ভালো কথা হ্যাঁরে ফড়িং, তোর ভালো নামডা কি বে?

: ফড়িং জাঁক করে বলে, 'আমার নাম গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল।'

'বাপরে, নামের দাপ আছে' বদন বলে, 'তোর ফড়িং নামটাই ভালো। যেমন ধাবা চেহারা তেমন নাম।'

ফড়িং বলল, 'বদ্‌না, তোব বাপের নাম মদনা। তুই আমার মাঠে যাবার বদনা।'

'এই এখানে অশৈল কথা রাখ্,' মোজাম্মেল বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই শাসন করে, 'কাজ কর্। হাত চালা। তোদের কোনো কাঁক কাঁকর জ্ঞেয়ান নেই। রগ্‌গদ্বীপে এসেও মুখখিস্তি। মাটি কাট্।'

বসে বসে দেখি, কোদাল দিয়ে প্রথমে লম্বা করে ড্রেনের মতো মাটি কাটা হলো। তাতে পাশাপাশি তিনটে নতুন হাঁড়ি বসিয়ে দেখে নিল ঠিক মতো কাটা হয়েছে কিনা। রমজান বলল, 'বাবু, একে বলে জোল। ওপরে হাঁড়ি থাকবে, নীচ থেকে অড়র গাছের পালা দিয়ে জ্বাল হবে।'

আমি বললাম, 'একটা জোল কত বড় হতে পারে? মানে সবচেয়ে বেশি কটা হাঁড়ি ধরে?'

: ধরুন দশটা। সারা দিনমান আছেন তো? একটু পরেই দেখতে পাবেন

চরণ পালের আখড়াব জোল কাটা হবে। পর পর চারখানা পাশাপাশি। একেবারে চল্লিশখানা হাঁড়ি বসবে। দীনদয়ালের অন্ন-মচ্ছব। তার প্রসাদ এখানকার সব্বাই এট্যাসখানি পাবে। সে পেসাদ রান্নার মাহিত্যও আলাদা আমরা পারব না।

: কেন ?

: শরীলে শক্তি চাই। মনে ভক্তি চাই। চাই দীনদয়ালের কৃপা।

: কারা রাঁধবে ?

: সেই চরণ পালের আমল থেকে হয়ে আসছে একই ধারা। দেবগ্রামের কাছে একটা গেরাম আছে কমলরাটি। সেখানকার ভক্তরা দীনদয়ালের অন্ন-মচ্ছব পাক করে চিরকাল। ওদের ওপর গোপ্তা বাবাজীর কৃপা আছে।

: কি রকম ?

: বাবু, বললে বিশ্বাস কববেন না। ঐ সব পাঁচ সের চালের বড় বড গরম ফুটন্ত হাঁড়ি ওরা কোনো ন্যাকড়া ন্যাতা না নিয়ে শুধু হাতে নামিযে ফেলে।

: গরম তাত ছ্যাঁকা লাগে না ?

: আশ্চর্যি। একটুও গরম লাগে না। অথচ দেখবেন আমবা যখন এখানে রাঁধব। মেটে হাঁড়ি তেতে একসা হয়ে যাবে।

অবাক লাগে শুনে। এর আগে অগ্রদ্বীপ এসেছি অথচ এসব শুনি নি। শুনি নি, কেননা তখন ছিলাম শরৎ ফকিরের অভিজাত সঙ্গসুখে। একেবারে মাটির মানুষের সঙ্গে না মিশলে তো মাটির খবর মেলে না। এই যে চারটে অজ্ঞমূর্খ কৃষিজীবী আমার সামনে কথা বলে যাচ্ছে আবার হাতের নিপুণতায় কেটে যাচ্ছে জোল, আরও নানা গর্ত, সানুপুঙ্খ নানা নেপথ্য বিধান নীরবে ঘটাচ্ছে এই সব দীনদয়ালের দীনাতিদীন সেবকদের অংশগ্রহণেই আসল মেলা জমে ওঠে। দেখছি তিনটে গর্ত কেটে তারা নিকিয়ে নেয় সুন্দরভাবে। আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাই, তিনটে গর্ত কি হবে ?'

: আজ্ঞে, একটায় ভাত, একটায় তরকারি।

: সে কি ? গর্তে রাখবে ? কাদা লেগে যাবে না ?

: কিচ্ছু হবে না। এ তো রাঢ়ের মাটি। একেবারে পাথর। তার ওপর দীনদয়ালের মাহিত্য। খাওয়ার সময় ধরতেই পারবেন না।

বদন গর্ত তিনটে নিকোয়। ফড়িং তাতে হলুদ-গুঁড়ো ছিটোয়। হলুদ গুঁড়ো কেন ? বদন বলে, মাটির দোষ কেটে যাবে।

শ্রমক্লান্ত মানুষগুলি এবার একটু বসে। তাদের গা দিয়ে কুল কুল করে ঘাম ছোটে। গামছা দিয়ে মোছে আবার গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খায়।

গঙ্গার দিকে মুখ করে দুজনে বসি এক অতি প্রাচীন বটগাছ তলায়। এদিকটায় মেলায় যাত্রী বেশ কম। একটু ফাঁকা ফাঁকা। আমি সুতোষ পালকে বললাম, 'আপনি তো উচ্চশিক্ষিত মানুষ। এখানে বছর বছর আসেন কিসের টানে ?'

: বলতে পারেন এটা আমাদের পাবিবারিক দাযিত্ব। আমবা সরাসবি চরণ পালের বংশ। এখানকার অন্ন-মচ্ছবে থাকাটা আমাদেব কর্তব্য। যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোগ বাগ হয়, সবাই সেবা পায়, এ-সব তো দেখতে হবে ? তাছাড়া আমাব বাবাব আদেশ। বাবা তো আসতেন ! তাঁব অবর্তমানে আমিই আসি। মনে খুব শান্তি পাই। আবার মোজাম্মেল রমজানরাও খানিকটা তাডিয়ে আনে। ওবা চোতমাস পডলেই ভ্যানব ভ্যানর কবতে থাকে, 'বাবু, যাবেন তো বগ্‌গদ্বীপ ?'

. আচ্ছা, ওদের এত কেন উৎসাহ বলুন তো ? ওবা তো আপনাদের মতো দীনদযালেব সাধক নয়, শিষ্যও নয।

: এ বহস্য বোঝা শক্ত। এখানে কি একটা আছে। একটা টান। ধর্ম টর্মের ব্যাপাব খুব গৌণ। ওবা দারুণ কষ্ট কবে আসে। ভুত-খাটুনি খাটে। জোল কেটে বান্না করে। আবাব সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিযে ফেবে। তবু আসে। বলে, 'বাবু, দীনদয়ালের অন্ন-মচ্ছব না সেবা করলে মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।' এ সব কি যুক্তি দিয়ে বোঝা যাবে ?

আমি জিগ্যেস করি, 'আপনাদের বাড়িতে তো দীনদয়ালের আসন আছে। তার পুজো কে করে ?'

: সাধারণত দাদা করেন। ছুটিছাটায় স্কুল বন্ধ থাকলে আমিও করি। তবে বেস্পতিবারে আমাদের বিশেষ পুজো। আর দশুই চৈত্র আমাদের দীনদয়ালের বিশেষ প্রসাদ ভোগ। সেদিন তাঁকে পাঁচ সিকের মিষ্টি নিবেদন করি। সেটাই নিয়ম। পাঁচ সিকে, তার বেশিও নও কম নয়।

: আচ্ছা কোনো শিষ্য যদি কোনোদিন কিছু নিবেদন করে ?

: হ্যাঁ, আর মান্‌সার জিনিস আমরা নিবেদন করে দিই।

: সাধারণত কি তারা দেয় ?

: জল মিষ্টি কি পায়েস। কি সাধারণ চিঁড়ে দই সন্দেশ। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। কেউ কেউ মাংস পরটাও দেয়।

: 'মাংস পরোটা ?' আমার অভিজ্ঞতাও এবারে টাল খায়। কোনো লৌকিক দেবতাকে মাংস পরোটা উৎসর্গ করার কথা কখনও শুনিনি। তবে কি এর পেছনে কোনো ইসলামী বিশ্বাস কাজ করে ? সাহেবধনীর 'সাহেব' তো স্পষ্টই ইসলামী অনুষঙ্গ আনে। সন্দেহটা সুতোষবাবুকে জিগ্যেস করতেই বলেন,

মুসলমান ধর্মের ভালমতো প্রভাব আছে আমাদের ঘরে। মুসলমান শিষ্যও তো আমাদের ঘরে বহুজন। আসলে এ-সব হিন্দু-মুসলমানে মিলে গড়েছিল মনে হয়।'

আমি জানতে চাই, 'আচ্ছা, আপনাদের নিত্যপুজোয় এমন কি কিছু লক্ষ্য করেছেন যা মুসলমানদের ধর্মাচরণের সঙ্গে মেলে ?'

: তা হলে শুনুন। আমাদের ঠাকুরঘরে দীনদয়ালের শয্যা আছে। তাতে মশারিও থাকে। দীনদয়ালেব সব কিছু দক্ষিণমুখো আর আমরা তাঁর পুজো করি পশ্চিম দিকে মুখ কবে। এ রীতি কি মুসলমানী নয় ?

: হ্যাঁ। ঠিক তাই। আচ্ছা, আপনাদেব রোজকার কৃত্য কি কি ? ঠাকুরঘবে ?

প্রতিদিন দীনদয়ালের হুঁকো আব লাঠি তেল জল মাখিয়ে স্নান করাতে হয়। দীনদয়ালের নিত্যভোগ হলো চাল মিষ্টি পান আর জল। তার পবে কলকেতে তামাক ধবিযে হুঁকোয কবে নিবেদন। ঠিক যেমন একজন মানুষকে দেওয়া হয আর কি ! তবে কলকের আগুন ধবাবার সময় ফুঁ দিতে মানা। আলোচনার মাঝখানে বদন এসে বলল, 'বাবু, আপনাব ডাক পড়েছে। যান।'

: কিসের ডাক ?

: চলুন। ঐ দিকে ঐ চবণ পালেব আখড়ায় যে জোল কাটা হয়েছে তাতে আগুন জ্বালা হবে এবার। আমাদের গিযে দাঁড়াতে হয়। সেটাই রীতি।

সত্যি দেখবার মতো দৃশ্য। পর পর চাবটে লম্বা জোল কাটা। তাতে চল্লিশটা হাঁড়ি বসানো। পাল-বংশেব নানা শরিকের যে ক-জন অগ্রদ্বীপে আছেন সবাই দাঁড়ালেন পর পর। কমলবাটিব রাঁধুনীরা হাত জোড় করে দীনদয়ালের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ চাইলেন। তাদেব হাতে দেওয়া হলো পান সিঁদুর তেল সন্দেশ। সেগুলো জোলের পাশে বেখে সবাই জোলকে গড় হয়ে প্রণাম জানাল। একজন চেঁচিয়ে উঠল :

> প্রেম কহো রাধাকৃষ্ণ বলিয়ে।
> প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত
> শ্রীরূপ রঘুনাথ কবিরাজ গোঁসাই
> অটলবিহারী করোয়াধারী কইয়ে সাধু
> মধুরস বাণী। দীনদয়ালের নামে একবার হরি হরি বলো।
> সমস্বরে সবাই বলল : 'হরিবোল'।
> বাবা চরণ পালের নামে একবার
> হরি হরি বলো

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'হরিবোল'।

ব্যাস। অগ্নি সংযোগ হলো চারটে জোলে। শুরু হলো অন্ন-মচ্ছব। 'যাতে কোনো বিঘ্ন না হয়। যাতে ঝড় জল না হয়ে সবাই অন্ন-মচ্ছব সেবা করে। যাতে পাক ঠিক হয়। এই-সব ভেবে এই অনুষ্ঠান। বুঝলেন তো?' সুতোষ পাল বোঝালেন।

আমি বললাম, 'এ সব রান্না শেষ হয়ে অন্ন-মচ্ছব হবে কখন?

: বেলা গড়াবে। তার আগে আমার তাঁবুতে দুটো মাছ ভাত খেয়ে নেবেন সকাল সকাল।

'তার আগে আমি বরং একটু চার দিক ঘুরে আসি' আমি বললাম, 'চিঁড়ে মুড়কির স্ল্যাব একটু তাতে যদি কমে!'

ঘুরতে ঘুরতে দেখি এক এক গাছতলায় এক এক আখড়া। কোথাও গান হচ্ছে। কোথাও কুটনো কোটা আর বান্নার আয়োজন। কোথাও খাঁটি বৈষ্ণব মতে চার দিকে কাপড় ঘিরে মালসা ভোগ নিবেদন হচ্ছে, বাইরে চলছে কীর্তন। কোথাও মানুষজন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একটা আখড়ার বাইরে ছোট কাঠের উনুনে একজন মধ্যবয়সী বিধবা হাঁড়িতে কি রাঁধছে আর বাঁখারি দিয়ে নাড়ছে। আমি তাকে বললাম, 'বাখারি কেন গো মাসী, হাতা নেই?' স্নেহের তিরস্কার কণ্ঠে ঢেলে মাসী বললে, 'ও ছেলে, তুমি রগ্‌গদ্বীপের নিয়ম জানো না বুঝি? এখানে হাতাখুন্তি চলে না। বাঁখারি দিয়ে নাড়াঘাঁটা আর মুচি কি ভাঁড় দিয়ে পাতে দেওয়া।' হাঁড়িতে কি রান্না হচ্ছে বোঝা শক্ত। টগবগ করে ফুটছে। ফোটার চাপে হাঁড়ির মুখে উঠে আসছে চাল ডাল বেগুন সীম আলু মুলো পটল। আশ্চর্য ব্যাপার তো? 'কী রান্না এটা?' মাসীকে জিগ্যেস না করে পারলাম না।

: ও ছেলে, তুমি তো শিক্ষিত-মানুষ। দেখে বুঝলে না? একে বলে জগাখিচুড়ি। এই নাকি জগাখিচুড়ি? কখনও চোখে দেখি নি, শুধু নাম শুনেছি। জগাখিচুড়ি তা হলে একটা 'ব্যাপার' নয় রীতিমতো একটা খাদ্য? মাসীকে বলি, 'তোমাদের নিবাস কোথায়?'

: ভোলাভাডা চেন? সেখানে নেমে যেতে হয় নাংলা পোদ্‌মো। সেখানে আমাদের গুরুপাট। গুরুর নাম রাখাল ফকির। ঐ দ্যাখো বসে রয়েছেন।

ফকিরের কোঁকড়া চুল। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। পরনে ধুতি আর টেরিকটনের শার্ট। মৌজ করে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। আমাকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে আবার সিগারেট টানতে লাগলেন। আমি আখড়ার বাইরে যেখানে অন্য একদলের রান্না হচ্ছে এক বিরাট কড়ায় সেখানে দাঁড়াই। কড়াতে করে খিচুড়ি পাক করছে যে বলিষ্ঠ মানুষ তার মাথায় বাবড়ি আর পরনে ঘন নীল ফতয়া।

সারা মুখ পান খেয়ে লাল। নাম জিগ্যেস করতে বলল, 'সতীশ ভুগ্‌লে।'

ভুগ্‌লে আবার কি পদবী ?

আজ্ঞে আমবা জাতে গোয়ালা। আমাদের অনেক খারাপ নামে ডাকে লোকে। কেউ বলে ভেমো গোয়ালা, কেউ বলে ভুগ্‌লে।

কি কবো ? জাত ব্যবসা ?

আজ্ঞে না, আমি গো-বদ্যি।

অগ্রদ্বীপে কি সব জাত, সব বৃত্তির লোকই আসে নাকি ?

আজ্ঞে। ছত্রিক জাত আর সব ব্যবসার মানুষ। ঐ দেখুন ঐ পাশের আখডার মনিষ্যিরা মাছ-মারা জেলে আর নিকিড়ি।

জেলে আব নিকিড়ি আলাদা নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দুজনবাই মাছ ধরে। তবে জেলেবা হিন্দু আব নিকিরি মুসলমান।

ভাবলাম, শেখবাব কি শেষ আছে ? এ সব মেলার কত কি দেখা কত কি জানা। সভ্যতাব ঊষাযুগে মানুষ বোধ হয় জোল কেটে রাঁধত, এমনই গর্ত কেটে তাতে খাদ্য রাখত। ষোড়শ শতকে লেখা মুকুন্দ রামের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ফুল্লবাব যে অন্ত্যজ জীবনের খবর আছে তাতে পড়েছি—'আমানি খবার গর্ত দ্যাখো বিদ্যমান।' গরিব মানুষ বাড়ির দাওয়ায় গর্ত খুঁড়ে তাতে ভাত আমানি খেত। তাবই একটা ধাবা হয়তো অগ্রদ্বীপের মেলায় ভিন্ন রূপে রয়ে গেছে। এ মেলার বযস তো কিংবদন্তী অনুসারে পাঁচশো বছর। খুব কঠোরভাবে ইতিহাস মানলেও তিনশো বছরের কম নয়।

চিন্তায় বাধা পড়ল কেননা মাথায় পাতার মুকুট গলায় ফুলের মালা পরা এক মহিলা আচম্বিতে আমার সামনে এসে গালে মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ওরে আমার সোনামানিক, ওরে আমার আশমানের তারা।' তার পরেই রীতিমতো সুরেলা গলার গান :

> বাহারে খবর আসে তারে তারে তারেতে
> এ তার নহে সে তার ভাই যে তার মিশে তারেতে।
> পুবে মুগুর মারলে তারে পশ্চিমে এসে উত্তর করে
> সে কি তারের তার তারে কহ শুধায় তারেতে।

এমন আকস্মিকতায় খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মহিলা যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনই চলে গেলেন। তবে যাবার সময় পাছা দোলালেন এতটাই অভব্য রকমের যে বোঝা গেল তার মাথার গণ্ডগোল আছে। সেটা জানতেই অস্বস্তি কেটে গেল। গো-বদ্যি সতীশ বললে ; 'উনি হলেন নছরত বিবি।

ফাজিল নগরে ওনার সাকিন। মাথার ব্যামো।'

: তুমি চিনলে কি করে ?

: আমি গো-বদ্যি মানুষ চিনব না ?

কথার বৈপরীত্যে হাসি এসে গেল আমার। গো-বদ্যিব কাজ কি মানুষ চেনা না গরু চেনা ? আমার হাসিতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সতীশ বলল : 'আপনি হাসছেন কিন্তু কথাডা সইত্যি। গো-বদ্যিকে কাঁহা কাঁহা যেতে হয় আপনি ভাবতে পারেন ? যেখানে গো-মাতার ব্যাধি সেখানেই ডাক পড়ে। মানুষজন ঐ জইন্যে আমার অত চেনা। আসল বিত্তান্ত হলো, গো-বদ্যি চেনে মানুষ আব শকুন চেনে গো-বদ্যিকে। একা পেলেই ঠোকব মাবে। গো-বদ্যির সঙ্গে শকুনের চেব জীবনের আড়াআড়ি।'

ভারি অদ্ভুত কথা যা হোক। তাই বিস্ময় মেনে জানতে চাই, 'ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝলাম না শকুন কেন তোমায় ঠোকবাবে ?'

: এডা আর বুঝলেন না ? খুব সরল কথা। ধবেন, মবা গরু হলো শকুনের আহার। তা গো-বদ্যির চিকিচ্ছেয যদি গরু ভালো থাকে, ব্যাধি সেবে যায, তবে শকুনের খাদ্যে টান পড়ে। সে তাই গো-বদ্যি দেখলেই ঠোক্কব দেয়। মাথার ওপরে বেলান্ত পাক মাবে। এবাবে বুঝলেন ?

বুঝলাম, এরা নয, হযতো আমিই এক স্পষ্ট পৃথক জগতেব অধিবাসী। সে কি আমাব একার মুদ্রাদোষে ? এমন কেন হয় ? কেন কেবলই শুদ্ধ যুক্তি মানি ? কেন সব তাতে আনন্দ খুঁজে পাই না ? সেই জন্যে হয়তো লৌকিকের মধ্যে কখনো অলৌকিক পাব না আমি। এক দমবন্ধ করা অসহায়তা থেকে বাঁচতে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিগ্যেস করি, 'সতীশ, ঐ নছ্র্বত বিবির মাথা খারাপ হলো কেন ?'

. বাবু, সে খুব দুঃখের কথা। নছরত এক ফকিরকে ভালোবাসত। সেই ফকির ছিল ভণ্ড। তার ছিল গুপ্ত রোগ। সেই রোগ থেকে নছরত পাগল হয়ে গেছে।

মনে পড়ল বাউল-ফকিরদের জীবনের এই দিকটা সম্পর্কে এলা ফকির আমাকে প্রথম অবহিত করেছিল বহুদিন আগে। তাদের মধ্যে সফলতা নাকি খুব কম। বেশির ভাগ বাউল ফকির ভ্রষ্ট কিংবা ভণ্ড। প্রকৃতিভজনে একটু এদিক-ওদিক হলেই পতন। তাকেই বলে 'দশমীদ্বারে কুলুপ'। এলা ফকির বুদ্ধু শা-র একটা মারফতী গানের দু লাইন শুনিয়েছিল :

কলেমার তলায় বন্ধ এ. ঘর
খুলবে না চাবি বেগড়
খুলেছে যে বুদ্ধু দুয়াব

গুরুজির চাবিতে।

গানটা শুনিয়ে এলা বলেছিলেন, 'কলেমা বা শরীয়তী মতে আবদ্ধ থাকলে তবু মুক্তি ঘটতে পারে গুরুকৃপায় মারফতী পথে। কিন্তু দশমীদ্বারে কুলুপ পড়লে সে আর খোলে না। এর বাইরে আর এক পতন দমের কাজে ভুল হলে।'

'সেটা কেমন ভুল?' আমি জানতে চেয়েছিলাম।

এলা বলেছিলেন, 'কাদেরিয়া সুফীঘরের ফকির যারা তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের অনেক কাজ শিখতে হয়। তাকে বলে দমের কাজ। ঠিকমতো জান্‌নেওয়ালা মুরিদ মুর্শিদ না ধরে দমের কাজ করলে মাথা খারাপ হবেই। কেননা বায়ু ঠিক জায়গায় না গিয়ে মাথায় ভর কবরে। বায়ুর দাপ খুব সাংঘাতিক জিনিস।'

এলা ফকিরের এই কথা মিলিয়ে দেখেছি পরে। একেবারে হদিশ বাক্যের মতো নির্ভুল। সেবার পলাশীপাড়ায় জীবন ফকিরের বাড়ি মচ্ছব হচ্ছিল পয়লা বৈশাখ। রাতে বসল মারফতী গানেব আসর। কুলগাছি গ্রামের তরুণ গাযক সুকুবদ্দি আর মুর্শিদাবাদ জেলার একচেটিয়া গায়ক বিখ্যাত ইয়ুসুফের গানেব পাল্লা পাল্লি। দারুণ ফকিবি তত্ত্ব। ইয়ুসুফ মধ্যরাতে গাইলে :

একে শুন্যি দিলে দশ হয়
এ কথা তো মিথ্যা নয়।
দুয়ে আটে মিলন হলে
নোক্তা পরে দশ হয় ॥
সেই নোক্তা দশ ঠাঁই
হয়ে আছে আটে তারাই
আট আর দশে আঠারো ভাই
মোকাম করে খোদায় ॥

গান শেষ হলে সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। কেননা সুকুরুদ্দি পায়ে ঘুঙুর বাঁধে নি। অর্থাৎ সে আর আসরে উঠবে না। কেননা ইয়ুসুফের এ গানের কাটান সে দিতে অক্ষম। লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল। মারফতী গায়কের কাছে এ হারের বেদনা বড় গভীর। তার সাধন পথের ভিত যে কাঁচা রয়ে গেছে আসরের সবাই তা জানল। তবে সুকুরুদ্দিনের একমাত্র সান্ত্বনা যে যোগ্যতমের কাছে হেরেছে। তবু তো হার?

'আসরে কেউ আছ নাকিন যে এ গানের জবাব দেবে?' একজন হাঁক পাড়ল।

আসরের-মাঝখানে-বসা বৃদ্ধ জীবন ফকির বলল,'এ দিগরে এমন গানের জবাব একমাত্র দিতে পারত এজমালি শা। তা ঐ দ্যাখো তার দশা।'

ফকির আবু তাহের আমার পাশে বসেছিলেন। তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন ব্যথাতুর মুখে। দেখলাম আসরের ঠিক বাইরে, যেখানে হ্যাজাকের আলো ভালোমতো যাচ্ছে না, সেই প্রায়ান্ধকারে খাড়া ছ-ফুট এক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পবনে কালো আদ্দির নক্সাদার জীর্ণ কুর্তা আর পাজামা। এক মুখ সাদা দাড়িগোঁফ। মাথায় টুপি। আর বুকে ঝোলানো অন্তত কুড়িখানা মেডেল। শুধু চোখ-দুটি শূন্য। হাতে একখানা ভাঙা একতারা। মর্মন্তুদ দৃশ্য।

আবু তাহের বললেন, 'এজমালি শা। এত বড় এলেমদার গাহক আমরা কেউ দেখি নি। ওদিকে মুর্শিদাবাদ-রাজসাহী, এদিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদ কাঁপিয়ে দিত গানে। কেউ পারত না গানের পাল্লাদারিতে। শুধু লালনের গান নয়, এজমালি জানত পাঞ্জু শা-র গান, হাউড়ের গান। জানেন তো সে-সব গানের তত্ত্ব কত কঠিন?'

: কি করে মাথার গোলমাল হলো?

: ছিল আমাদের মতো বুদ্ধু শা-র ঘরের মাবফতী। যশোরে গিয়ে পড়ল এক কদেরিয়া সুফীর পাল্লায়। তাদের সব কঠিন কঠিন দমের কাজ। এখানে বসে নিশিরাতে একা একা সে-সব দমের কাজ অব্যেস করত আর জিকির দিত। ব্যস, বায়ু সব মাথায় উঠে গেল। নিশ্চয়ই কায়দার ভুল ছিল কোথাও। তাল রাখতে পারল না। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেল। আমাদেরই বয়সী। দোস্ত। এখন আর গান মনে করতে পারে না। কেবল ফকিরি গানের আসর বসলে বুকে ঐ-সব মেডেল ঝুলিয়ে গিয়ে হাজির হয়। আমরা সইতে পারি নে।

আমার মনটা ব্যথায় ভরে গিয়েছিল এ-সব শুনে। ঐ মেডেলগুলো সে রাতে কঠিন অভিশাপের মতো ঝক ঝক করছিল। মনের মানুষ খোঁজার নিঃসঙ্গ পথটি অনেক সময় প্রতারণা করে তা হলে এমন ভাবেও?

খানিকটা বিষাদ নিয়েই যেন সুতোষ পালের তাঁবুতে ফিরলাম। নছরত বিবিকে চাক্ষুষ দেখে আর এজমালি শা-র কথা মনে পড়ায় হঠাৎ অগ্রদ্বীপের সমস্ত আয়োজন, উল্লাস, উদ্দীপনা খুব ম্লান হয়ে এল যেন। এমনই হয়। সফলতার সব চেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্তে সব চেয়ে করুণ ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। তবু কি আশ্চর্য, মনের ম্লানতা আসে মানুষের কথা ভেবে, অথচ সে ম্লানতা কাটিয়ে দেয় অন্য এক মানুষ। যেমন ঘটালো মোজাম্মেল রমজান, বদন আর ফড়িং। এরা কেউ এলেমদার নয়। লেখাপড়াই জানে না। 'মুরুখ্যু চাষা' নিজেরাই নিজেদের বলে। অথচ জীবনের কবোষ্ণ তাপে ঝকমক করছে। একটু আগে গয়না আর খুঁদ কুঁড়োর গান কেমন নেচেকুঁদে গেয়েছিল আর এখন তিন পদ আহার্য রেঁধে ফেলেছে দিব্যি। আমি তাঁবুতে ঢুকতেই সব হৈ-চৈ ফেলে দিল।

খাওয়ার জন্য উপরোধ। পাটির ওপর কলার পাতা, মাটির গেলাসে জল। গরম ভাত, ডাল আর পটল দিয়ে চারামাছের ঝোল। ধোঁয়া উঠছে। সুতোষ বাবু খেতে শুরু করলেন। আমার তখনও গুমোট কাটেনি। দু দণ্ড বসে নিচ্ছি। মোজাম্মেল বলল, 'বাবুর কি ভাব নেগেচে ? লক্ষণে যেন তাই মনে নেয় ? নেশা তো নেই। নইলে বলতাম একটা বিড়ি ধরাতে। এ সময় বিড়ি খেলে ঝিম কেটে যায়।'

রমজান বললে, 'তুই তো সব তাতে বিড়ির সালিশ করিস্। বিড়ি কি তোর কব্বরেও যাবে নাকি ?'

মোজাম্মেল বলে, 'বাবু, একবার কি হয়েছিল জানেন ? কব্বর বলতে মনে পড়ল। তখন আমার সবে নিকে হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি গেচি। সম্পর্কে আমার এক দাদাশ্বশুরের এন্তেকাল হযেছে। সবাই গেছি কব্বরস্থানে। হঠাৎ আমি বলে বসলাম, 'লাসের সঙ্গে দু তাড়া বিড়ি দিয়ে দাও। মানুষটা খাবে কি ?' কী কাণ্ড। বলে ফেলেই কী লজ্জা। দিলাম ছুট।'

রমজান বলল, 'বাবু, মোজাম্মেল যখন দুঃখ্যু পায় মনে, তখন কি বলে জানেন ? বলে হে ধ্বরনী দ্বিধা হও, দু তাড়া বিড়ি নিয়ে ঢুকে যাই। ব্যাটা মহা রস্‌কে।'

আনন্দ করে বসিকতা করে বমজানবা কখন আমাব মনের বাষ্প কাটিয়ে দিল কে জানে ? খাওযা-দাওয়ার শেষে মনটা বেশ হাল্‌কা বোধ হলো। আমি তাঁবুর বাইরে রমজানদের খাওয়া দেখতে লাগলাম একটা ছালায় বসে। 'কেমন খাচ্ছ ?' প্রশ্নের জবাবে ফড়িং বলল, 'চালটা বড চিকন। এ হলো বাবুদের চাল, এ-সব আমাদের মতো কাবুদের চলে না।' বমজান বলল, 'বাবু আমাদের মুসলমানী রান্না। ঝাল বেশি। কেমন খেলেন ?' বদন বললে, 'হেঁদুরা খাবার কি বোঝে ? তাই জিগাও। ওরা খায় সুক্তো ঝোল আর সেদ্ধ। থোড়, কচু আর ডুমুর। গোস্ ছাড়া খাওয়া হয় ? মশল্লা ছাড়া রান্নার সুতার হয় ?' ফড়িং বলে, 'সেই হেঁদুর রান্না খাবার জ্বালায় তো মরিস্। আমার মা ভালো কিছু রাঁধলেই, বুঝলেন বাবু, বলে 'আহা থাক এট্টু, বদনা মাঠ থেকে এসে ফড়িঙের সঙ্গে দুটো খাবে।' শালা নেমকহারাম।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। সুতোষ বাবুর বোধ হয় একঘুম সারা। বাইরে এসে বললেন চরণ পালের আখড়ায় যেতে। সকলে মিলে গেলাম। সেখানে সব জাত সব বর্ণ বসে একসঙ্গে অন্নসেবা করবার জন্যে হাজির। ভাত ডাল তরকারি। দেখলাম, অন্তত কয়েক হাজার নরনারীর দাপাদাপি, চিৎকার

আর তাদের পায়ে পায়ে ছেটানো ধুলো নিমেষে অন্ন-মচ্ছবকে ধূসর না করে রঙিন করে দিল। রবীন্দ্রনাথের গানে কতবার শুনেছি 'পথের ধুলোয় রঙে রঙে আঁচল রঙিন' করার কথা। এ যে সেই জিনিস একেবারে চাক্ষুষ দেখা! বিরাট বিরাট গর্তে ভর্তি-ভর্তি ভাত ব্যঞ্জন। সবায় করে সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুও দিচ্ছে মুসলমানও দিচ্ছে। সেই পূত খাদ্য নিয়ে এবং খেয়ে রমজানও নাচে, ফড়িংও নাচে। খবরেব কাগজে নিত্যই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পড়ি, শহুরে হিন্দু-মুসলমানের বানিয়ে তোলা অসহিষ্ণুতা আব অভিমানেব কথা শুনি। উর্দুস্থানের দাবি তোলে মূঢ়তার ভেদবুদ্ধি, ঝলকিয়ে ওঠে শিবসেনা। কই, কোথাও কখনও তো দীনদয়ালেব অন্ন-মচ্ছবের খবর পড়ি না?

তবে কি আমরাই, শিক্ষিতরাই স্পষ্ট পৃথক এক অহংকারের জগৎ বানালাম? তাব দ্বিধা তাব দ্বিচারিতা তাব স্ববিবোধ শেষে কি আমাদেবই কুরে কুরে খাবে? এই সব ভাবছি আমার শীর্ণ অহমিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন সময় একজন বয়স্কা বিধবা এসে আমাব দুখানি হাত চেপে ধবে মিনতি মাখা কণ্ঠে বলল, 'ও ছেলে, তুমি আমায় চেনা দাও। আমি যে অনেক সময় ধরে তোমার পানে তাকিয়ে আছি। ভাবছি, দেখি গোপাল আমায় চেনে কিনা! তা চিনলে কই? শেষে আমি নিজেই ধবলাম তোমাব হাত দুখানা। এবারে চিনবা তো?'

অসহায় চেয়ে থাকি। একদম চিনি না। কোথায় দেখেছি? কোন্ মেলায়? কোন বা আখড়ায়? কি বিপদ।

বুড়ি বললে, 'লজ্জা পেয়ো না গোপাল। ভ্রম মানুষেরই হয়। অনেকদিন আগে, তা দশ বছর তো হবেই, তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল এই রগ্‌গদ্বীপ আসবার পথে ঐ গঙ্গার চড়ায় হাঁটতে হাঁটতে, তোমার মনে পড়ে? এক সঙ্গে হাঁটছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার সই। আহা গা, সে দেহ রেখেছে। বড পুণ্যবতী। এবারে চিনেছ তো বাপ?

চিনেছি এবারে। বললাম, 'হ্যাঁ মাসী এবারে চিনেছি। তোমার একটা কথা আমাব মনে গেঁথে আছে আজও।'

: 'কি কথা গো ছেলে?'

. বলেছিলে, 'গুরুকে আমি তেমন আপন করে নিতে পারি নি এখনও। তিনিই আমারে আপন করে নিয়েছেন।'

: বলেছিলাম বুঝি? আহা। সেই মুরুখ্যু মেয়ে মানুষের কথাডা আজও মনে করে রেখেছ সোনা? এ কি মহতের কথা যে ধরে রাখবা? তা শোনো বাপ। সে কথাডা আজ আর সত্যি নয়। এখন গুরুকে আমি আপন করে নিতে পেরেছি। বাড়িঘর ছেড়ে আমি এখন গুরুর চরন ধরে গুরুপাটেই আশ্রয় নিয়েছি। সেই

আমার গুরু শ্রীমৎ গগন বৈরাগ্য বামুনডাঙার। তোমাকে এখনই যেতে হবে আমার গুরুর আখড়ায়। সেখানে আমার গোঁসাই আছেন। দাদু গোঁসাইও এয়েচেন। চলো চলো গোপাল।'

দুটি হাত ধরে এমন মিনতিভরা টানাটানি, আমাব অন্তরের মধ্যে উষ্ণতা টনটন করে ওঠে। ভাবি, কে এই অনাত্মীয়া 'মুরুখ্যু মেয়েমানুষ' এমন ভালোবাসার মাধুরীক্ষরণ ঘটিয়ে দেয় এমন করে ? তবে কি অগ্রদ্বীপে সকলেই কিছু পায় ? গোবিন্দ গোঁসাই পায় গুপিনাথকে, চরণ পাল পায দীনদয়াল আব আমি পাই এই স্নেহ ক্ষরিত মানবিকতার তুলনাহীন অভিজ্ঞান ? মনে হলো মাসীর হাত দুখানি অমন তপ্ততাতেই ধরে বলি 'নিয়ে চলো সংসর্গে, সমন্বয়ে। আমার স্পষ্ট পৃথক শীর্ণ অনান্তরিক জগৎ থেকে ছিন্ন করে বড় করে সংলগ্ন কবে দাও তোমাদের বিশ্বাসের বিশাল বিশ্বে।' বলতে পাবি না। কিন্তু আমাব না-বলা কথার আভাটুকু কি ধরো পড়ে মাসীর চোখে ?

সমস্ত মানুষকে এড়িয়ে পেরিয়ে পশ্চিম দিকে একটা নাবাল জমিতে একটি টেরে গগন বৈরাগ্যের আখড়া পিটুলি গাছ তলায়। সেখানে সন্ধে নামছে দারুণ রাজসিকতার গন্ধ মেখে। ধূপ আর নানারকম গন্ধদ্রব্য মাতোয়ারা করে রেখেছে পরিবেশ। বসেছে গানের আসর সন্ধ্যাহ্নিক। একজন গাহক গাইছে আর শুনছে অন্তত দুশো ভক্ত মানুষ। প্রৌঢ় গগন বৈরাগ্য আর তাঁব বৃদ্ধ জটাজুটধারী গুরু পাশাপাশি বসে আছেন পদ্মাসন করে। নিমীলিত । মুখ প্রশান্ত। গাহক গাইছে গুরুতত্ত্ব :

গুড়ের মতন যে দেখছি গুরুধন।
ভিয়ান না করিলে গুড়ে সন্দেশ হয় না মন ॥
যেমন গুড় ভিয়ান করে
তেমনই গুরু সেবার তরে
ময়রা হয়ে থাকে পড়ে
সেই তো রসিকজন ॥
সেবায় রাজা ভিয়ানে খাজা
যে করে সেই মারে মজা
করতে নারলে থাকে প্রজা
বুদ্ধুর মতন ॥

গান শেষ হলে দাদু গোঁসাই তাঁর শিষ্য গগনকে বললেন, 'শ্রীগুরুতত্ত্ব পাঠ করো।' গগন একটা পুঁথি, লাল খেরো বাঁধানো, বার করে পড়তে লাগলেন :

শ্রীহরি-বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশই শ্রীগুরুদেব। দাদু গোঁসাই ব্যাখ্যা করে বললেন, 'ঐ জন্যেই বলা হয় গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন। তার পর কি বলছে গগন? পড়ো তো?

গগন পড়লেন:

> অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্য, পরাকাষ্ঠা-'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন
> সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তঃ।'
> তথাপি শ্রীপ্রভু ভগবানের নিত্য প্রেষ্ট।

দাদু গোঁসাই বললেন, 'তোমরা সাধারণ মানুষ। এত বড় শাস্ত্রের উক্তি তোমরা বুঝবে না। তাই সরল করে বলি, শ্রীগুরু আশ্রয় জাতীয় তত্ত্ব আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বস্তু। তাই শ্রীগুরুদেবের ভগবান হয়েও সেবক। তোমরা সেই সেবকের সেবক।'

এ যে রীতিমতো ইনটেলেকচুয়াল ব্যাপার-স্যাপার। আমি গুঁড়ি মেরে আসরের মধ্যে টুক করে সেঁধিয়ে যাই। সম্ভ্রম করে অনেকে আমাকে জায়গা করে দেন। বুঝতে পারি এখানে দাদু গোঁসাই একতরফা বক্তা। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? পাল্লা দিলে এক গগন বৈরাগ্য দিতে পারে কিন্তু এত শিষ্য-সেবকের মধ্যে তিনি নিজের গুরুকে খণ্ডন করতে যাবেন কেন?

দাদু গোঁসাই এবারে বলেন, 'গুরু কেমন জানো। যেমন নৌকোর হাল। নৌকো পৌঁছবে ঘাটে অর্থাৎ ভগবানের কাছে। নিজে নিজে নৌকো যেতে পারে না। হাল চাই। হাল ঠিক থাকলে তবে নৌকো ঘাটে পৌঁছবে, নইলে ভেসে যাবে।'

গগন বৈরাগ্য একজন গাহককে বললেন, 'তোমাদের গানে কি বলছে গো? গুরু কেমন? গুরুকে বাদ দিয়ে কি সাধন হয়?'

গাহক মুখে মুখে খালি গলায় গায়:

> যারা গুরুকে ভুলে
> 'হরি হরি' বোল বলে
> তারা গাছের গোড়া কেটে
> যেমন আগায় জল ঢালে॥

'বেশ বেশ' উদ্দীপ্ত হয়ে দাদু গোঁসাই বলেন, 'খুব হক্ কথা। আগে গুরু পরে হরি। আগে পথ তবে মন্দির। আগে সাধন পরে প্রাপ্তি।' গগন বৈরাগ্য আবার বললেন গাহককে, 'আর কি বলছে গুরুতত্ত্বে?'

গাহক গাইল :

গুরু রূপ ধরে সদয় হন তিনি
মন্ত্রদান করেন শিষ্যের শ্রবণে।
যদি গুরু চেনো মন
পাবে কৃষ্ণ দরশন
পরম সুখে রয়ে যাবে
বৈকুণ্ঠ ভবন।
হলে গুরুত্বে মনুষ্যবুদ্ধি
সাজা দেবে সামনে ॥

দাদু গোঁসাই বললেন, 'এই শেষের কথাটা জরুরি। গুরুকে কখনো মানুষ ভাববে না। তিনি অনেক বড় অনেক উঁচু। তাই বলছে : গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে সে পাপীর জায়গা হয় নরকমাঝে। তোমরা শ্রীগুরুর নামে একবার হরি হরি বলো।'

সবাই হরিধ্বনি দিল। আসর ভাঙল। দাদু গোঁসাই গেলেন তাঁর নিজের আখড়ায় আসর এখন ফাঁকা। বসে আছি আমি আর মাসী। অনেকটা চিন্তামগ্ন ভঙ্গিতে সামনে এসে বসলেন গগন বৈরাগ্য। পবিচয় হলো পরস্পরের। মাসী যেন কৃতার্থ। গগন বললেন, 'কেমন লাগল আমাদেব সান্ধ্য গুরুবন্দনা ? এর আগে গুরুবন্দনা শুনেছেন ?'

বললাম, 'সত্যিই আগে শুনি নি। এমন গুরুবন্দনার আসর আগে তো কোনো আখড়ায় দেখি নি।'

: বোধ হয় মারফতী ফকির আর দীনদয়ালের ঘরে আপনার বেশি গতায়াত। আমাদের মত ও পথ কিছু ধরতে পারলেন ?

: মত আর পথ জানতে গেলে দেখতে হয় করণ-কৌশল। আপনাদের কারণ তো কিছু দেখি নি এখনো। আপনাদের কোন্ ঘর ?

: আমাদের পাটুলি স্রোত।

: তার মানে সহজিয়া ধারা। কিন্তু আপনাদের গুরুবন্দনার আসর বড় কৃত্রিম বলে মনে হলো। ওতে কি মন ভরে ?

: ও তো বাহ্যের কারণ। সাধারণ ভক্তদের জন্যে দায়সারা অনুষ্ঠান। ও থেকে মূল কথা কিছু ধরতে পারবেন না। আসল কথা আপনাকে পরে বলব। রাতে থাকবেন ? বেশ। তখন খানিকটা বুঝিয়ে বলব। এখন শুনুন নিগূঢ় গানের এই কথা ক-টা :

ভয় করে না তাতে

যার আছে গুরুর প্রতি নিষ্ঠারতি।
হেলায় পারে সাঁতার দিতে।
রসিক সেকি পড়ে পাঁকে ?
ডুবে সে রত্ন মিলায় সে বাঁকেতে ॥

মানে বুঝলেন ?

মনে হলো বুঝলাম না। তবে এ কথা স্পষ্ট হলো যে গানের ধূপছায়ার আড়ালে আছে গাঢ় জীবনসত্যের আগুন। গুরুতত্ত্ব যত সহজ ভাবছিলাম তত হয়তো নয়। এখানে 'ভয় করে না তাতে' কথাটায় 'তাতে' মানে কি হতে পারে ? 'সাঁতার দেওয়া' এই ইঙ্গিত কিসের ? 'বাঁক' মানে কি বোঝাচ্ছে ? 'রত্ন' কি ? বুঝতে পারছি খুব সুনিশ্চিতভাবে তত্ত্বের গভীরে যাচ্ছি। যেন খুলে যাবে সেই স্পষ্ট কিন্তু পৃথক বিশ্বের চাবি এবারে । মনের মধ্যে জাগছে একটা নতুন ভাবনা।

এদিকে চার দিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। দ্বাদশীর চাঁদ হিসেবমতো আজ উঠবে আরো একটু রাতে। মাসী কোথায় চলে গেছে। গগন বৈরাগ্য হঠাৎ রহস্যজনকভাবে সামনে এসে আমার মাথাটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'সব ভুলে যান। যা জেনেছেন সব ভুল। গুরু মানে নারী। সাধনসঙ্গিনী।'

তাঁর আচম্বিত ব্যবহারে চমকে গিয়েও আমি প্রতিবাদে মাথা নাড়ি ঘন ঘন। 'তা কি হয়, আমবা জানি পতি পরম গুরু। সেকি তবে ভুল ?'

: তবে সত্য কি ?

: সত্য নারীদেহ। সেই সব চেয়ে বড় গুরু। তার কাছে ইঙ্গিত নিয়ে তার সাহায্যে তবে সাঁতার দিতে হবে। তার শরীরের বাঁকে মানে দশমীদ্বারে লুকিয়ে আছে মহারত্ন। আল্‌গা স্রোতে ডুবে না গিয়ে ডুবতে হবে তলাতল অতল পাতালে। তবে মিলবে রত্নধন। সেই বাঁকে মাসে মাসে বন্যা আসে। তাকে বলে গভীর অন্ধকার অমাবস্যা। নারীর ঋতুকাল। সেই বাঁকা নদীর বন্যায় মহাযোগে ভেসে আসে মহামীন অধরমানুষ। তাকে ধরতে হবে। তার সঙ্গে মিলনে অটল হতে হবে। তাকেই বলে গুরুপ্রাপ্তি। আর ভুল হবে কোনোদিন ?

গগন বৈরাগ্যের কঠোর কঠিন মুখখানি পাথরের মতো স্থির। তার সাঁড়াশির মতো দুটো হাত আমার হাতকে যেন চিরবন্ধনে বেঁধে রাখবে, এত তার জোর। আমি ছটফট করে উঠে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কিছুই জানতে চাই না। আমি সাধন-ভজন করি না। ক্রিয়াকরণ জানি না। বিশ্বাস করি না এ পথে।'

গগনের রক্তচক্ষু আমার দু চোখে নিবদ্ধ। আমার কাঁধে ঘন ঘন ঝাঁকুনি দিয়ে তার ব্যাকুল কণ্ঠের আর্তি ঝরে পড়ল সেই নিঃসীম অন্ধকারে, 'তবু শুনতে হবে। জানতেই হবে। আমি এতদিন ধরে সাধনা করে যা জেনেছি তা কি কাউকেই বলতে পাব না আমি ?' হঠাৎ দারুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে অমন শক্ত মানুষটা আমার বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, 'আমি আজ পর্যন্ত একটা মানুষ পাইনি। সব মূর্খ। সব বাহ্য। তাদের মন-রাখা কথা বলে বলে আমি আর পারি না। আমার কথা তুমি শুনবে না ?'

রাজি হলাম। তবে কথা হলো আমার যেখানে ডেরা সেখান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসব এখন গিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাতে নিভৃতে কথা হবে। মনে হলো আশ্বাস পেয়ে মানুষটা বাঁচলেন যেন। কি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! সন্তপ্ত একজন মানুষ যেন সান্ত্বনা পেল অনেকটা। আমার কেবলই মনে হতে লাগল রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের সেই উক্তি :

জানো কি একাকী কারে বলে ?
যবে দিতে চাই নিতে কেহ নাই।

আমি জানতাম না যে, কোনো জিনিস নিঃশেষে জানার পর তা মনের মধ্যে পুঞ্জিত করে রাখার যন্ত্রণা এত মর্মান্তিক। আমি স্পষ্ট বুঝলাম লালন, পাঞ্জু শা, দদ্দু শাহ, হাউড়ে গোঁসাই, লালশলী, কুবির গোঁসাই কেন এত অন্তহীনভাবে গান লিখে গেছেন। তাঁদের জানার যন্ত্রণা এভাবেই ব্যক্ত করে গেছেন তাঁরা। লোক ধর্মে কি তাই গানের এত বিপুলতা ? বুঝলাম গগন বৈরাগ্যের যন্ত্রণা কোন্‌খানে। সে তো গান লিখতে জানে না। তার চারপাশে মূর্খ আর মুমুক্ষু কতকগুলো মানুষ সব সময়ে শরণ চায়। তাদের দিতে হয় বাহ্য কারণ, লৌকিক আচার। মাসীর মতো ভজনবিহীন নির্বোধ ভক্তরা গগন বৈরাগ্যকে আঁকড়ে ধরে আছে প্রাপ্তির আশায়। এ কি বৈদিক ধর্ম যে শাস্ত্র আর আচারে সব শান্তি আসবে ? এ যে পদে পদে জীবন-সংসক্তির ধর্ম। মল মূত্র রজ বীর্য কিছুই যাদের ত্যজ্য নয় তাদের বাইরের থেকে বোঝা কি খুব সহজ ? এদের নিঃসঙ্গতা তাই নানা ধরনের। একে তো প্রচলিত ধর্মের পথ ছেড়ে নির্জন নিঃসঙ্গ পথে সাধনা। তারপরে সমাজ বিচ্ছিন্ন ঘৃণিত হয়ে থাকা। তারও পরে সব কিছু, জানার পর উপলব্ধির কথাগুলো কাউকে বলতে না-পারার গভীর নিঃসঙ্গ সন্তাপ। গগন বৈরাগ্য তো লিখতে পারেন না। লালন খুব ভালো লিখতে পারতেন তবু তাঁকে বলতে হয়েছিল : 'কারে বলব আমার মনের বেদনা/এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না।' কুবির বলেছিলেন : 'দুঃখের দুখী পেলাম কই/দুটো মনের কথা কই ?'

কিসের এই নিগূঢ় ব্যথা ?

এই ব্যথাই সাধকের ব্যথা। মধ্যযুগের ভারতের সন্ত সাধকেরা কিংবা রূমীর মতো সুফী সাধক এসব ব্যথা থেকে সত্যকে পেয়েছিলেন। 'যাঁকে জানার পর আর কিছু জানা বাকি থাকে না' এমন উক্তির পাশে খুঁজে পাই এমনতর উল্‌টো উক্তিও যে 'তাঁকে জানলে তবে সব জানার শুরু।' 'তিনি তাঁকে জানার পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন' এই সদুক্তির পাশে জ্বলজ্বল করছে এই বাণী যে 'তাঁকে জানার পথ জীবনের সব দিকে ছড়ানো।' কোনটা সত্য এর মধ্যে ? অথবা হয়তো এর সব কটা কথাই সত্য, সাধনার এক এক স্তরে।

আমি বেশ বুঝতে পারি মানুষের ফুঁপি ফুরোয় না। আমি মানুষের সেই অনন্ত ফুঁপি ধরে ধরে কেবলই ঘুরি। স্বজনে নির্জনে। নইলে এই পাঁচশো বছরের উৎসব সেবিত অগ্রদ্বীপে আমার কি এমন কাজ ? আর পাঁচজন ভক্তিমান যাত্রীর মতো মন্দিরে গিয়ে গোপীনাথের দর্শনের পাট চুকিয়ে একটা বৎসরান্তিক প্রণাম নিবেদন করলেই তো চুকে যেত। ঘোষ-ঠাকুরের কিংবদন্তীতে গভীর আস্থা রেখে গোপীনাথের পাথুরে মূর্তি দেখে আমিও তো বিশ্বাস করতে পারতাম যে শ্রাদ্ধের পিণ্ডদানের সময় গোপীনাথ কাঁদেন। তার বদলে গোপীনাথ দেখান আমাকে মানুষের কান্না-হাসি। রমজান মোজাম্মেলের নর্তনানন্দের পাশে এজমালি ফকিরের জড়বুদ্ধি স্তব্ধতা নিঃসাড়ে এসে দাঁড়ায়। অবিরল তর্কমুখর রামদাসের পাশে গভীর সন্তপ্ত মুখখানি ভেসে ওঠে নির্জন গগন বৈরাগ্যের।

এই সব ভাবনার ফাঁকে যন্ত্রের মতো কখন আসা যাওয়া খাওয়া সব সাঙ্গ হয়ে গেল। মধ্য রাতে জ্বলজ্বল করছে দ্বাদশীর চাঁদ। অসংখ্য যাত্রী চারি দিকে শুয়ে নিদ্রায় অসাড়। অন্ন-মচ্ছবে পরিতৃপ্ত ভক্তদের আমরা কেবলই পেরিয়ে যাচ্ছি। আমি আর গগন। একসময়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে আমরা মল্লিক-বাড়ির ভগ্নাংশের কাছে পৌঁছই। সেখানে একটা উঁচু ভূমিখণ্ডে বসি। খানিকটা দূরে মানুষের গলার আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি অনতিম্লান চাঁদের আলোয় দুটো মানুষ মুখোমুখি বসে উত্তপ্ত আলোচনা করে যাচ্ছে। 'ওরা কারা' আমার এই প্রশ্ন মুখরতা পাবার আগেই গগন জানিয়ে দেন ওরা চিস্‌তিয়া খানদানী। মধ্য রাতে ওরা 'বাহাছ' বা তর্ক করে আল্লাহর স্বরূপ নিয়ে।

গগন বৈরাগ্য খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। হু হু করে গঙ্গার বাতাস ঝাপট মারছে মধ্য চৈত্রের রাত্রিকে। হঠাৎ গাঢ় মন্ত্রের মতো গগন বললেন,

শুভাশুভ কর্মে মতি সদা রহে যার।
কৃষ্ণভক্তি কখনই না হয় তাহার॥

আমি বললাম, 'এ কথা বলছেন কেন ? এখন এইখানে এই রাতে ?'

চোখ বন্ধ করে গগন বললেন, 'আমি এখন অনেকগুলো কথা বলে যাব। বাধা দেবেন না। আমাকে বলতে দিন। আমি বলতে চাই।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আমি চুপ করে বসলাম।

গগন বলে চলেন অনর্গল : জীবনের সব চেয়ে বড় ফাঁদ হলো জ্ঞান আর কর্ম। এখানে জ্ঞান বলতে বোঝায় জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান। 'সেই জ্ঞান থেকে আসে মৃত্যুভয়। যে-জ্ঞান মৃত্যুভয় আনে তাতে কাজ কি ? তাতে সাধনায় বিঘ্ন আনে। জ্ঞানের খারাপ দিকটা এবারে বুঝলে ?

আমি বলি : কথাটা নতুন। অন্তত আমাদের পক্ষে। আমরা জ্ঞান বলতে বুঝি শাস্ত্রজ্ঞান। শাস্ত্র মন্ত্র পুঁথি আর উপদেশ থেকে জ্ঞানের জন্ম। তার পর আসে বস্তুজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের কাছে আর সব জ্ঞান তুচ্ছ।

: তুমি কাঁচকলা বুঝেছ। ও-সব বৈদিকের ধোঁয়া। আসল জ্ঞান আপ্তজ্ঞান। সেই জ্ঞান থাকলে অন্য-সব জ্ঞান মেকি হয়ে যায়। আপ্ত না জেনে কি ব্রহ্মকে জানা যায় ? এই গানটা শুনেছ ?

যারো তারো মুখে শুনি বলে 'আমি' 'আমি'
আমি না পাইনু আমায় খুঁজে দেখলাম আমি।

এই নিজে জানা, নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া একেই বলে আপ্তজ্ঞান। বুঝেছ ? তা হলে একটু আগে যে বললাম জীবনের সব চেয়ে বড় ফাঁদ জ্ঞান আর কর্ম তার মানে কি দাঁড়াল ? এখানে বুঝতে হবে কর্মের দ্বারা জ্ঞানের মিথ্যা ত্যাগ করে আপ্তজ্ঞান পেতে হবে। তা হলে জন্ম মৃত্যু ভয় কেটে যাবে।

আমি ভাবলাম গগনের ধারণা ভারি অন্য রকমের। দেখা যাক তার মতে কর্মের সংজ্ঞা কোন্ রকম ?

গগন উচ্চারণ করেন :

এক বেদগুহ্য কথা কহিবার নয়
বেদ ধর্ম কর্মভোগ জানিও নিশ্চয়।

এই কথাটা এবারে বোঝ। বৈদিক ধর্ম আমাদের কর্মভোগ করায় শুধু। আমাদের মুক্ত সুস্থ থাকতে দেয় না। জ্ঞান থেকে আসে জন্মমৃত্যুর ভয়। সেই ভয় থেকে বাঁচতে পুনর্জন্ম এড়াতে আমরা কর্ম করি, মন্ত্র পড়ি, পুতুল পূজা করি, হোম যজ্ঞ করি। সব বৃথা কর্ম। উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা পাপ। কর্ম হলো মুক্ত। তাকে স্বার্থে জড়াতে নেই। তোমরা কেবলই কর্মকে জড়িয়ে ফেল।

আমি বললাম, 'কথাটা খুব নতুন। কিন্তু কেন আমরা এমন করি ? তার থেকে বাঁচার পথ কি ?'

'এই, এতক্ষণে তোমাকে পথে এনেছি' গগন বলেন, 'তোমরা এমন কেন করো জানো ? তার কারণ তোমরা পিতা-মাতাকে গুরুজ্ঞান করো। বাপ মা কখনও গুরু হতে পারে ? তারা তো মায়াবদ্ধ, অষ্টপাশে বাঁধা। কামসর্বস্ব। তারা কী করে গুরু হবে ?

কামসর্বস্ব শব্দটি যেন বজ্রের মতো কানকে ধাঁধিয়ে দেয় আমার। এই মধ্য রাতের নির্জন নদীতীরে আর ভগ্নপ্রায় মল্লিক-বাড়ির সামনে বসে কেবলই মনে হতে লাগল হয়তো আমার চেতনাও ভেঙে পড়বে এবাব। আমার নির্জিত সত্তাকে আরেকটু কোণঠাসা করতেই বুঝি গগন বৈবাগ্য বলে ওঠে, 'পিতা-মাতা কি করে আমাদেব ? শোন তবে—

কামে মাতি উভয়েতে শৃঙ্গার করিল।
সৃষ্টিকালে ভালোমন্দ নাহি বিচারিল ॥
ক্ষণিকের তৃপ্তি হেতু হয়ে মাতোয়ারে।
মারিল আমারে আর নিজে মরে তারা ॥

'চুপ করুন, চুপ করুন আপনি' আমি অসহায়ভাবে ককিয়ে উঠলাম, 'এ-সব কোথা থেকে কী সব বলে যাচ্ছেন।'

'চুপ করব না। তোমরা ব্রাহ্মণবা আমাদের বহুদিন টুঁটি টিপে রেখেছ। আর নয়' বৈরাগ্যের মুখে প্রতিহিংসা ঝলসে ওঠে, 'তোমাদের তো খুব শাস্ত্রে বিশ্বাস। শাস্ত্র কি শুধু তোমরা লিখতে পার ? আমঁরা পারি না ? এ শাস্ত্র আমরা লিখেছি। সহজিয়া পুঁথি। চুপ করে শোন—

ক্ষণিকের তৃপ্তি হেতু হয়ে মাতোয়ারা।
মারিল আমারে আর নিজে মরে তারা ॥
মধ্যে পড়ি আমি যবে ভাসিয়া বেড়াই।
উদ্ধার করিতে মোরে আর কেহ নাই ॥
কিছুকাল কষ্টভোগ করি গর্ভমাঝে।
আইলাম অবনীতে দোঁহার গরজে ॥'

আমি দুহাতে কান ঢাকি। প্রতিবাদে মাথা ঝাঁকাই। গগন জোর করে দু-হাত সরিয়ে দেয় আমার কান থেকে। বাতাস কাঁপিয়ে বলে :

আমার আসার গরজ কিছু নাহি ছিল।
দুজনার ইচ্ছায় আমায় আসিতে হইল ॥

অসম্ভব এই শাস্ত্র। অসহ্য একে মেনে নেওয়া। আমি মুহূর্তে উঠে পড়ি। ছুটে পালাব ? অন্ধকারে সব দিক তো চিনি না। উঁচু-নিচু হয়ে আছে ভগ্ন প্রাসাদের এলোমেলো শান-বাঁধানো চত্বর। তবু জোরে খুব জোরে পা চালাই। গগন বৈরাগ্য তার খোলা চুলে উদভ্রান্ত হাওয়ায় ওড়া দাড়ি নিয়ে উন্মাদ কাপালিকের মতো ছুটে আসে দ্রুততর। কিন্তু পারে না। উত্তেজিত স্খলিত তার পা গর্তে পড়ে। সে সটান মাটিতে পড়ে উপুড হয়ে। আর উঠতে পারে না। আমি তাকে পরিহার করে পালাই, মানুষ যেমন দুঃস্বপ্নকে পরিহার করে। একেবারে একদমে অনেকটা গিয়ে বসে পড়ি নদীর ঘাটে। আস্তে আস্তে রাত কেটে আসছিল। প্রথমে জাগলো পাখি, তার পরে মানুষ। দলে দলে মানুষজন ছায়ার মতো এগিয়ে আসছে আবছা অন্ধকার ভেদ করে। আজ বারুনী স্নানলগ্ন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত সব চেয়ে প্রশস্ত সময় সে কর্মের। আমাব মনে হলো স্পষ্ট পৃথক আর এক জগতের এই অধিবাসীদের সংসর্গ ছেড়ে আমাকে এখনই পৌঁছতে হবে স্বাভাবিক মানবসমাজে। যে-সমাজ জন্ম মৃত্যুকে মেনে নেয়। মেনে নেয় দেহের বাসনা। পিতা-মাতার পবিত্র মিলনে যেখানে কামনা করে সন্তানকে আহ্বান করা হয়। প্রতিদিন যেখানে জীবনের প্রমত্ত ছন্দে জীবন জায়মান।

না, এখানে আর নয়। আজ সব চেয়ে আগে একা আমি অগ্রদ্বীপ ত্যাগ করব। খুব দ্রুত খেয়া পার হয়ে ওপারে পৌঁছাই। অর্ধস্ফুট ভোর। যাত্রী পারাপারের বিরাম নেই। তবে সবাই এখন এ পারের টানে বারুনীর স্নানে। নৌকো থেকে আমি তাই একা ওপারে নামি। নির্জন বালিয়াড়ির পথ বহড়া গ্রাম পর্যন্ত চলে গেছে। আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে কখন আলো ফোটে। চোখে পড়ে শস্যাকীর্ণ মাঠ, সূর্যসনাথ আকাশ। হঠাৎ খেয়াল হলো অনেকটা আগে আগে আরেকটা মানুষ যাচ্ছে না ? হ্যাঁ, যাচ্ছে আর নদীর দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে বার বার। তার দাঁড়িয়ে পড়ার টানে আমি পৌঁছে যাই তার কাছে। নিতান্ত সাধারণ একজন রুখোসুকো গ্রাম্য মানুষ। বললাম, 'বারুনীর স্নান করলে না ?'

লোকটা ফুঁসে বলল, 'তুমিও তো কর নি।'

আমি বললাম, 'আমি ও-সব মানি না। বিশ্বাস করি না।'

: আমি বিশ্বাস করতাম। আর করি না। তাই আজকের মতো গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছি। আজকে সবাই গঙ্গায় ছ্যান করবে। শুধু আমি করব না। আমি এই

গঙ্গাকে সইতে পারি না।

: কেন ?

লোকটা সেই অপরূপ ভোরে পুণ্যতোয়া গঙ্গার একটা দিকে আঙুল দেখিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বলল, 'ঐখানে আমাব জমি আর বসত ছিল। রাক্ষুসী সব গিলেছে।'

আমি মানুষটার হাত চেপে ধবি। পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতেব নয়, এ মানুষটা আমাব। একেবারে আমাব মনেব মানুষ। একেই তো এতদিন ধবে খুঁজছি আমি। শেষ পর্যন্ত আজ তাকে পেয়েছি। ধবেছি দুই হাতেব উষ্ণতায। মনে হলো বারুনীব ভোরে পেলাম, আমাব একান্ত অর্জন, গভীর নির্জন পথে।

‘আপন ঘরে পরের আমি’

সব জিনিষের মতো লোকসংস্কৃতি চর্চাতেও ভেজাল থাকে। হয়তো দেখা গেল ফিটফাট অধ্যাপক বা সপ্রতিভ সাংবাদিক গ্রামের মেলায় হঠাৎ হাজির। অজ পাড়াগাঁ-র কোনো গ্রাম্য দেবতার পার্বণী বা দিবসী অনুষ্ঠান হচ্ছে। কস্মিনকালেও কেউ এসব উৎসবে যেত না। গত এক দশক কেন যেন এসব দিকে সংস্কৃতিসেবীদের একাংশ ঝুঁকে পড়েছে। একজন কেঠো সংস্কৃতিবিদ্ একবাব আমাকে বলেছিলেন, ‘মশায়, এখন দু’বিষয়ে খুব ক্রেজ, ফোক আর ফরেন। যে কোনো ফরেন জিনিসে দেখবেন লোকের খুব আস্থা। তেমনই ফোক এলিমেন্ট থাকলেই তার আদর। বাঁকুড়ার ঘোড়া, পুরুলিয়ার ছৌ-মুখোশ, মধুবনী এপ্লিক, বীরভূমের বাউলগান, মালদার গম্ভীরা সব গর গর করে চলেছে।’

কিন্তু এইসব ফোক এলিমেণ্টেও যে কত ভেজাল থাকে তা জানতাম না তেমন। বিশ বছর ধরে বহুরকম বাউল-ফকির-সহুজে বোষ্টম ঘেঁটে এখন বুঝেছি ঐ সব লোকজনের মধ্যে দু-নম্বরী চিজ বহুৎ আছে। হয়তো নিতান্তই গেঁজেল কিংবা কাম-পাগল, ম-কারান্তবাদী বা স্রেফ পারভার্ট অনেকে আছে। কিছু জিগ্যেস করলেই শিবনেত্র হয়ে বলে, ‘ওসব নিগূঢ় ব্যাপার কি সহজ?’ কতকগুলো বস্তাপচা কথাও আছে। যেমন—দমের কাজ, পঞ্চভূত, ইড়াপিঙ্গলা সুষুম্না, ত্রিবেণী, পিড়েয় বসে পেঁড়োর খবর, গুপ্তচন্দ্রপুর, মুর্শিদাবাদ, গুপ্তিপাড়া, ছটা ছুঁচো, বাহান্ন বাজার তিপান্ন গলি। এসব কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। মুশকিল যে, এই ধরনের ক্লিশে বাউল-ফকিরদের লাইনে এত আছে যে একআধটা ঝকঝকে শব্দ বা বাক্যবন্ধও অনেক সময় ঘুলিয়ে যায়; হারিয়ে যায়। বাংলাদেশের এক অনামা মাজারে বাউলের গানে শুনেছিলাম: ‘আপন ঘবে পরেব আমি’। শুনে একেবারে সারা গায়ে ঝিলিক খেলে গেল। সব শিল্পে, বলতে গেলে, এই ঝিলিকই আমরা খুঁজি। পাই অবশ্য ক্বচিৎ।

আরেক রকমের অভিজ্ঞতাও। প্রথম শুনে যেসব গান লোকগান মনে হয় কী আর এমন, হয়তো দশ পনের এমন কি বিশ বছর পরে সে গানের অন্তঃপুর সহসা খুলে যায়। যেন বইয়ের পাতায় শুকিয়ে-যাওয়া চাঁপাফুল। গন্ধ নেই বর্ণ নেই তবু যেন মন-কেমনিয়া। আসলে রূপকথার গুপ্তধনের দরজা খুলতে গেলে

যেমন বলতে হয় সাংকেতিক মন্ত্র তেমনই বেশ কিছু বাউল বা ফকিরীগানের মর্ম লুকিয়ে থাকে আশ্চর্য সব গূঢ় শব্দে। সেই শব্দ ভেদ করতে দশ বিশ বছর লাগাও বিচিত্র নয়। এই ফকিরদের জগতে 'পীর-মুরিদ' বলে একটা সম্পর্ক চলিত আছে। অর্থাৎ কিনা গুরু আর চ্যালা। এই নিয়ে মারফতী ফকিরদের সঙ্গে মোল্লাদের লড়াই চলছে বহুদিন। কট্টর মোল্লারা বলেন আল্লাকে পেতে গেলে সবাসরি পেতে হবে। ওসব গুরু মুর্শেদ হলো হিন্দুয়ানির প্রভাব। মাবফতীরাও কোরান খুলে দেখিয়ে দেন যে এক জায়গায় মুর্শেদ গ্রহণেব ইঙ্গিত রয়েছে তাতে। আমার অতশত বাহাসে যাবার দরকাব কি ? তবে আমি এইটা সার বুঝেছি যে ফকিরী গান আব বাউল গানের অনেক অংশ, বহু শব্দ আমি বুঝতে পারতাম না যদি না কোনো কোনো ফকির তাত্ত্বিক আমাকে বোঝাতেন।

যেমন ধরা যাক ইমানালী। মানুষটা প্রথম দিনই আমায় হকচকিয়ে দেন এই বলে যে, 'বাবা, নামেব কোনো শক্তি নেই যদি না তার ভেতরের বস্তু আর সেই বস্তুব স্বরূপ তুমি জেনেছ। শব্দ কি ? শব্দ তো একটা ভাব। সেই ভাবের আড়ালে আছে বস্তু। বস্তুকে জানো, তা হলেই শব্দের খোসা খুলে শাঁস বেরিয়ে যাবে।'

. যেমন ?

: যেমন একটা কাগজে লেখো 'আগুন'। কাগজটা কি পুড়বে ? পুড়বে না, কারণ আগুন শব্দে তো দাহ্যগুণ নেই। তেমনই নাম জপ করলে নামীকে পাবে কি ? পাবে না। তার বস্তুত্ব বুঝতে হবে। কোথায় তিনি, কেমন তিনি, আমি কোথায়, তাঁব আর আমার সম্পর্ক কি ? সেইজন্যেই আমরা ফকিররা সব জিনিস কানে শুনে, হৃদয় দিয়ে বুঝে তার পর চোখে দেখে তবে মানি।

এর পর ইমানালী বলেছিলেন আরেক চমকদার বাক্য। বলেছিলেন, 'তুমি বাবা যেমন গানের পেছনে ছুটছো এখন, এর পর সেই গানের ভাবের নিরাকরণ করতে চাইবে তো ? আমি বলি কি জানো, তুমি আগে শব্দের পেছনে ছোটো। তারপরে গান খোঁজ। শব্দ হলো মাছের টোপ, মাছ হলো গান। শব্দেরও আগে কিন্তু আছে নিঃশব্দ। তুমি লালনের সেই গানটা শুনেছ ? তাতে বলছে,

যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে'

আমি এক অতলান্ত চেতনার স্রোতে একেবারে ডুবে যাই। থই পাওয়াতো দূরের কথা, ঘাই মারবার ক্ষমতা থাকে না। ইমানালী শাহজীর দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছি দেখে তিনি বলেন, 'কি গো, আমাকে এমন করে নেহার করছ কেন ?'

'নেহার' মানে তো দৃষ্টির গভীরে ডুব দেওয়া, চেতনার অতলে। সে ক্ষমতা কি আছে আমার ? আমি শুধু ভাবি যে, মেটাফিজিকাল কবিতা চেখেছি, সুর-রিয়ালিজম্ ঠুকরেছি, কিন্তু দুশো বছর আগেকার গ্রাম্য গীতিকার বাংলা ভাষায় লিখে গেলেন এমন অন্তর্গহিন বাক্য 'যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে' ?

ইমানালী মুচকি হেসে বলেন, 'শেষ পর্যন্ত সেই নিঃশব্দই সার। সেই সৃষ্টির পয়লা দিনে ছিল নিঃশব্দ, আখেরি দিনেও থাকবে নিঃশব্দ। মাঝখানে এই কদিন আমবা তৈরি করেছি সোরগোল—শব্দ। শব্দও থাকবে না। মানুষকে ধরো তবে মানুষ কি তা জানবে।

ধরো ধরো মানুষ ভগবান
মানুষ ভজলে পাবি নন্দের নন্দন
সে যে সদা বর্তমান।'

আমি বললাম, 'কোথায় বর্তমান ?'

ইমানালী বললেন, 'মানুষের মধ্যেই বর্তমান। সবই মানুষে আছে। সেইজন্যেই বলেছে,

মানুষরূপে গুরু
মানুষ কল্পতরু
মানুষ রত্ন পায়।
আবাব মানুষ ডুবুরি মানুষের কাছে—
ও তুমি মানুষের গুরু
মানুষকে জানো।'

আমি পড়ে গেলাম ধন্দে। এ যেন সেই লালনের গানের মতোই, 'কথা কয় দেখা দেয় না' গোছের। এসব ফকিরদের বাক্য বোঝা ভার। বেশ বুঝছি বেশ বুঝছি, হঠাৎ গহিন জল। আসলে আমি তো বুঝতে চাইছি আমার উচ্চশিক্ষালব্ধ লজিকে। ইমানালী বোঝাচ্ছেন তাঁর বোধবুদ্ধির নিজস্ব ধরণে ও ভাষায়। যে জায়গাটা বুঝছি না ভাবছি সেটা মিস্টিক অতীন্দ্রিয়। ওটাও পুঁথিপড়া লেবেল। এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্দি।

এইরকম ধন্দকার নির্বোধ গুমোটে অনেক সময় গান দিয়ে দু'দণ্ডের স্বস্তি আনা যায়। তাই বললাম, 'বরং একটা গান করুন।'

লোকায়ত স্বভাবের মানুষটি সোজা সুরে ধরলেন অকপট গান—

চলো সখী দেখিতে যাই

শ্যাম আছে যেখানে।
শুনি নাথ বিরাজ করে
হা হে হু ভুবনে ॥

গানে বাধা দিয়ে বললাম, 'কি বললেন, ? হা হে হু ভুবনে ? এসব শব্দের কি কোনো মানে আছে ?'

নিরুত্তরে গান চলল,

অচিন চিনিবার তরে
আমি গিয়েছিলাম শ্যামনগরে।
বসে কালা নিগম ঘরে মুরলী বাজায়—
হুহুহুহুহু-এর ধ্বনি মধুর শোনা যায়।
অচিন দেশে শ্যাম নিশানা
হা হে হু-র বারামখানা।

শুরু হলো শব্দের পেছনে ছোটাছুটি। হাহা-হুহু-হেহে। এসব তবে ধ্বন্যাত্মক শব্দ নয় ? মন আমার হুহু করছে। হাহা করে হাসি। এই-সব শব্দ প্রয়োগ কি তাহ'লে ভুল করেই করলাম এতদিন ?

আমি যেন 'গুপ্তধন' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়েব মতো আমার চারপাশের নির্বোধ গুমোটে করাঘাত হেনে বলতে চাইলাম—'সন্ন্যাসী দরজা খোলো'। ইমানালী বললেন, 'প্রথমেই কি আর শব্দের মানে পাবে ?' এ কি অভিধান ? খুললে আর পেয়ে পেলে ? সব শব্দ কি অভিধানেই থাকে ? পড়ো দেলকেতাব।'

যেন যুগান্ত পেরিয়ে একটা গান হঠাৎ স্মরণে এল। খুব ছোটবেলায় শুনতাম দিগনগর গ্রামে একজন ভিখিরির গলায় :

হুহু করে আসিয়াছি
হাহা কইর‍্যা যাব।

কিশোর মন তখনকার মতো এ গানের এক লাগসই মানে করে নিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা মনের মধ্যে একটা হুহু শূন্যতাবোধ নিয়ে আমাদের আসা এই জগতে, আবার যাবার কালেও সেই হাহাকার। এবারে সব ছেড়ে যাবার দুঃখ।

কিন্তু গোঁজামিল ধরা পড়ল এতদিনে। একটা মস্ত ফাটল একেবারে। তাই বলে এই 'হা হে হু-র বারামখানা' এতদূর ? মানে কি ধ্বনিগুলোর ? কলেজে কতদিন পড়াচ্ছি। কেতাবী ভাষাতত্ত্ব। ফনোলজি, মরফোলজি, সেমান্‌টিকস্‌। সুসান ল্যাংগারের বই। আর আজ ?

আমার আপন খবর আপনার হয় না।

কিংবা,

হাতের কাছে হয় না খবর
ঘুরে বেড়াও দিল্লি লাহোর

তবে কি এই অবস্থাকেই বলা যাবে আপন ঘরে পরের আমি ? আমার বাঙালি শরীরে হরেক কেতাব পড়া একটা অন্য মানুষ পুষছি নাকি ?

আমার বিপন্নতা বুঝে ইমানালী বললেন, 'শব্দের রাস্তা খুলে যাবে। নাও লিখে নাও—হা মানে আদম বনিয়াদ, হে মানে আল্লা, হু মানে নবী। কিছু বুঝলে ?

: না।

: মানে বুঝলেই তা হলে সব নয়। চা-পাতা আছে, চিনি আছে, দুধ আছে। কিন্তু তিনটে মেশালে তবে চা তৈরি হবে। কিন্তু ঠাণ্ডা জলে হবে না। গরম জল চাই। তেমনই ফকিরী বুঝতে গেলে দেহ চাই আগে। তৈরি দেহ, পক্ক দেহ।

: কেমন করে দেহ তৈরি হবে ?

: জল কিসে গরম হলো ? আগুনে তো ? তোমার দেহ তৈরি হবে গুরুর উপদেশের আগুনে। মুর্শেদ ধরো। পণ্ডিত সেজে ভ্যানতারা কোরো না। এটা কি, ওটা কি। ছাড়ো সব বুজরুকি।

সত্যি বলতে কি সেই থেকে ফকিরদের এড়িয়ে চলতাম। একে ইসলামি শাস্ত্র ভালো পড়া নেই, আরবি-পারশি শব্দও ভালো জানি না, তায় আবার শব্দের ভেতরের ধন্দ। আরো গোলমাল আছে। মারফতী ফকিররা শরীয়ত-বিরোধী। কলমা, রোজা, হজ, যাকাত, নামাজ সবই তারা অগ্রাহ্য করে। আত্মমৌন। আচরণবাদী। বস্তুবাদী শুধু নয়, লালন নিজেকে তো 'বস্তু ভিখারী' বলেছেন। এই বস্তুবাদের অতিকৃতি থেকে বাউলরা অনুমানমার্গ ত্যাগ করে। কল্পনার কোনো ভিত্তিই স্বীকার করে না। কথাটা 'সখের বাউল' নামে প্রসিদ্ধ কাঙাল হরিনাথ এইভাবে বলেছিলেন যে,

যদি কল্পনা ক'রে অরূপীর সে রূপ দেখা যেত
তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে
কল্পনা করিত।
কত জল্পনা করিত ॥

এই বস্তুবিশ্বাস থেকে তারা দেহবাদী। পূর্বজন্ম ও পুনর্জন্ম দুয়েই অবিশ্বাসী।

তারা মানে পঞ্চভূত থেকে দেহের পুষ্টি। জীবনাবসানের পর পঞ্চভূত মিশে যায় আবার পঞ্চভূতে। যুক্তির শস্ত্র তুলে লালন প্রশ্ন করেন :

মনে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে।
□
মনে হয় ঈশ্ববপ্রাপ্ত
সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন জপতপ এত
কবে রে জলেস্থলে॥
যে পথে পঞ্চভূত হয়
মলে তা যদি তাতে মিশায
ঈশ্বব অংশ ঈশ্ববে যায
স্বর্গনবক কাব মেলে॥

এতসব যুক্তিতর্কেব উতোব চাপানো ভজকট ব্যাপার। তাই ঐসব গোলমালে যেতে চাই নি। তবে একেবাবে ছাড়িও নি। যাকে বলে তক্কে তক্কে থাকা তাই ছিলাম।

এমন সময়ে একদিন এলেন বহবমপুর থেকে আকবর আলী শেখ নামে এক উদ্যমী যুবা। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা তাঁকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। বাউল ফকিব সংঘেব তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নেমন্তন্ন সামনের জানুয়ারিতে। সংঘের সভাপতি শক্তিনাথ ঝা, সম্পাদক আকবর আলী। বাউল ফকির সংঘ ব্যাপারটা কি ?

প্রথমে আকবর আলী হাতে ধবালেন এক লিফলেট। তাতে সার কথা এই :

> ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, খ্রীস্টান বা ইসলামের মতো বাউল ফকির মতবাদ কোনো ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায় নয। এ এক জীবন দর্শন ও জীবন চর্চা পদ্ধতি। যে কোনো ধর্মের মানুষ স্বধর্মে থেকে এ মতবাদকে স্বীকার ও পালন করতে পারেন।
>
> যে-সমস্ত কল্পনা বা চিন্তার বস্তুগত কোনো ভিত্তি নেই ; পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পাওয়া যায় না—এমন সমস্ত চিন্তাকে ফকির-বাউল অনুমান বলে অগ্রাহ্য করে।...কাল্পনিক দেবতায় তার অনীহা। জীবিত মানুষ সৃষ্টির সর্বোচ্চ বিকাশ, তার অনুসন্ধেয় ও মান্য।,..
>
> জাত, পাত, ধর্মের বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল বাপ্পে ভারতবর্ষ আজ

মুহ্যমান। আমরা বাউল-ফকিরগণ যা-কিছু মানুষকে বিভক্ত করে তার বিরোধী। আসুন আমরা আমাদের মহান মানবতাবাদের বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।

কথাগুলিতো সুন্দর। এবারে শুরু করি প্রশ্নমালা আকবর আলীকে।

: আপনাদের সংঘের প্রথম সম্মেলন কবে হয়েছিল ? কোথায় ?

: ১৯৫৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমাদের সংঘের সূচনা। প্রথম সম্মেলন হয় মুর্শিদাবাদের স্বরূপপুরে। ১৯৫৩-র ১২ই মার্চ

: দ্বিতীয় সম্মেলন ?

: মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়ায় ১৭ই মার্চ ১৯৫৩।

: এবারে ?

: এবারে নদীয়া সীমান্ত করিমপুরের সন্নিকট গোরাডাঙ্গা গ্রামে হবে ২৫ আর ২৬ জানুয়ারি। যাবেন তো ?

'যাবার ইচ্ছে তো খুবই' আমি বললাম, 'কিন্তু তার আগে সব ব্যাপারটা তো জেনে নিতে হবে।' আচ্ছা, আপনাদের বাউল-ফকির সংঘ হঠাৎ গড়ে উঠল কেন ?'

আকবর আলী শান্তভাবে কিন্তু স্পষ্ট করে বললেন, 'সত্যিকারের কারণ হলো সংঘবদ্ধ হবার দরকার ছিল তাই। বলতে পারেন মারপিটেব জবাবে বাধ্য হয়ে এক হওয়া। শুনেছেন কি গত ক-বছরে বাউল ফকিবদের ওপবে কী রকম অত্যাচার করে চলেছে কট্টর ধর্মান্ধরা ?'

. শুনেছি বললে ভুল হবে, বলা উচিত পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদেই বোধহয় বেশি।

: হ্যাঁ। ঐ জেলাতেই তো বাউল-ফকিরদের সংখ্যা বেশি, মসজিদ মৌলবীর সংখ্যাও বেশি। ঘটনা তাই ঐ দিকেই বেশি ঘটে। তবে ছোটখাট ঘটনা এদিক ওদিকেও হয়, খবর আসে না। তবে আমরা খবর পাই। রুখে দাঁড়াই। প্রশাসনকে বলি।

: সম্প্রতি বছর দু-য়েকের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোনো বিশেষ অত্যাচারের খবব বলতে পারেন ?

'পারি।' আকবর আলী ডাইরি খুলে পড়তে লাগলেন, '১৯৫৩ সালের ১২ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদের নওদা থানার দুর্লভপুরে লতিফ বলে এক ফকিরকে বল্লম দিয়ে মেরেছে। ১৯৫৩ সালে ১৩ই জুলাই জলাঙ্গী থানার ফরাজী পাড়ায় আমাদের সভা করতে দেয়নি, মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ১৪ই জুলাই সারগাছির অন্তর্গত বানীনাথপুরের মীর্জাপুর পাড়ায় আমাদের রুহুল আমিনের

ওপর অত্যাচার করে। তাকে মেরে চুল-দাড়ি কেটে, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ১৫ই জুলাই বেলডাঙা থানার গোপীনাথপুরে অত্যাচার হয়েছে আবদুর রহিমের ওপরে। এছাড়া গালমন্দ, শাসানি, চোখরাঙানি এসব তো সর্বদাই লেগে আছে। এরপরও যদি আমরা সংঘবদ্ধ না হই…'

'হ্যাঁ, ঠিক কাজই করেছেন' আমি বললাম, 'অবশ্যই যাব আমি। ২৪ তারিখেই পৌঁছে যাব। গোরাডাঙ্গা গ্রামে অবশ্য যাইনি কখনো। ওখানে আবার সভাসমিতি কবা যাবে তো?'

: কোনো ভয় নেই। ফকিরদের শক্ত ঘাঁটি। গাঁয়ের মানুষজন ভালো।

মাঘ মাসের শেষ বেলায় পৌঁছে গেলাম ধুলোডোবা গ্রাম গোরাডাঙ্গায়। নামেই নদীয়া জেলা, আসলে ভাষাভঙ্গি কথার টানে পাক্কা মুর্শিদাবাদ। ছোট্ট গ্রাম। শ-দেড়েক পবিবার বাস কবেন। একচেটিয়া মুসলমান। চাষবাস একমাত্র জীবিকা। এসব নানা খবব হাঁটতে হাঁটতেই সংগ্রহ হয়ে যায়। অবশেষে সম্মেলনের জাযগায পৌঁছে যাই। উদ্যোক্তাদের করতলের উষ্ণ আহ্বানে সাড়া দেয় আমার কবতল। শ্রান্তভাবে বসে পড়ি সামিয়ানার নীচে। চারপাশে ইতস্তত জটলা বাউল-ফকিবদেব। এখনই গাঁজাসেবা শুরু হয়ে গেছে। শক্তিবাবু আলাপ করিয়ে দেন মযহারুল খাঁ-র সঙ্গে। এই গ্রাম আর এই চত্বরের প্রধান ব্যক্তি। লম্বা চেহারা। ধুতি আর সার্ট পরনে। লাজুক হেসে একবার মযহারুল দেখা দিয়ে যান। সবাই পাকে সাকে ব্যস্ত। শ্রান্তি কাটতে না কাটতেই এসে যায় চা আর মুড়ি। শুরু করি মযহারুল ফকিরের সঙ্গে আলাপচারি। উদার স্বভাবের গৃহী ফকির। সম্পন্ন চাষী-পরিবার। সম্মেলনের ঝুঁকি আর গুরু দায়িত্ব প্রধানত তাঁরই চওড়া কাঁধে। সংলগ্ন বড় বাড়িটাও তাঁর। তাঁর ছেলেরাও ফকিরি ধর্ম মেনে চলে। ফকিরী গান গায়।

জিগ্যেস করলাম, 'এ গাঁয়ে ফকির সম্মেলন করছেন, কোনো বাধা হবে না তো? কোনো হাঙ্গামা?

এক গাল হেসে মযহারুল বললেন, 'কে করবে হাঙ্গামা? কেন করবে? কারুর সঙ্গে তো বিরোধ নেই। আসলে কি জানেন, এ গাঁয়ের দেড়শো ঘর মুসলমানের মধ্যে একশো ঘরই ফকিরী মতে চলে।'

: কী ক'রে এমন হলো?

: আমি করেছি ক্রমে ক্রমে। সহজে কি হয়েছে? সময় লেগেছে।

: একটু বলুন, শুনি।

: আমার বয়স এখন ষাট। ছোটবেলা থেকে আমার ফকিরী মতে আগ্রহ। তখন থেকে ওদের সঙ্গে ঘোরাফেরা। বাড়িতে কত ঝগড়া হয়েছে বাপজানের

সঙ্গে। তাড়িয়ে দিয়েছেন। খাঁটি শরীয়তী মুসলমান ছিলেন তো। তর্ক বাধতো। আমিও ইসলামী শাস্ত্র পড়েছি। আরবি জানি, কোরান আর হাদিশের মর্ম বুঝি। এ দিগরে কোনো আলেম মোল্লা আমার সঙ্গে বাহাসে পারে নি। এখন আর ঘাঁটায় না।

আত্মপ্রত্যয়ী মানুষটিকে ভালো লাগলো। বুঝলাম মযহারুলের ব্যক্তিত্বে, বিচারে আর প্রভাবে গোরাডাঙ্গা গ্রামের মানুষজন সবাই ফকির না বনে গেলেও ফকিরদের বিষয়ে অসহিষ্ণু নন, বরং সহযোগী। এই তো একপাশে বটগাছতলায় যে শত শত মানুষের জন্যে রান্না হচ্ছে তাতে হাত লাগিয়েছে কত গ্রামবাসী। রাতে ফকিরী গানের আসরে মনপ্রাণ দিয়ে গান শুনবে যারা তারা হিন্দু না মুসলমান? শরীয়তী না মারফতী? কোনোটাই নয়। তখন তারা মানবরসিক। গান পাগল। কিন্তু খাঁটি ইসলামি ধর্মতত্ত্ব নাকি বলে গান জিনিসটা হারাম, বেদায়াৎ। কটাক্ষ করে আসাদ্উল্লা নামে এক নীতিবাগীশ একবার লেখেন,

কোন কোন পীর লোক বাজনা বাজায়।
সুর দিয়া গান করে হাততালি দেয়॥

জবাবে আবদুর রসিদ চিস্তি তাঁর 'জ্ঞান-সিন্ধু বা গঞ্জে তৌহিদ' ইত্যাদি' বইতে লেখেন,

> 'যে গানের সাহায্যে আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি আসক্তি জন্মে, তাহাকে ধর্মসঙ্গীত বলে। কিন্তু মৌলভী সাহেবদিগের ফতাওয়া অনুসারে যদি তাহাও বেয়াদাৎ হয় তবে মৌলবী সাহেবরা ওয়াজের মজলিশে মওলানা রূমের মসনবী, দেওয়ান হাফেজ, দেওয়ান শামন তবরেজ, দেওয়ান লোৎক, দেওয়ান মইনুদ্দিন চিস্তি, দেওয়ান জামী প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষদিগের দেওয়ান ও মসনবীর বয়াত গাহিয়া ওয়াজ করেন কেন? যত দোষ কি কেবল বাঙ্গলাগানের বেলায়?'

আসলে গানই মারফতীদের ভাষা। একতারাই তাদের জীবনের প্রতীক। সেই একতারা যদি কেউ কেড়ে নিয়ে ভেঙে দেয়, গান গাইতে না দেয়, তবে মারফতীদের ধর্মসাধনাতেই তো হাত পড়ে। প্রতিরোধ তো করতেই হবে সে অন্যায়।

ইতিমধ্যে একজন ধরে আনেন রুহুল আমিনকে। এই সেই রুহুল যার কথা শুনেছিলাম আকবর আলীর কাছে। গত বছরে জুলাই মাসে মীর্জাপুরে এই রুহুলের দাড়িগোঁফ কামিয়ে, একতারা ভেঙে দিয়ে, বাড়ি পুড়িয়ে ধর্মান্ধরা

তাড়িয়ে দিয়েছে তার স্বগ্রাম থেকে। রুহুল এখন আর দাড়ি রাখেন না ঘৃণা আর গ্লানিতে। চোখে গাঢ় অভিমান। কেউ যেন খুব বড় ধরনের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তাঁর সঙ্গে, মুখের ভাষা তেমনতর থমথমে। একখানা শাদা ধুতি পরনে, শাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে রুহুল সামনে বসে আছেন চুপ করে। আমার অন্তরে মর্মান্তিক বিবেক দংশন।

আমি কেবল রুহুলের হাতদুটো ধরি গভীর মমতায়। রুহুল তাকায় ব্যথিত চোখে। আশ্বাস খোঁজে এতগুলি মানুষের সান্নিধ্যে।

ইতিমধ্যে ছোট এক জটলায় দোতারা বেঁধে গান ধরেছে এক অজানা বাউল। গানটা এইমুহূর্তের গুমোট কাটাতে খুব প্রাসঙ্গিক মনে হলো .

সাঁই রাখলে আমায় কূপজল করে
আন্দেলা পুকুরে।
হবে সজল বরষা
রেখেছি এই ভরসা
আমার এই দশা যাবে
কত দিন পরে ৷৷

কূপজলের বদ্ধতায় আটকে আছে বহতা সমাজের ধারা। ধর্মান্ধতা, হানাহানি, ঈর্ষা আর অসূয়া সব দিকে।

সন্ধের পর শুরু সম্মেলন। গান আর গান, ভাষণ আর ঐক্যবদ্ধতার প্রতিজ্ঞা। সব কিছুর মধ্যেও কিন্তু আমার মনের পর্দায় কেবলই সুপার ইম্পোজের মতো ভেসে থাকছিল রুহুলের বেদনাবিদ্ধ অভিমানী মুখ। অথচ কত বাউলের সঙ্গে কত দরবেশী ফকিরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল সে রাতে। খাওয়ার অভিজ্ঞতাও খুব নতুন রকমের। পাটকাঠি পাতা মর্‌মর্‌ শব্দের আসনে বসে গরম খিচুরি খাওয়া সর্ষের তেল দিয়ে। তখন মাঘের মধ্যরাত। শিরদাঁড়া পর্যন্ত কাঁপছে থরথরিয়ে। কোনো রকমে খেয়ে উঠেই দৌড় রাতের আশ্রয়ে। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দলিজে শোওয়া গেল। আশ্রয়দাতা শরীফ মানুষটিকে বললাম, 'এই বাড়ি আপনার?'

ফকিরী ধাঁচে উত্তর দিলেন, 'গ্রামের সবাই তাইতো বলে।'

ওদিকে মাইকে শোনা যাচ্ছে অবিশ্রান্ত ফকিরী গান। সারা রাত চলবে। পাশে বকবক করে চলে আধপাগল মানুষ মানউল্লা। এক সময়ে নাকি ফকিরী করত। গাঁজার মাত্রাভ্রমে মাথার গণ্ডগোল। নিবাস মাদারিপুর। আমাকে বলে, 'লোকে আমাকে পাগল বলে। কিন্তু আমি পাগল নই। আমি খ্যাপা। অসহ্য

সইতে পারি না। এই যে রুহুল ফকিরের ওপর অত্যাচার তার প্রতিবাদে আমি গান বেঁধেছি। জানেন, আমি প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েছি। আমার ছদ্ম নাম নিজামী। ঐ নামে আমি লিখি।'

আমি জিগ্যেস করি,'নিজামী মানে কি ?'

নিজামী শব্দের মানে হলো সজ্জাকর বা প্রসাধক। কিন্তু ভাবার্থ হলো—কলুষনাশক, পবিত্রকারী, সংস্কারক। যেমন কিনা ধরুন সূর্য। পৃথিবীর সব আবর্জনা, পাঁক, মালিন্য তিনি লেহন করে নিচ্ছেন।

হঠাৎ বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে নিজামী বলে উঠল নাটকীয়ভাবে হাত নেড়ে, 'যখন মানবসমাজ সম্পূর্ণভাবে কলুষকুণ্ডে তলাইয়া যাইতে থাকে, যখন ঐ ঘুণধবা শতছিদ্র ডিঙ্গাখানি পাপ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মুখে নিমজ্জিত হইতে বসে, তখনই হয় বজ্রমুষ্টি কাণ্ডারীর প্রয়োজন। নিজামীর প্রয়োজন। যখন সমাজ তথা জনসাধারণ স্বার্থবাদী মুষ্টিমেয় কতকগুলি নরপশু, পণ্ডিত মোল্লার হস্তে নিষ্পেষিত হইতে থাকে, তখনই হয় নিজামীর প্রয়োজন।'

যেমন হুট করে উঠে দাঁড়িয়েছিল তেমনই হুস করে বসে পড়ল নিজামী। আমি হতভম্ব হয়ে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে নিজামীর ছায়াবাজী দেখতে লাগলাম। সেই এই ওঠে এই বসে আর আউড়ে চলে :

হে প্রভু, তুমি যে ছবি এঁকেছ আমায়
সেই ছবি পৃথিবীতে জন্ম রূপান্তর
তাই আমি নিজেই সেই ছবি দেখছি।

□

যাঁর যত চিন্তা তাঁব ততই নিঃসঙ্গ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছা জাগে, প্রকৃতিকেই
কেন্দ্র করে মনের গোপন প্রতীক্ষায়।

□

চিন্তায় রয়ে গেছে আমার মুক্তি পথ
যতই চিন্তা করি আমি নিঃশব্দ থাকি
প্রকৃতির নিশব্দ সাধনায় ধর্ম কি ?

□

প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষ সৎ ভাবে
বেঁচে থাকতে পারে, মানুষের অপ্রেম
মধ্যে বেঁচে থাকতে সৎগুণের মৃত্যু।

মুশকিল যে, নিজামীর রচনা নিতান্ত ফেলনা নয়। শুনেই বুঝছি তার মর্মরস আছে। কেমন করে এমন লেখে আধা পাগল আধা ফকির নিজামী ? আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া থেকে এই মধ্য রাত পর্যন্ত সে অবিশ্রাম গাঁজা খাচ্ছে। বুঝছি তাব মাদকেই এই বকে যাওয়া নিজামীর। কিন্তু এ সবই তার অপূর্বকল্পিত রচনা মুখে মুখে ? সত্যিই ফকিরদের জগৎ খুব আধো বহস্যে নিমীল। বিশেষ করে নিজামীর সঙ্গে রাত কাটানো এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বাকি রাতটুকুতে যখনই ঘুম ভাঙে দেখি নিজামী বসে আছে আর বিড় বিড় করছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড জোরে আঙুলে তুড়ি মেরে ব'লে উঠছে 'আল্লা আল্লা'। আগের সন্ধেবেলা সে আরেক কাণ্ড করেছিল। সম্মেলনে তখন একজন অধ্যাপক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন লোকসংস্কৃতি বিষয়ে। তাঁর ভাষণে লোকজীবন-অভিজ্ঞতার ছাপ ছিল না বরং কেতাবী বিদ্যে বড্ড জাহির হচ্ছিল। টোটেম, যাদু বিশ্বাস, ফার্টিলিটি ওয়ারশিপ, কাল্ট্-সেক্ট এসব খুব কপচাচ্ছিলেন। সভ্যভাবে বসে সবাই তা শুনছিলেন, নিরুপায়। হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে থেকে খাড়া উঠে দাঁড়িয়ে তুড়ি মেরে নিজামী বলে উঠলো, 'আল্লা আল্লা, জ্ঞান নে জ্ঞান দে'। অধ্যাপক হতচকিত, আমরা তো অবাক। অবশ্য কাজ হলো। অধ্যাপক জ্ঞানদানে বিরত হলেন।

এক এক সময়ে ভাবছিলাম রোজকার জীবনে এমন এক আধটি নিজামী থাকলে মন্দ হয় না। সব রকম ভণ্ডামি আর বক্তৃতা, অহংকার আর তাত্ত্বিকতার মধ্যে এমন ক'রে ঠাণ্ডা জল ফেলার দরকার খুব। যাই হোক শেষ রাতের দিকে নিজামীকে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি সারা রাত ঘুমোও না ?'

নিজামী বলল, 'রাতেই তো তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। যা-কিছু চিন্তাভাবনা, বয়েত রচনা সবই আমার রাতে। রাতেই তাঁকে দেখা যায়। সবাই তখন ঘুমিয়ে থাকে। আর ঘুম জিনিসটা কি বলুন তো ? নিজামী তার বয়েতে বলছে,

> আমার ঘুম এসে যায় যখন চিন্তা
> করার যুক্তি থাকে না। যুক্তি নিয়ে বেঁচে
> থাকাটাই ঠিক জীবনের জ্ঞান শক্তি।'

নিজের রচনাপ্রতিভায় আত্মমুগ্ধ নিজামী তুড়ি মেরে বলল, 'হা হা হা, আল্লা আল্লা, নিজামী ঠিক লিখেছে। আপনি ঘুমোন, কাল জ্ঞান দেবেন মিটিঙে। ততক্ষণ আমি একটু স্মোকিং করি। স্মোকিং মানে রাজার অভ্যেস জানেন তো ? স্মো-কিং, কিং মানে রাজা, হা হা আল্লা আল্লা।'

খুবই আশ্চর্য অস্তিত্ব সন্দেহ নেই। একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের যুবা বেঁচে

আছে মাদক আর শব্দের মাদকতায়। অনায়াসে লেখে গাঢ় ভাবনার বয়ের। কেমন ক'রে হয়? আহার নিদ্রার ঝোঁক একেবারে নেই। শুনেছি সুফী সাধকদের সাধনার দুই ধারা—'ফানা' আর 'বাকা'। ঈশ্বর বা উপাস্যের সঙ্গে লীন হয়ে থাকার অদ্বৈত অবস্থাকে বলে ফানা। আর উপাস্যের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ভাববিনিময়ের দ্বৈতলীলাকে বলে বাকা। নিজামীর কোন অবস্থা? ফানা না বাকা?

হয়তো কোনোটাই নয়, নিতান্ত বায়ুরোগী বা অর্ধোন্মাদ। সেদিক থেকে সব বাউল ফকিরই তো অর্ধোন্মাদ। নিজের ঘর গেরস্থালি ছেড়ে ব্রাত্যজীবনে এই যে আত্মানুসন্ধান দেহের দিক থেকে, সেও কি কম পাগলামি? 'বা' মানে আত্ম, 'উল' মানে সন্ধানী—এই থেকেই নাকি বাউল শব্দের সৃষ্টি। আবার কেউ বলে বাতুল থেকে বাউল। কে জানে? ফকির কথাটার মানে অবশ্য সে তুলনায় অনেক স্পষ্ট। সব কিছু ছেড়ে ফকির বনে যাওয়া। সব কিছু বলতে বেশির ভাগ মানুষ ভাবেন ভোগ সুখ বিত্ত ঐশ্বর্য। তা কিন্তু নয়, সব কিছু মানে সব রকমের সংস্কার বর্জন, জন্ম মৃত্যু-পুনর্জন্ম -লোকলজ্জা-সমাজ। নিজামী বলেছিল যখন চিন্তা করার যুক্তি থাকে না তখন ঘুম এসে যায়। আপাতত আমার চিন্তা করার যুক্তি এত প্রবল যে ঘুম ছুটে গেল। ভোরও একটু একটু করে মাঘের কুয়াশা ভেদ করে উঠতে চাইছে। নিজামী বিড় বিড় করছে। আমি বললাম, 'নিজামী কি করছ?'

অর্ধনিমীল চোখে সে বলল, 'ফজরের নামাজ কায়েম করছি।'

আমি বললাম, 'দুঃখিত, তোমার নামাজে বাধা দিলাম।'

: কিছু না। আমাদের বাতুনে (অপ্রকাশ্য) নামাজ। অন্তরে গভীরে চলছে। সেখানে মানুষের স্বর পৌঁছায় না।

তুড়ি মেরে আল্লা আল্লা বলে নামাজ শেষ হলো। একগাল হেসে বলল, 'খুব ঘুমোতে পারেন দেখলাম। বেলান্তই ঘুমোচ্ছেন, চোপর রাত।'

: চোপর রাত আর কোথায়? শুতেই তো এলাম দুপুর রাতে।

: হা, হা, আল্লা আল্লা। কখন যে দুপুর কখন যে চোপর কে জানে। সব সমান নিজামীর কাছে। আল্লার কাজ-কারবার সারাদিন ধরে চোখ মেলে দেখি আর তাজ্জব বনে যাই। রাতে কিছু দেখা যায় না। দেখুন আল্লার হেকমৎ। তখন গরু আর গোলাপ সবই আঁধার। ঠিক তখনই রুহ্ মানে আত্মার আলো জ্বলে ওঠে। আল্লা রাতস্মরণীয়। হা হা। আল্লা রাতস্মরণীয়।

: প্রাতঃস্মরণীয় নন?

: প্রাতঃকালে মানুষের থাকে জঠরের চিন্তা, বিষয় চিন্তা। খেজমতের গান

শোনেননি ? শুনুন,

আমার এই পেটের চিন্তে
এমন আর চিন্তে কিছু নাই।
চাউল ফুরাল ডাউল ফুরাল
সদাই গিন্নি বলেন তাই ॥
যখন আমি নামাজ পড়ি
তখন চিন্তা উঠে ভারী
কীসে চলবে দিনগুজাবী
সেজদা দিযে ভাবি তাই ॥
আমাব পেটেব জ্বালা জপমালা
আমি তসবী মালায জপি তাই ॥

হা হা, আল্লা আল্লা !

আমি গান শুনতে শুনতে পোশাক পাল্টে নিয়ে বললাম, 'বেশ। এবারে সম্মেলনে যাব। তুমি যাবে না ?'

'যাব, তবে এখন আমার মনে মহাসম্মেলন চলছে' নিজামী বলল, 'সেই সম্মেলনের ভাষণ মানে একটা বয়েত এখনই লিখে ফেলতে হবে নইলে ভুলে যাব। খুব কাকভোরে যখন ঘুলঘুলি দিযে আলো আসছিল, নিজামীর আলো, তখন একটা বয়েত বানিয়েছি, শুনবেন ?

ভূমণ্ডলীর প্রত্যেকটা বালিকণাব
মূল্য আছে। কারণ প্রতিটি বালিকণা
আলোর উজ্জ্বলতায় চিক চিক কবে।

আমি প্রভাতসূর্যের প্রসন্নতা নিয়ে নিজামীর দিকে চেযে রইলাম সস্নেহে আব তার দুববগাহ মনের সন্ধান করতে লাগলাম। নিজামী উঠে দাঁড়িযে নাটকীয় আবৃত্তির ঢঙে বলল,

আমি যা চেয়েছি তা পেয়েছি
তুমি শ্রেষ্ঠ।
এবার আমায় নিয়ে চলো শেষ যুগে
দ্বার খুলে দাও।

আমি বললাম, আমাকে কি ফেরেস্তা ঠাউরেছ না কি ?

: আপনিই ফেরেস্তা, আপনিই জিব্রিল, আপনিই নবী। আপনিই খদ্, আপনিই খোদা। আপনার মধ্যেই হা হে হু-র ধ্বনি শুনছি।

বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র জগৎ। আমি সেখানে কতটাই পরবাসী, পরভাষাভাষী। অথচ আশ্চর্য যে এই নিজামী আর আমি কাল পাশাপাশি বসে তেল-খিচুড়ি খেয়েছি। মানুষের বিশ্বাসের জগৎ কি এতটাই আলাদা ? আপন ঘরে নিজেব আমি নাকি পরের ঘরে আপন আমি ? এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও।

সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে বসলাম মযহারুল ফকিরের পাশে। আলাপ করিয়ে দিলেন ছেলে মনজুরেব সঙ্গে। কাল তার গলায় চমৎকার তত্ত্বগান শুনেছিলাম। বক্তৃতা আর প্রস্তাব গ্রহণের মাঝখানে কিছুক্ষণ বসে আমি গুটি গুটি উঠে যাই মাঠের দিকে বেড়াতে। শস্যাকীর্ণ সবুজ মাঠে তখনও কুয়াশার ঘেরা টোপ। মুগ্ধ একা দাঁড়িয়ে কত কিছু দেখছি। কিছু দূরে একটা বানে খেজুর রসের তাতারসি জ্বাল হচ্ছে। জমিতে লাফিয়ে পড়ছে দুটো চারটে ফিঙে। এই কনকনে সকালে আধাউলঙ্গ দুটি শিশু তাতারসির লোভে ঘুরছে। হঠাৎ সামনে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন একজন গ্রামবাসী, মাঝবয়সী। লুঙ্গি, গেঞ্জি পরনে। নাম বললেন দেলদার হোসেন খাঁ। জিগ্যেস করলাম, এ গাঁয়ে যাদের সঙ্গেই আলাপ হচ্ছে তাদেরই নামের শেষে খাঁ, কি ব্যাপার ? আত্মতুষ্ট হেসে বললেন দেলদার, 'বলতে পারেন খানদানী গ্রাম। সবাই খাঁ। আশরফ অর্থাৎ কিনা শরীফ আদমী'।

: সত্যিই ?

: এককালে নিশ্চয়ই ছিল। এখনও গর্বটুকু আছে। তবে সবাইয়েরই চাষবাস এখন। সেই কথাটা কি শুনেছেন ? সেই যে বলে,

> গায়ে গন্ধ আতর আলী
> চোখ কানা নজর আলী
> একটাও বাক্স নেই দেদার বক্স

আমাদের অবস্থা তেমন ধারা। অবস্থা যাই হোক আমরা এক একজন খয়ের খাঁ। তবে হ্যাঁ, মযহারুল চাচা সত্যিকারের খাঁ বটে। কি বুকের পাটা। চারপাশের শরীয়তীদের মাঝখানে মারফতী ফকিরদের নিশেন ধরে আছে।

: আচ্ছা, মুসলমানদের কি শ্রেণী বর্ণ আছে ?

: জাহেরে নেই, বাতুনে আছে। মানে ভেতর ভেতর। দেখুন আল্লার এই দুনিয়া চলছে দু' নিয়া অর্থাৎ দুটো জিনিস নিয়ে। সে দুটো কি ? বড়লোক আর গরিব লোক। ধনী আর দরিদ্র। আশরাফ আর আতরাপ।

: আরেকটাও তো আছে—আরজল ?

: ওটাকে মুসলমানদের মধ্যে ধরবেন না। আরজল কারা জানেন ? এই বেদে বাজিকর পোটো চামার এই-সব। পতিত শ্রেণী।

: আশরাফ কারা ?

: আশরাফ হ'ল উচ্চশ্রেণীর মুসলমান—সেখ, সৈয়দ মোগল পাঠান। এদের মধ্যে সৈয়দরা সবচেয়ে খানদানী। তাদের আবাব দুটো গোষ্ঠী, ফাতেমীয আর উলবি। এদের আবার উপগোষ্ঠী আছে—হুসেনী, হাসনী, মুসাবী. রাজভী, কাজিমী, তাকাবী, নাকাবী এইসব। কিন্তু এসব শুনতে কি আপনার ভালো লাগছে ?

: কেন লাগবে না ? আমাদের পাশাপাশি এই বাংলায় যারা শতশত বৎসর বাস করছে তাদের প্রায় কিছুই জানি না এটা কি ভালো ? এর থেকেই তো অবিশ্বাস দলাদলি কাটাকাটি। কিন্তু এতসব জানলেন কি করে ?

. মুখে মুখে শেখাতেন আব্বা। তো শুনুন, শেখদের মধ্যে সেরা হলো কোরেশী কেন না ঐ বংশেই হজরৎ মহম্মদের জন্ম। শেখদের অন্য শাখার নাম—সিদ্দিকি, ফারুকী, আলমানী, আব্বাসী খালেদী—আরো কী সব আমার মনে নেই। মোদ্দা কথা শেখ ও সৈয়দরা এসেছিল আরব থেকে। শুনেছি মধ্য এশিয়াব তুর্কীবা ভারতে এসে মোগল নাম পায়। আফগানবা হলো পাঠান। এই পাঠানদেরই বংশধব আমবা অর্থাৎ খাঁ।

খেয়াল করিনি কখন নিজামী এসে দাঁড়িয়েছে চুপিসারে। দেলদার খাঁর কথা শেষ না হ'তেই নিজামী বলল, 'তবে তোমরাও খানদানী খাঁ নও। আতরফ খাঁ'।

'কেন' ? আমি জানতে চাইলাম।

: কারণ বিদেশী মুসলমানদের সঙ্গে এদেশীয়দের সাদি হয়ে যে মিশ্র শ্রেণী হয়েছিল তারাও আতরাফদের মধ্যে খানদান। তাদের টাইটেল কাজী, চৌধুরী, শেখ, খাঁ, মালিক।

দেলদাব রাগ করে বললে, 'আর তুমি কি ?'

: আমি আশরফও নই, আতরাফও নই। আমি হক। মানাউল্লা হক। হক মানে সত্য, হকিকৎ। জাত বিভেদে আমি নেই। দুদ্দুর গানে শোনোনি ?

এ দেশেতে জাত বাখানো সৈয়দ কাজী
দেখি রে ভাই।
যেমন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সবাই ॥
ব্রাহ্মণের দেখাদেখি

কাজী খোন্দকার পদবী রাখি
শরীকী কওলায় ফাঁকি দিয়ে সর্বদাই ॥
জোলা কলু বা জমাদার যারা
ইতর জাতি বানায় তারা
এই কি ইসলামের শরা
করিস তারই বড়াই ?

যেন একটা স্বস্তিকর জায়গায় পা রাখতে পাবলাম এতক্ষণে। মুসলমান সমাজেই প্রতিবাদ উঠেছিল তাহ'লে ? লালনের শিষ্য দুদ্দু ইসলামের শরা বা শরীয়ত বিরোধী এই শ্রেণী বিভেদের প্রতিবাদে ব্যঙ্গ করেছেন। এতে তো একটা সমাজসত্যও আছে বোঝা যাচ্ছে। ব্রাহ্মণের শ্রেণীবৈষম্যের আদলেই কি তবে বাংলার মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ-আরজল ? দেলদারের মুখ থমথমে। নিজামী খুব খুশি। সম্মেলনে ফেরার পথ টুকু সে সঙ্গ নেয়। অনর্গল বলে চলে, 'আমাকে সবাই গাঁজাখোর পাগল বলে। কিন্তু আপনাকে বলছি আমাদের বাউল-ফকিরদের জন্ম এই জায়গা থেকে—এই বিভেদের প্রতিবাদে। বৈদিক ধর্ম আর বামনাই সবার সর্বনাশ করল।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা তোমরা যে নিজেদের মারফতী বলো তার মানে তুমি অর্থাৎ নিজামী কি করেছ ?'

: শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা জানেন তো ? পীর মুরিদি ব্যাখ্যা আরেক রকম আছে। সেটা পয়ারে। যেমন—

শরীয়ত বৃক্ষ জানো হকিকৎ ডাল।
তরিকৎ বৃক্ষপত্র মারফত ফল ॥
মারফত পূর্ণ নহে বিনা শরীয়তে।
শরীয়ত পুরা নহে বিনা মারফতে ॥

শরীয়ত গাছ কিন্তু নিষ্ফলা গাছের মূল্য কি বলুন ? হকিকৎ হলো পথ অর্থাৎ ডাল, যাতে ফল ধরবে। তরিকৎ পাতা অর্থাৎ আইনকানুন, যার ছায়ার আওতায় ফল ধরবে। ফল ধরাটাই আসল। কিন্তু গাছ তো চাই। সেটুকুই শরীয়ত। আমাদের মুর্শেদ আবার আরেক রকম করে বোঝাতেন। বলতেন,

শরীয়ত মানে হলো দল।
দলকে পরিচালনার রাস্তা হলো তরিকৎ।
ঐ রাস্তা চলতে হলে হক্ ধরো, সেটাই হকিকৎ।

যাবে কোথায় ? মারফত।
মারফত মানে গোপনতত্ত্ব।

এবারে নিজামীর নিজের ব্যাখ্যা শুনবেন ? মারফত মানে গোপনতত্ত্ব—সেই তত্ত্ব নিজে নিজে জানা যায় না। জানতে হয় গুরুর মারফত, বুঝতে হয় দেহের মারফত, সে সাধন করতে হয় শ্বাসের মারফত। একেই আমি বলি মারফত।

আমি বললাম, 'তোমার সবটাই যে ভুল তা শোধরাবে একদিন মারের মারফত। বুঝেছ ?

'হা হা, আল্লা আল্লা' নিজামী তুড়ি মেরে বুকে দুটো ঘুষিও বসালো। তারপর বলল, 'কেবল মার, কেবল মার। সারা দেহে আমায় মারো আল্লা, কেবল লা-মাকান বাদে।'

: সে আবার কি ? লা-মাকান কাকে বলে ?

: কোনো পয়গম্বর সে পয়গম আপনাকে শোনায় নি বুঝি ? তবে নিজামীর মুখে শাস্ত্র শুনুন, পাগলের পাঁচালী। আল্লা যখন মানুষের ধড় বানালেন তখন আত্মাকে পাঠালেন তার ভেতরে। আত্মারাম ছটফট করে বেরিয়ে এল ধড়ের ভেতর থেকে। বলল উরেব্বাস্ জ্বালা জ্বালা। ধড়ের মধ্যে সব জায়গায় শয়তান রয়েছে। তখন আল্লা মানুষের ধড়ের যেখানে হৃদ্‌পিণ্ড তার দু-আঙুল নীচে বানালেন লা-মাকান্। ঐখানে শয়তান কিছুতেই যেতে পারে না। ঐখানে আল্লা থাকেন।

: আর নফ্‌স ?

: নফ্‌স বলতে আমরা ফকিররা বুঝি বীর্য বা শুক্র। এই নফ্‌সকে রোখা কঠিন। তাকে রুখতেই আল্লা সৃষ্টি করেছেন নবীর। কিন্তু মানুষ অন্ধ তাই নিজের পরিণাম দেখে না। মানুষ কালা তাই নবীর উপদেশ শোনে না। নফ্‌সকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করলেই খোদা মিলবে। নফ্‌সের গোলামী করলেই শয়তান এসে ধরবে। মনসুরের পদ শোনেন,

নফ্‌সে খোদা নফ্‌সে শয়তান
করি নফসের তাঁবেদারি।
মায়া-বেড়ি পায়ে পরেছি,
নারীর ফাঁদে ঘুরিফিরি।

: নফ্‌স রক্ষার জন্যে তোমরা আল্লার মেহেরবানি চাও না ?

: আল্লার মেহেরবানি তো সব সময়ই দোয়া কবি। তবে মারফতী পথে বড়

কথা আপ্ত সাবধান। নিজের অসাবধানতার জন্যে খোদাকে টানা কি ঠিক? সেইজন্যেই বলেছে,

আপন হাতে জন্মমৃত্যু হয়
খোদার হাতে হায়াৎ মউৎ কে কয়?
বীর্যরস ধারণে জীবন
অন্যথায় প্রাপ্তি মরণ
আয়ুর্বেদ করে নিরূপণ করি নির্ণয়॥
নিজে বীর্যক্ষয় করে
পশুর মতো পথে পড়ে
কতজনে যায় মরে খোদার দোষ দেয়॥

হা হা, আল্লা আল্লা, জীয়নকাঠি আর মরণকূপ দুটোই সামনে রেখেছ। হা হা, এখন নিজামী কোন্টা নেয়। আল্লা কি বলছেন জানেন তো? ফাজকুরুনি ওয়াসকুরুকুম অর্থাৎ আমাকে যে স্মরণ করে আমি তাকে স্মরণ করি। হাহা, আল্লা, নিজামীরও মাঝে মাঝে বিস্মবণ হয়।

যেন ঘোরের মধ্যেই কেটে যায় কতটা সময়। সম্মেলন বিরতিতে খাওয়াদাওয়া চলছে। সবাই অভিযোগ তুললেন, 'তেমন ক'রে আপনাকে পেলাম না।' আমি কি আর বলি? নতুন জগতে দিশাহারা। সহজিয়া বাউলদের জগৎ যদি বা জানি ফকিরদের জগৎ একেবারে অজানা। একটু-আধটু বেনোয়াবি ফকিরের সঙ্গ করেছি বৈ তো নয়। সে আর কতটা? আমি শুধু চোখ মেলে দেখছি অজানা এক জগতের মানুষজনদের।

সামনে বসে সেবা করছেন কত অজানা অনামা ফকির। জানতে হবে এদের করণ কারণ। আধ-পাগল নিজামীর কারবার নয়। ওতো রসখ্যাপা। মনজুর এসে বলল, 'আব্বাজী ডাকছেন আপনাকে'। গেলাম মযহারুল খাঁর ঘরে। বললেন, 'কথাবার্তা কই হলো না তো? এসব মেলা মচ্ছবে কি কথা হবার জো আছে? আজ আছেন তো? রাতে কথা হবে।'

বললাম, 'না। আজ দুপুরেই চলে যাব। মনে দুঃখ রাখবেন না। আসব আবার খুব শিগগির। আসতেই হবে। জানতে চাই অনেক কিছু। বলবেন তো?'

আমার দুটো হাত দুহাতে চেপে ধরে চাপ দিয়ে মযহারুল বললেন, 'আজকে যে চলে যাচ্ছেন বুকে দাগা দিয়ে তার শোধ হবে আবার এখানে এলে। সত্যিই আসবেন তো? ফকিররা ফাঁকা কথায় আর পোশাকে ভোলে না।'

যাব বললেই কি যাওয়া যায় ? তার প্রস্তুতি নেই ? আমার ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষভাবে মানসিক প্রস্তুতির কথাই ওঠে। মযহারুল ফকিরের কাছে যাবার আগে ফকিরদের বিষয়ে একটু লেখাপডা সেরে নিতে সময় লাগল। মানুষটার কাছে জানতে চাই তো অনেক কিছুই, কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে ? সেইটা ঠিক কববাব জন্যে বফিউদ্দিনেব লেখা বাঙালি মুসলিমদের সম্পর্কে লেখা ইংবিজি বইটা পড়ে নিলাম। ফবাজী আর ওয়াহাবি আন্দোলনের পটভূমি ও পরিণতিব ইতিহাস নানা বই থেকে চেখে নিলাম। সেই সঙ্গে এই শতকের গোড়া থেকে শুদ্ধ মুসলমানদেব সঙ্গে মারফতী ফকিরদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কিছু বিববণ জানা গেল। শুদ্ধতাবাদীদের লেখা কিছু বুকলেট নানা লাইব্রেরির ইতিউতি মিলে গেল। পীরবাদ আব ফকিরী মতেব সঙ্গে নৈষ্ঠিক মুসলমানদেব সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বেশ পুবনো।

১৯৩৫ সালে এনামুল হক তাঁব বঙ্গে সুফী প্রভাব' বইতে সরাসবি লিখেছেন, 'উনিশ শতকে চাবিদিক হইতে বাউলদিগকে ধ্বংস কবিতে আয়োজন চলিতে লাগিল। এই সময মুসলমানদেব মধ্যে দুইজন খ্যাতনামা সংস্কারক দেখা দিলেন। ইঁহাদের নাম মৌলানা কিরামৎ' অলী (মৃত্যু ১৮৭৩) ও হবাজী শরী' অতুল্লাহ্। মৌলানা কিরামৎ' অলীব প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তরবঙ্গ এবং হবাজী শরী' অতুল্লাহ্-এব বাড়ি ও কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্ববঙ্গ (ফরীদপুর)।'

এখানে বাউল বলতে বুঝতে হবে ফকিবদেরও। শুদ্ধতাবাদীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন লালন ফকিব ও তাঁর আচবিত মত। মৌলানা রেয়াজুদ্দিনের 'বাউল ধ্বংস ফতোযা' সবচেযে কড়া বই এ ব্যাপারে। এ ছাড়া মহম্মদ আলীর 'মিথ্যা পীব', ফজলে রহিমের 'পীর মুরিদ' মহম্মদ সৈয়দের 'মারফত নামা'—এসব বইতে ধবা আছে নানা ঝাঁঝালো বক্রভাব। একটি পুঁথিতে ইসলামের শেষ অবস্থাব (কিয়ামত) বিষয়ে আশঙ্কা করে লেখা হয়েছে .

ইমাম গজ্জালি লেখেন কিতাবে।
কিয়ামতের তিন নিশান জানিবে ॥
বেশবা দরবেশ হবে যেই কালে।
কিয়ামত হবে যেন সেই কালে ॥
দলিল মতে আলেম নাহি চলিবে
কোরাণ ও হাদীশ কেবল পড়িবে ॥
আমীর সর্দার যত দুনিয়ার।
জাহেল হইবে তারা একেবার ॥

এই তিন গোরো যবে হইবে।
মুসলমানী আর নাহি রহিবে ॥
সেই অক্ত এবে বুঝি আসিল।
বেশরা ফকির বহুত হইল ॥
জাহিল সর্দার যত আছিল।
বেশরার কাছে মুরিদ হইল ॥
বেদাতী আলেম যত দুনিয়ার।
ঝুটা দরবেশের তারা হয় ইয়ার ॥
মুসলমানী এবে গেল হায় হায়।
কিয়ামত আসিল এবে বোঝা যায় ॥

একজন ধর্মভীরু মুসলমান সমাজের আরেক দুর্লক্ষণ আবিষ্কার করে লেখেন .

যুবতী আওরত যত ফকির হইল কত
স্বামী ছাড়ি পীরের সঙ্গে যায়।

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত রশিদের পদে নতুন ফকিরদের করণ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রশিদ দুঃখ করে বলছেন :

হয়েছে এ জগতে ভেদে-ফকির কতজনা।
বেদ-ছাড়া সেই ভেদে-ফকির বেদ বিধি কিছু মানে না ॥
এই মূল ভেদের কথা বলো না যথাতথা
নরনারী মিলে কর উপাসনা—
রস ধ'রে উপরে চালাও নীচেতে স্থিতি ক'রো না ॥
পঞ্চরস সাধনেতে পাক না-পাক নাই তাতে
গরলচন্দ্র ধরে লয়ে করেঙ্গাতে
বীজ ধরে ভক্ষণ করে জন্মমৃত্যু আর হবে না ॥

এখানে স্পষ্টতই পরকীয়া রসরতির সাধনা, রজবীর্য পান সম্পর্কে অনীহা ঘোষিত হয়েছে। ফকিরদের আচরিত দেহযোগ সম্পর্কে কটাক্ষ আছে। এরপরে কঠিনতর বিদ্রূপে রশিদ বলেন,

তোমার সেবাদাসী গুরুসেবায় দিলে
পারের ভয় রবে না।

সেই সময়ে ফকিরী মতের প্রবলতা আর নানা ধারা সম্পর্কেও রশিদের লেখা অন্য এক পদে কিছু ইঙ্গিত আছে। যেমন,

কলির ভাব দেখে ভাই ভেবে ভেবে মরি
কতজনে কত মতে করতেছে ফকিরী।
কেউ বলে বাতাস আল্লা কেউ বলে আগুন আল্লা
কেউ বলে পানি আল্লা আল্লা হলো ভারী।
কেউ বিন্দুমণি খোদা জেনে করতেছে ফকিরী ॥
কেউ বলে সাঁই নিরাকারে ভেসেছিল ডিম্ব ভরে
বিন্দু ছুটে ডিম্বের গঠন করছে আইন জারি।
কেউ বলে ফাতেমা হয় আল্লার জননী
তবে হজরত আলী আল্লার বাবা ভাবে বুঝতে পারি ॥

ফকিররা এসব গানেব জবাবী গান খুঁজে নিত লালনের রচনায়, দুদ্দুশা'র রচনায। তারা গাইত,

কল্‌মা আর নামাজ রোজা যাকাত হজ—
এই পড়িয়ে আদায় কর শরীয়ত।
আমি ভাবে বুঝতে পাই
এসব আসল শরীয়ত নয়
আরো কিছু অর্থ থাকতে পারে ॥
বে-এলেম বে-মুরিদ জনাঁ
শরীয়তের আক চেনে না
কেবল মুখে তোড় ধরে ॥

এ লডাই আজকের নয। এক দিনেরও নয়।

কেউ যেন না ভাবেন যে পীর ফকিরবাদের সঙ্গে শরীয়ত পন্থীদের এই মতাদর্শের সংঘাত কেবল পশ্চিমবাংলাতেই আবদ্ধ। আসলে বাংলাদেশে এই সংঘর্ষ এখন খুব চরম পর্যায়ে। ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে সেখানে শরীয়তী আইনের দাবি অনেক জোরালো এবং মারফতীদের সেখানে আত্মরক্ষার সংগ্রাম অনেক জটিল। 'আল্‌ সাদীদ' নামে এক পুস্তিকার শেষে লেখক আতিয়ার রহমান ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে লিখছেন : 'সমাজবাদ-মার্কসবাদ-ওয়াশিংটনবাদে বাংলার মুক্তি নেই। বৃহত্তম মুসলিম জাতির দেশ—এই বাংলাদেশে শরীয়তী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাতেই দেশ ও জাতির উন্নতি নিহিত রয়েছে।' ম. আ. সোবহান

তাঁর 'জালালী ফয়সালা' বইয়ে লালনের মাজার ধ্বংস করার আবেদন করেছেন।

এই সোবহান সাহেব ১৯৮৬ সালে কুষ্ঠিয়ায় 'পীর মুরিদী অবৈধ' এই মর্মে যে ভাষণ দেন তা ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন,

> আমরা এমন একটা দেশের বা অঞ্চলের মুসলমান যে ভূখণ্ডে পীর-মুরিদী কলমিলতার মতো ছেয়ে গেছে অনেক কাল হতেই।···
> আপনারা জানেন যে আমি একজন বিতর্কিত লোক। পীর-মুরিদী, মিলাদকিয়াম, ইছলে-ছওয়াব, ওরশ ইত্যাদি বেদাতের বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তি ও বাহাছ চালিয়ে যাচ্ছি আজ অর্ধযুগ ধরে।·· বাংলার বুকে এমন পীর নেই যে আমি তার বিরুদ্ধে বাহাছ করি নি। ফুরফুরার পীরদেবকে আমরা পান্টি, ভায়লা, মুন্সীপুর-কুতুবপুর, কীর্তিনগর এবং যশোবের বেণিপুর হতে মুকাবিলা ক'রে হটিয়ে দিয়েছি। আজকের সবচেয়ে বড় পীর সরকারি পীর অর্থাৎ জবরদস্ত গরুখোর আটরপীর পীরের প্রায় এক ডজন আলেমদের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ার শহরতলী জুগিয়া গ্রামে বাহাছ করেছি। এই বাহাছে তাদের যে কি ন্যক্কাবজনক অবস্থা হয়েছিল তা আপনারা অনেকেই দেখেছেন।···অনেককে দাড়ি চেঁছে পলায়ন করতে হয়েছে। শম্ভুগঞ্জের পীর, রাজশাহীব ওলাউল্লাহ পীর, বগুড়ার পীর, দহগ্রামের পীর, রংপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, ঢাকা, টুঙ্গী এলাকায় এবং বিশেষ করে পাবনা জেলার সকল পীরদের বিরুদ্ধেই আমাব মুকাবিলা হয়ে গেছে।

আসলে এত যে লড়াই, বাহাস আর মুকাবিলা এর পেছনে যত না ধর্মের উন্মাদনা ও অন্ধতা তার মূলে কিন্তু প্রধানত গ্রাম্য মনোভাব কাজ করছে। নগরজীবনের দুটি মূল লক্ষণ হলো উদারতা ও উদাসীনতা। বফিউদ্দিন আমেদ তাঁর 'The Bengal Muslims 1871-1906' বইতে এক দিকনির্দেশী মন্তব্যে জানিয়েছেন : As a community, the Muslims were over whelmningly rural in character and they contributed only a fraction of the urban population.' রফিউদ্দিন আরেক অসমতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : Equally interesting and significant is the pattern of distribution of Hindus and Muslims in the various professions. Whenever the Muslims formed the bulk of the population, as in eastern Bengal, they belonged predominantly to the cultivating classes, while land-holding,

professional and mercantile occupations were dominated by the high-caste Hindus.

এইখানে রয়ে গেছে বঞ্চনা আর ধন বৈষম্যের এক দীর্ঘ ইতিহাস। গ্রাম্য জীবনের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ চিরকাল থেকে গেছে গরিব চাষির ভূমিকায আর আচাব-অনুষ্ঠান, আর্থিক সমুন্নতি ও সাংস্কৃতিক উচ্চাসন অধিকার কবে বেখেছে বর্ণ হিন্দুগোষ্ঠী। তাঁর ফলে মুসলিম সমাজ রয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত নিরক্ষব ও গ্রাম্য। তাঁদেব কাছে উদারতা ও স্বধর্মের উপগোষ্ঠী বিষয়ে উদাসীনতা কি ব্যাপকভাবে আশা কবা চলে? তাছাড়া দেশের একটা নিজস্ব ধারাও তো আছে। এক সময় যাঁবা ছিলেন হিন্দু তাঁরাই তো হয়েছেন ধর্মান্তরিত মুসলমান। হিন্দু আচাব অনুষ্ঠান, সংস্কাব ও সামাজিক রীতিনীতি কি তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলতে পারেন? সেকালের গ্রাম্য মুসলমানদের হোলী, দেওয়ালী, ভাইদ্বিতীয়া, বাউনি-বাঁধা, গোমাতাপূজা, লক্ষ্মীবার মেনে চলা এইসব হিন্দুয়ানী দেখে পরম দুঃখে মুন্সী সমীরুদ্দিন লিখেছিলেন,

দেসের বেদাত থোড়া হৈল ফের মনে।
তাহার বযান কহি শুন সর্ব্বজনে ॥
হুলি দেওলি আব জিতিয়া দুতিয়া।
বাউনি সাঁকরাত করে এছলাম হইয়া ॥
ভাইফোঁটা গরু পবব করে মোছলমানে।
লক্ষ্মীবারে কর্জ্জ দিবা লিবাতে বারণ।
দেসেব বেদাত এইছা কি কহিব কায় ॥

ওয়াহাবি আব ফরাজি আন্দোলনের মূলে শুদ্ধ ইসলামি-করণের পাশাপাশি আন্দোলনকারীরা চেয়েছিলেন পীর ফকিরদের কবর-মাজার পূজার উচ্ছেদ, মারফতীদের পরকীয়া সাধনা ও গানবাজনাকে খর্ব করতে। গুরুশিষ্যবাদকে তাঁরা মানেননি। তাঁদের আর এক প্রতিবাদ ছিল ফকিরদের এই ঘোষণায় যে আল্লাকে দেখা যায়। আন্দাজী সাধনায় ফকিরদের আপত্তি ছিল। শক্তিনাথ ঝা তাঁর এক নিবন্ধে ('বাউল দর্শনে ভারতীয় বস্তুবাদের উপাদান', অনীক, ডিসেম্বর ১৯৮৫-জানুয়ারি ১৯৮৬) আলেপ নামে এক পদকারের দুটি চমৎকার উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে দিয়েছেন। যেমন :

১) না দেখে রূপ মহম্মদার কি করে ভজি
কেবল শুনি কর্ণেতে দেখিনিকো চখেতে।

২) অনুমানে সাধন কেনে হবে রে ঠিক
রূপ দেখে সাধ তাকে তবেত হইবা রসিক।

ইসলামে 'সেজদা' বা প্রণাম খুব গুরুতর বিষয়। আল্লা ছাড়া কাউকে সেজদা দেওয়া হারাম। নামাজে সেজদা এক উল্লেখ্য পর্যায়। অথচ অদৃশ্য আল্লাকে সেজদা দিতে চান না মারফতী ফকিররা। তাঁদের বক্তব্য, যেমন আবেদের পদে,

না দেখে সেজদা করা মেহন্নত বরবাদ গুণায় ধরা
না দেখে তার নামে সেজদা করে যত ধোপার গাধা।

উল্টে ফকিররা সেজদা করেন গুরু মুর্শেদকে, শ্রদ্ধেয় আর পূজ্যদেরও। তাঁবা ব্যক্তির (খদ্) মধ্যে দেখেন খোদাকে। আসলে মারফতীদের প্রধান প্রতিবাদ ইসলামী বাহ্য আচরণবাদের বিরুদ্ধে। তাই কলমা, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, এই পাঁচ শরীয়তী কৃত্য তাঁদের টানে না। এই খানে উদ্যত হয় তীব্র ভুল বোঝাবুঝি। বাহাস বা বিতর্ক দিয়ে যে সংঘাতেব শুরু হয় তার পরিণাম ঘটে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বা রুহুলের মতো বাধ্যতামূলক বাস্তুত্যাগে।

ইসলাম সমাজ নারীদের পর্দাপ্রথায় যেমন সতর্ক তেমনই তাদের যথেচ্ছ আচার আচরণ সম্পর্কে সচেতন। বেনামাজী নারী বা ফকিরদের সঙ্গিনীদের গোড়া মুসলমান কখনও ক্ষমা করেনি। 'যুবতী আওরত যত/ ফকির হইল কত/ স্বামী ছাড়ি পীরের সঙ্গে যায়'—এই বর্ণনায় ধরা আছে এক সময়কার গ্রাম্যসমাজের পীর মুর্শেদদের অপ্রতিহত বিজয়বার্তা, বিশেষত অন্তঃপুরে।

প্রতিবাদে কট্টর সমাজ নির্দেশ দেয় :

বেনামাজি আওরত যদি কাহার ঘরে হয়।
তালাক দেনা মস্তাহাব কেতাবেতে কয় ॥
তালাক দিয়া করিবে দূর সেই দুরাচার
ঝাড়ু মারিবেক তার শিরের উপর ॥

এইসব সংঘাত, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের ইতিহাস মাথায় রেখে আমি মযহারুল ফকিরের গূঢ় আলোচনার প্রসঙ্গ তৈরি করতে থাকি। হঠাৎ খেয়াল হয় সহজিয়া বৈষ্ণব আর বাউলদের সঙ্গে মারফতী ফকিরদের বহু রকম পার্থক্য থাকলেও একটা জায়গায় খুব বড় মিল আছে। এই তিন দলই 'দুই চন্দ্র' অর্থাৎ মলমূত্র এবং 'চারচন্দ্র' অর্থাৎ মল মূত্র রজ বীর্য মিশিয়ে পান করেন ও গায়ে মাখেন। এই আপাত ঘৃণাযোগ্য আচরণ বহু মানুষকে অবাক করেছে। কিন্তু এই পদ্ধতি তলিয়ে বুঝতে চাননি। শিবাম্বু বা মূত্রপান এখন অবশ্য শিষ্ট সমাজকে নাড়া

দিয়েছে। এব শারীরিক উপকারিতা বিষয়ে বই বেরিয়েছে অনেক। স্বমূত্র পানের মত স্ববীর্য পানের ধারাও এদেশে বেশ পুরনো। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ সংখ্যায় 'বাউলদের যৌন জীবন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ' নিবন্ধে এক আশ্চর্য বিশ্লেষণ চোখে পড়ল, তাতে বিশেষ প্রতিবেদক লিখেছেন,

> একটি সত্য এই যে, মানুষেব শবীরে দুটি চেতক এন্টিজেন আছে যা শরীরেব প্রতিরোধ পদ্ধতির (Immunological system) অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দুটি হ'ল চোখের জলের জলীয পদার্থ বা অশ্রু এবং বীর্য। আমাদের চোখেব জলীয় অংশ বা শুক্রের অংশ কোনক্রমে রক্তে মিশলে বিশেষ এন্টিবডি উৎপন্ন কবতে পাবে।
>
> সম্ভবত ঐ বীর্যপানবত পুরুষ নিজেব বীর্যদ্বারাই শরীরে এন্টিবডি উৎপন্ন করবে এবং তাতে শুক্রাণুর উৎপাদন অবশ্যই অল্প হবে। তাই দেখা যায়, বাউলদের সন্তান সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তবে স্মরণযোগ্য, নারী কখনো এই বীর্যপান করে না।

এমনতর তথ্য জেনে বিশ্লেষণ করে মনে হয় আমাদের লোকায়তিক জীবনে দেহকে ঘিরে একটা আলাদা সমাজতত্ত্ব চালু আছে। তার আচার সংস্কার খুব জটিল আর গোপ্য। এই গোপনচন্দ্র সাধনার নানা সাংকেতিক নামও আছে। কেউ বলে রসরতির সাধনা, কেউ বলে মাটির কাজ। সাধারণভাবে রস মানে মূত্র, রতি মানে শুক্র, রক্ত মানে রজ, মাটি মানে মল। গানে এদের আদ্য চন্দ্র, সরল চন্দ্র, গরল চন্দ্র, রুহিনী চন্দ্র এইসব শিষ্ট নামের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়। মযহারুল খাঁ-র কাছে যাবার আগে হঠাৎ মনে পড়ল বিমল বাউলের কথা। আমাদের মফঃস্বল শহরের একটেরে চামার পাড়ায় বিমল আর তার সঙ্গিনী থাকে। বাউল মতে সাধন ভজন করে। শান্ত নির্বিরোধ মানুষ। চুল দাড়ি আছে, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, কাঁধে ঝোলা, ঝোলায় নারকেল মালার করোয়া। বিমলের সাধনা আর জীবিকায় মিল নেই। সে একটা দেশী পাউরুটি কারখানার হেডমিস্ত্রি। আমি যে দিন আগে থেকে খবর দিয়ে বিমলের বাড়ি যাই সেদিন সে স্পেশাল কেক নিজের হাতে বানিয়ে আনে বেকারি থেকে। সত্যি বলতে কি, বাউল বৈরাগীদের বাড়ি কেক সেবা যেমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তেমনই আশ্চর্য বিমলের খোলামেলা স্বভাব। সে আমার কাছে কিছুই গোপন করে না।

সেই কথা ভেবে একদিন হঠাৎ গেলাম বিমলের আশ্রমে। তার সঙ্গিনী চা-বিস্কুট খাওয়াল, সাধনভজনের কথা কিছু ওপর-ওপর হলো। তারপরে বাড়ির

উঠোনে এক তমাল গাছের নীচে শান বাঁধানো চত্বরে আমি আর বিমল বসলাম। সন্ধে ঘনিয়ে এল। আমি তখন বললাম, 'কোনোদিন তোমাকে জিগ্যেস করিনি, আচ্ছা তুমি চারচাঁদ সেবা কর?'

বিমল কোনো কিছুই প্রায় আমার কাছে গোপন করে না তাই কাঁধের ঝোলা থেকে কালো রঙের করোয়া বার করে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন এতে করেই আমি রসপান করি।'

: দিনে রাতে কতবার?

: যতবার ইচ্ছে। সবটাই তো উবগার।

: আমাকে বেনোয়ারি ফকির বলেছিল, রাতে শুয়ে পড়ে যে ভাত-ঘুম আসে সেই তন্দ্রার পরে যে প্রস্রাব তাতে নাকি গন্ধ থাকে না। শরীরের পক্ষে উপকারী খুব।

: এ বিষয়ে নানা মত আছে। তবে চারচাঁদ খুব কঠিন সাধনা। শরীর মন খুব বশে থাকলে তবেই এসব করা চলে। নইলে ক্ষতি হয়।

: ঠিক বলেছ। একবার বেনোয়ারি বলেছিল, চারচাঁদ করলে বাইরে বেরোনো একেবারে নিষেধ। শরীরে রোদ লাগানো মানা। তবে চারচাঁদ যদি একবার ধাতস্থ হয়ে যায় তবে অঙ্গ হবে গৌরকান্তি। আচ্ছা বিমল, তুমি চারচাঁদ করছ বা কর এখন?

বিমল বলল, 'আপনার কাছে অজান রাখব না। আমি মাটিটা সেবা করতে পারি না। ঘিন্না লাগে। অন্য তিন চাঁদ চলে। তার পদ্ধতি আছে, মাত্রা আছে। আর কিছু জানতে চাইবেন না। একটা গান শুনুন বরং।

> আমাদের চিরকালের এই ধারা
> মানি না কেতাব কোরাণ নবীজির তরিক ছাড়া।
> মশরেকী তরিক ধ'রে চন্দ্র-সূর্য পূজা ক'রে
> পঞ্চরস সাধন করে চন্দ্রভেদী যারা।
> সরল চন্দ্র গরল চন্দ্র রুহিনী চাঁদ ধারা—
> রজে বীজে মিলন ক'রে পান করেছি সারা॥'

আমি বললাম, 'তোমাকে বেশি বিব্রত করতে চাই না। রজ বীজের মিশ্রণ তোমরা কী ভাবে খাও?

: ওই দুই পদার্থ জলে মিশিয়ে কপ্পুর আর চিনি দিয়ে সরবতের মতো খাই।

মানুষের সংস্কার আর রুচিবোধ খুব নিয়ন্ত্রক সন্দেহ নেই। বিশ বছরের বেশি এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে ঘুরছি তবু ঠিক মিশে যেতে পারিনি। বিমল আর আমি

বসে আছি পাশাপাশি তবু অস্পর্শ ব্যবধান। সে কি ঘৃণা ? অখাদ্য আর খাদ্যের শ্রেণীকরণ কে করেছে ? রুচিবোধই কি খাদ্যাখাদ্যের সীমা ঠিক করে ?

মনে পড়ল এলা ফকির আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের এই পথ বড় কঠিন। আগে মন তৈরি কব তবে দেহ সাড়া দেবে। আমরা তাই বলি, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। মনেই লজ্জা ঘৃণা ভয়। যা জানি না তাতেই ভয় থাকে। যা রুচিতে মেলে না তাতেই ঘৃণা। লজ্জা মানে লোকলজ্জা।'

খুব সত্যি কথা। আমার-পাশে-বসা পাউরুটির কারিগর বিমল এই মুহূর্তে আসলে এক নিরঞ্জন জায়গায় বসে আছে। সে সামাজিক মানুষ অথচ লজ্জা ঘৃণা ভয়ের উর্ধ্বে। সে কিছু গোপন করছে না। গোপনীয় মনে করছে না। অবিবাহিতা সাধনসঙ্গিনীকে সে মর্যাদা দেয়, ভালোবাসে। তার সমাজ ভয় নেই। ঘৃণা নেই। তাই কিছু হারাবার ভয়ও নেই তাব। আমিই শুধু সিঁটিয়ে যাচ্ছি। কার জীবনদর্শন সঠিক ?

যাকে স্পষ্টতই তেমন জানি না, যার রুচিবোধ বিষয়ে ঘৃণা বোধ করছি, তার সম্পর্কে উদাসীনও থাকতে পারছি না কিন্তু। সে অবশ্য আমাদের উচ্চ ভোগসুখের জীবন বিষয়ে খুব নিস্পৃহ। সমাজনীতি সুস্থ জীবনধারণ বিবাহবন্ধন পুজো-আচ্চা কিছুই সে মানে না। তবু আত্মস্থ ও আনন্দিত। তার সঙ্গিনী বয়স্থা আর অসুন্দরী। সবই আশ্চর্য। সভ্য শিক্ষিত মন দাবি করছে বিমল পারভার্ট। মযহারুল খাঁও কি তবে বিকৃতরুচি ? কি করে হবে তা ? তিনিতো বিবাহিত, সংসারী, সন্তানের পিতা। ফকিরী মানেই বিকৃতি কে বলেছে ? বাউল মানেই কামনাকলুষিত ?

সাত-পাঁচ উথাল-পাথাল ভাবনার ঝাপটায় মন দোলে আমার। শেষ পর্যন্ত বিমলকে বহুক্ষণ ধরে চেপে রাখা কথাটা বলে ফেলি, 'আচ্ছা, বল তো, তোমাদের রসরতির সাধনা আমি বুঝি, সে তো নিজের কাছেই শরীরের মধ্যে আছে। রজ তোমরা কোথায় পাও বল তো ?'

বিমল খুব নিচু গলায় বলল, 'এটা খুব গোপন ব্যাপার। আচ্ছা বলুন তো আমি কেন চামার পাড়ার এদিকে থাকি ?

: সেতো সোজা উত্তর। তুমি অসামাজিক জীবন যাপন কর। তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নেই, অন্য সঙ্গিনী নিয়ে থাক। বনেদী পাড়ায় কি তা চলবে ?

: হু। সেটা একটা কারণ। আসল কারণ হলো, এটা যাকে আপনারা বলেন ছোটলোকের পাড়া। ছত্রিশ জাতের বসতি ? এখানে সমাজের অত বন্ধন নেই। খোঁজ নিয়ে দেখবেন বেশির ভাগ স্বামী স্ত্রী আসলে বিয়ে করা নয়। হয়তো কালীবাড়িতে একটা মালা-বদল হয়েছে। ভাব-ভালোবাসা হয়েছে। থাকে

একসঙ্গে। সন্তান হয়। ছাড়াছাড়িও হয়। এরা কিন্তু বাউলবৈরাগীদের খুব মান্যতা দেয়। খুব ভক্তি। খুব সেবা দেয় ডেকে নিয়ে গিয়ে।

: কেন ?

. ওদেব তো বামুন পুরুত নেই। উঁচু সমাজে যাতায়াত নেই। অথচ খুব পাপের ভয়। সব দেখবেন গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। পরকালের ভয় আছে তো ? খুব গুরু সেবা দেয়। কেউ না কেউ গুরু একটা আছেই ওদের। গুরু যা বোঝায় তাই বোঝে। তবে কি জানেন, সব গুরুর দৃষ্টি তো ভালো নয়, সবাই সাধকও নয়। সুযোগ নেয় অনেকে। গুরুসেবার নামে ব্যভিচার আকছার।

আমি বললাম, 'তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ? তুমি তো আর গুরুগিরি কর না।' লম্বা জিভ কেটে বিমল বলল, 'ছি ছি, আমি গুরু হব কি ? আমার ষোল-আনা শিক্ষাই যে হয় নি। আসলে আমরা কিছু ওষুধ বিষুধ জানি। তুকতাক, মুষ্টিযোগ, জড়িবুটি। বিপদে আপদে দিই, ওরাও আমাকে দেয়।'

উত্তেজনা চেপে বললাম, 'তোমাকে দেয় মানে ? আমি যা ভাবছি, যাকে বলে রজ, তোমাকে দেয় ?

: দেয়। আমি না চাইলেও দেয়। বাড়িতে এসে গোপনে দিয়ে যায়। সেটাই ধর্ম।

: কিসের ধর্ম ? কে বলেছে ?

: উহুঁ, অত চটবেন না। ওরা ওটাকেই ধর্ম বলে মানে। আপনি বাধা দিতে পারবেন ? ওদের শিখিয়েছে ওই ভাবেই।

: কে শিখিয়েছে ?

: কেন বাউল-ফকিরেরা। সে কি আজ ? শতশত বছর এমন চলছে। বাউলদের কাছে ওরা দেহের কত কি শেখে জানেন ? আর একটা কথা বলি। জেনে রাখুন, এই-সব পরিবারে কোনো কুমারী মেয়ে যখন প্রথম রজ দেখে তখন তা দান করে আমাদের। দান করবেই। আমরা তা সেবা করবো। অনেক তপস্যাতে ঐ সব মেলে। সেবা করলে বিরাট শক্তি আসে। এবারে বুঝেছেন তো কেন এখানে থাকি ?

বলতে গেলে অনেকটাই বুঝে ফেলে আমার ভেতরে বিপ্লব চলছে। মানুষের অজ্ঞতা একটা আশীর্বাদ সন্দেহ নেই। জীবনের বেশ কিছু রহস্য অপ্রকটিত থাকাই ভালো। তাতে স্বস্তি। নিম্নবর্গের সমাজজীবনে এখন থেকে একটা অস্বাক্ষরিত চুক্তির লেনদেন আমার আর গোপন থাকবে না। শ্রমজীবী পুরুষ-নারী দেখলেই উদ্যত হবে সন্দেহের তীর : এরাই কি ? এরাও কি ? রাজনীতি সমাজতত্ত্ব নির্বাচন রাষ্ট্রবিপ্লব আর আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কার আড়ালে

বয়ে যাবে এক চোরা স্রোত। দেহ, দেহ-সংস্কার, যৌনতা, বিন্দুধারণ, নিয়ন্ত্রণ। শরীরী ভাবনা। রাত যেমন করে দিনের আলোর মধ্যে লুকিয়ে রাখে তার অন্ধকার, তেমনই বৈরাগ্যের অন্তঃশীল গৈরিকে ভরে আছে কামনাকুসুম।

□

চৈত্রের এক সকালে পৌঁছলাম সেই গোরাডাঙ্গা। সেবার সমস্ত জমিজিরেতে মোড়া ছিল শীতের ধূসর চাদব, এবার তকতকে ঝকঝকে সূর্যের সংসার। উদ্‌ভ্রান্ত বসন্ত-বাতাস আর লাফিয়ে চলা ফড়িং। গ্রামবাসীরা জানতে চাইছে গন্তব্য। মযহারুল খাঁব নাম বলতে সবাই বলছে: 'চলে যান, সোজা ডহর।'

শেষপর্যন্ত সোজা ডহর অবশ্য বাঁক নেয় আর আমার চোখে পড়ে ফকিরের বড় দালানকোঠা। বাইরে অড়হড়ের কেটে আনা স্তূপ। এক পাশে ঘুট ঘুট ঘুট ঘুট শব্দে মেশিনে চলছে গম ঝাড়াই। সেখানকার তদারকি করছে মনজুর। হেসে এগিয়ে এল, 'সত্যিই এলেন তাহ'লে। আসুন। বসুন ঘরে। আব্বাকে ডাকি।'

আব্বা আসার আগেই অবশ্য বাড়ির খুদে ছেলেমেয়েগুলো জটলা করে। অবাক হয়ে দেখে শহববাসী আজব জীবটিকে। আমার চোখ ততক্ষণে উঠোনে। সরষে শুকোচ্ছে। ছোলা গাছ এক পাঁজা আনা রয়েছে। এখনো মাড়াই হয়নি। বাড়ির বউরা বেগুনফুলী আর কটকটে সবুজ শাড়ি পরে গেরস্থালি সামাল দিচ্ছে। সম্পন্ন সংসার। বিস্তার ধর্মী গৃহস্থী।,ধানের তিনটে মরাই কিন্তু গরু নেই তো। গোয়ালই বা কই? মনজুর এসে বলল, 'আব্বা আসছেন নাস্তা সেরে। একটু বসুন।'

আমি বললাম, 'মনজুর, তোমাদের এতবড় সংসারে গরু নেই কেন?'

: ছিল তিন চারটে। বেচে দেওয়া হয়েছে।

: কেন?

: লোকের অভাব। আজকাল তো কিষাণ মেলাই ভার। বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া যায় না। গরু রাখলে জানেন তো গরুর মতো খাটতে হয়। বাড়ির বউরা সব দিক সামাল দিয়ে আর পারে না। তাই...সব দিক ভেবে...আজ থাকবেন তো? গান-বাজনা হবে। সবাইকে খবর দেব।

ইতিমধ্যে মনজুরের মামা খৈবর এসে পড়ে। আগের বার শুনেছি তার বাঁশি-বাজানো। আসলে মযহারুল খাঁ ছেলেদের নিয়ে আর শ্যালক খৈবরকে নিয়ে এক ফকিরী গানের দল বানিয়েছেন। নানা গ্রামে গেয়ে বেড়ায় এই দল।

মযহারুল গান লেখেন। জমায়েতে গানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ক'বার বাংলাদেশে লালন শাহের মাজারেও গেয়ে এসেছে এরা।

প্রায় সমস্ত দরজা জুড়ে মযহারুল ঢুকলেন ঘরে। ছ ফুটের ওপর লম্বা মানুষ, তার সঙ্গে মানানসই রকমের চওড়া। পরনে সাদা শার্ট ধুতি। চেহারা দেখলে ফকির বলে মনে হয় না। আসলে ফকিরীতো একটা দেহগত জীবন পদ্ধতির নাম, সেইসঙ্গে মনেরও উন্নত প্রকর্ষ। বাহ্যিক পোশাক-আশাক চুল দাড়ি যে রাখতেই হবে এমনতো কোনো কথা নেই। তাছাড়া মযহারুল পুরো গৃহী মানুষ। এখন অবশ্য ছেলেরা লায়েক হয়ে গেছে। তারাই দেখে সব দিক। বাবাকে মুক্তি দিয়েছে তাঁর নিজস্ব বৃত্তে।

ব'সে ধাতস্থ হয়ে কথা চালাচালি শুরু হতে একটু সময় লাগল। তার মধ্যে চিঁড়ে-দুধ এল। মনজুর বলল, 'এমন আমাদের গ্রাম যে একটা মিষ্টির দোকান নেই। মিষ্টি আনতে যেতে হয় ছ মাইল দূরে সেই নাজিরপুরে। আপনাকে আদর-আপ্যায়ন করতে পারলাম না। আগে খবর পেলে...'

তার কথা থামিয়ে বলি, 'মানুষের কাছেই তো আসা। খাওয়াটা গৌণ। শুধু দেহরক্ষা বৈ তো নয়।'

বাধা দিয়ে মযহারুল বললেন, 'কথাটা ঠিক বললেন না। এই জগতের নাম দুনিয়া। দুটো জিনিস নিয়ে জগৎ চলছে। কি কি বলুন তো?'

নিজামী বলেছিল, বড়লোক-ছোটলোক, ধনী-দরিদ্র, মনে পড়ল। কিন্তু সে কথা এখানে খাটবে না। তাই চুপ করে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলাম কেবল।

মযহারুল বললেন, 'দুনিয়া মানে দু-নিয়া। সেই দুই হলো জিহ্বা আর লিঙ্গ। এই দুই দিয়ে যাবতীয় আস্বাদন। আস্বাদনই তো বেঁচে থাকা।'

বলতে গেলে প্রথমেই চমকে গেলাম। প্রথমত, তাঁর বস্তুবাদী চিন্তার স্বচ্ছতায় আর দ্বিতীয়, মনজুরের উপস্থিতিতেই তাঁর এই কপট কথা বলার ভঙ্গিতে। মনজুরকেও অবশ্য কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা বিব্রত দেখাল না। সেটাও আমার উচ্চবর্গীয় জীবনযাপনের ধ্যানধারণায় চমকে যাবার মতোই। যাই হোক ক্ষণিক চমক কাটিয়ে উঠে আমি বললাম, 'ঐ আস্বাদনের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করুন একটু।'

: হ্যাঁ, সেটা বোঝা দরকার। দেখুন মানুষের শরীরে আস্বাদন করবার জন্য আল্লা ঐ দুটোর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে মজা আছে একটা। দুটোর দ্বারা একসঙ্গে আস্বাদনসুখ পাবেন না। আলাদা আলাদা।

: কেন?

: ভেবে দেখুন, যখন পোলাও কালিয়া রাজভোগ খেয়ে জিভের সুখ পায়

মানুষ তখন কি তার দেহসঙ্গমের ইচ্ছা হয় ? আবার যে সময়ে কেউ সঙ্গম করে তখন মুখের সামনে পোলাও কালিয়া দিলেও মুখ ফিরিয়ে নেবে। অদ্ভুত আইন। যখনকার যা তখনকার তা। আর ঐ যে বললেন আহার মানে দেহরক্ষা ওটাও হিন্দুয়ানির কথা। উপোস-ব্রত-পার্বণ, দেহকে সংযমে রাখা, ও-সব বাজে। মনের সংযম আসল। আব দেহরক্ষাই তো আসল ধর্ম। আমাদের ফকিরী মতে বলে, পঞ্চভূত ভর করে ফলমূল দানা শস্যে। সেই খাদ্য থেকে শুক্রের জন্ম। শুক্রই জীবন। তার পতনেই মৃত্যু। বিন্দু বক্ষাই তো আমাদের করণ।

খুব স্পষ্ট কথা। স্বচ্ছ চিন্তা। তবু একটু রন্ধ্র খুঁজতেই যেন আমি বললাম, 'বিন্দুর ক্ষয় তো দেহধর্ম। তা কি অস্বাভাবিক ?'

: কেন অস্বাভাবিক হবে ? রিপু ইন্দ্রিয়াদিকেও কিছু দিতে হবে বৈকি। রিপুদমন ব্রহ্মচর্য এসব বস্তুবাদীদের কথা নয়। আমার কি সন্তান হয় নি ?

চা খেতে খেতে মযহারুল শুরু করলেন আবার, 'আমার এখন বয়স ষাট। কুড়ি বছর বযসে বিয়ে হয়েছে। কুড়ি থেকে তিরিশ এই দশ বছর আমি সন্তানের জন্ম দিযেছি। ব্যাস। আমাব দুই বিবি। তিন ছেলে এক মেয়ে। বড় বউয়ের কোলে ছেলে, ছোট বউয়েব কোলে মেয়ে। ব্যাস। আর জন্ম দিইনি।'

: এমনভাবে বলছেন যেন জন্মদান আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার ?

: বস্তুবাদে তো তাই। পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, নারী ক্ষেত্র। বীজ খাঁটি হলে জমি উর্বর হলে ফল হবে। আবাব বীজ বিনা শুধু কর্ষণে ক্ষতি নেই। ফকির বিন্দুধারণ ও বিন্দুচালন জানে। তার পতনের ভয় নেই। আমার ছেলেরাও ফকিরী মতে আছে।

একেবারে তো বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা চলে না, তাই ফকিরকে একটু টোকা মারবার জন্যে বললাম, 'দুবার বিয়ে করলেন কেন ? ইসলামে প্রশস্ত বলে ?'

'আরে না মশাই' মযহারুল একগাল হেসে বললেন, 'নিতান্ত প্রয়োজনে। আমার বড় বউ খুব সুন্দরী আর খুব ভালো মানুষ। সংসার যখন বড় হয়ে গেল, চারটে পাঁচটা সন্তান হলো, সে ন্যাকা বোকা মানুষ, সব দিক সামাল দিতে পারত না, তাই আবার বিয়ে করলাম। আমার ছোট বউ খুব খাটিয়ে আর খুব হিসেবী। আমার সংসার সেই মাথায় করে রেখেছে। ছেলেদের তো যে-ই মানুষ করেছে। তাকে কিন্তু দেখতে ভালো নয়। যাক গে ওসব ভ্যান্‌তারা কথা। কী সব যেন জানতে চান জিগ্যেস করুন দেখি।'

: যা জানতে চাইবো সব বলবেন ? গোপন করবেন না তো ?

: যা জানি তা সব বলবো। যা আমার জ্ঞানে নেই তা বলতে পারবো না।

জানেন তো রসিদের পদে বলছে, 'সাজিয়ে আলেম হইলে জালেম/লান্নাতের তৌক পড়িবে গলায়।'

: তার মানে ?

: আলেম মানে জ্ঞানী, জালেম মানে অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানী। অজ্ঞানী হয়েও যদি কেউ জ্ঞানী সাজে তবে তার গলায় পড়বে পাপ বন্ধন। তো আপনি এবার প্রশ্ন করুন।

আমি বললাম, 'আপনারা তো বর্তমানবাদী। তার মানে কি ?'

: এক কথায় লালনের গানে কথাটা বোঝানো আছে—'যারে দেখলাম না নয়নে তারে ভজিব কেমনে।' যার বস্তুরূপ নেই তাকে অনুমানে আমরা বুঝতে চাই না। ইন্দ্রিয় দিয়ে যা প্রমাণ করা যায় না তা আমরা মানি না। সেইজন্য আমরা আগে রূপ দেখি তবে সেজদা দিই। আবার এই রূপ নেই বলে আমরা পুনর্জন্ম মানি না। প্রমাণ নেই। যে রূপ নিয়ে মানুষ জন্মায় মরণের পর তো সেই রূপ আর ফেরে না। লালন তাই বলেছেন, 'নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়/রূপের তুল্য রূপ কোথায় ?'

: বাউলরাও তো বর্তমানবাদী, তাদের সঙ্গে আপনার তফাত কোনখানে ?

: তফাত কোথায় জানেন ? বাউলরা মেয়েছেলে সাধন সঙ্গিনী নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ওটা ঠিক নয়।

: কেন ?

: আমার যে সঙ্গিনী বা স্ত্রী সে তো আমাকে একমনে ভালোবাসে। তাকে বাইরে সবার সামনে বার করা কি ঠিক ? তার মন তাতে তো চঞ্চল হতে পারে। সে তো আমাকে না-ভালোবেসে অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে। নারীর মন চঞ্চল করতে নেই। তারাই আমাদের সুখ শান্তি দেয়। সংসার সমাজে তারাই সব দিক ঠিক রাখে। তারাই সন্তান ধারণ করে। তাদের চাঞ্চল্য এলে জগৎ টলে যায়।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, মযহারুলের চিন্তায় রয়েছে মুসলমানদের পর্দা প্রথার প্রভাব, এমন সময় একজন গরিব গ্রামবাসী ঘরে ঢুকল তার কিশোর সন্তানকে নিয়ে। ছেলেটা রাতে খোয়াব দেখে হাসে, লাফিয়ে ওঠে। ফকির সাহেব যদি তাকে কোনো কবচ তাবিজ দেন।

মযহারুল আমার কাছ থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে তাতে কি-সব আঁকিবুকি কাটলেন, তারপরে সেটা মুড়ে, তাতে দু'বার ফুঁ দিয়ে মাদুলিতে ভ'রে লোকটিকে দিয়ে বললেন, কালো সুতো দিয়ে বাঁ হাতে বেঁধে দেবে।' গরিব মুসলমান ভরসা রাখে গ্রামীণ ফকিরের ওপর। কৃতজ্ঞ মুখে চলে গেল সে।

হঠাৎ আবার ফিরে এসে বলল, 'খাওয়া দাওয়ার কোনো বাধা নিষেধ মানতে হবে ?'

: কিছু না, কিছু না। কেবল যদ্দিন রোগ না সারে বাড়িতে গরুর মাংস খাবে না।

লোকটি চলে যেতেই আমি বললাম, 'এটা কেমন হলো ? মাদুলির সঙ্গে গোমাংসের সম্বন্ধ কি ?'

এটা হলো ফকিরী বুদ্ধি ? মযহারুল হেসে বলেন, 'জানেন তো মসজিদের ইমাম নানা বিধান দেয়। মুসলমানে তা মানে। ওরা কেমন বলে জানেন তো ? বেশরা ফকিরদের বাড়ি পাত পাড়বে না। গান শোনা গান গাওয়া হারাম। ফকিরী গান শুনবে না। ওরা এদিকে গান ভালোবাসে। কী-যে করে। আমাকে বলে ফকিরী গান পাক না না-পাক ? শুনতে মন চায় এদিকে মৌলবী মানা করে। আমিও সুযোগ পেলে একটু আধটু বদ্‌লা নিই। এই যেমন বলে দিলাম গরুর মাংস খাবে না। আর জীব কি কোনো ধর্মে পড়ে ? সবাই সব খেতে পারে।'

: ঈশ্বর কি কোনো ধর্মে পড়েন ?

:একদম নয়। শোনেন নি সেই গান ?

মুসলমানে ভাবে আল্লাহ্ আমাদের দলে
এমন বোকা দেখেছ কে কোন্ কালে।
আল্লাহ কারো নয় মেসো খুড়ো
এ কথাটির পেলি নে মুঁড়ো
চুল পেকে হলি রে বুড়ো খবর না নিলে ॥

তার মানে আল্লা আমারও ?

হ্যাঁ, কেন নয় ? কৃষ্ণও তো আমার। আপনি কুবির গোঁসাইয়ের গানে শোনেন নি, 'আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আত্ম সুখে/ কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে ?'

কৃষ্ণকে তো আপনারা শুক্র বলে ও মানেন।

হ্যাঁ, নরনারীর দেহ মিলনে তাঁর রাসলীলা/ নারীর শরীরে থাকে রাধাবিন্দু। সেখানেই মেলেন কৃষ্ণ।

তাহলে চুম্বন আলিঙ্গন স্পর্শন এ-সব কি ?

ওরা কৃষ্ণের সহচর দ্বাদশ গোপাল। শ্রীদাম সুদাম বসুদাম এঁদের নাম শুনেছেন তো ?

নারী শরীরে কি তবে কৃষ্ণ থাকেন না ?

: হ্যাঁ, সেখানে তাঁর কাজ আলাদা। কৃষ্ণ সেখানে পালনকর্তা। তাই নারীর গর্ভসঞ্চার হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসন নেন গর্ভফুলে। সেই ফুল থেকে রসরক্ত পান করে শিশু বেঁচে থাকে। তারপর শিশু জন্মেই সেই কৃষ্ণকে হারায় আর কাঁদে শুধু 'কাঁহা কাঁহা' বলে। এই কাঁহা মানে আমি কোথায়? কৃষ্ণই বা কোথায়?

খানিকক্ষণেব স্তব্ধতা নামে গোরাডাঙ্গার ঘুঘু ডাকা মধ্য দিনে। আমি অবাক হয়ে ভেবে চলি কেমন করে এমন সব বিচিত্র ভাবনা বয়ে চলেছে আমাদের সকলের অগোচরের জগতে! এদের কি ভ্রান্ত বলব না কি বাতুল? একথাও তো ভাবতে হবে, এমন সৃষ্টিছাড়া ভাবনা ধারণা নিয়ে এই যে বেঁচে-থাকা তাতে চলমান জীবনের সঙ্গে কোনো সংঘাত হচ্ছে না! জন্মমৃত্যু বিবাহ ঘটে যাচ্ছে, উন্নত সার ব্যবহারে জমি হচ্ছে অতিপ্রজ, গভীর নলকূপের জল পাচ্ছে চাষি, আধুনিক যন্ত্রে ঝাড়াই হচ্ছে মাঠের পর মাঠ ভরা গম। তার মধ্যেই ফকির তত্ত্ব চলছে, শরীয়ত-মারফতে চলছে অন্তর্গূঢ় রেষারেষি। মনজুর খৈবররা ফকিরী নিচ্ছে, গাইছে তত্ত্বগান। এই মযহারুল খাঁ-ই বাউল-ফকির সংঘের সংগঠনে এগিয়ে আসছেন। বস্তুবাদে বিশ্বাসী মানুষটি নির্বিকার চিত্তে রোগ আরোগ্যের ভাববাদী মাদুলী দিচ্ছেন। যাকে চোখে দেখেন তাকে অনুমান বলে মানেন না যিনি, তিনিই কিন্তু শবীবে কৃষ্ণের অবস্থিতি মানেন চোখে না দেখেও। তবে কি কৃষ্ণ এদের চিন্তায় কোনো ভাববিগ্রহ নয়, প্রবাহিত জায়মান জীবনের অন্য নাম?

ভাবনার ভবকেন্দ্র টলে গেল সহসা, কেননা দুপুবেব খাওযা দাওযাব সময হলো। যে খাটে আমি আব মযহারুল কথা বলছিলাম সেই বিছানাতেই একটা গামছা ভিজিযে নিংড়ে লম্বা করে পাতা হলো। তাব একপ্রান্তে মযহারুলেব ভাতের থালা, আরেক প্রান্তে আমাব। নিবামিষ রান্না। ঝাল-মশলা একটু খর। কোনো মহিলা এলেন না, মনজুরই সব দেওয়া নেওয়া কবল। খাওয়াব শেযে জানতে চাইলাম কেমন করে ফকিরী লাইনে গেলেন মানুষটি।

: খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি জ্ঞানী। মানে ন-দশ বছর বয়স থেকেই জানতে আগ্রহ হতো খুব, আল্লা কোথায় থাকেন। বাবার সঙ্গে মসজিদে যেতাম, আরবি-পারশি পড়তাম, কোরাণ পড়তাম, কিন্তু মন ভরত না। আন্দাজী ধর্ম তো। তখন আমাদের গাঁয়েব আশেপাশে অনেক আলেম ফকির থাকতেন। তাঁদের কাছে খুব গোপনে যাতায়াত করতাম। গোপনে, কেননা বাবা জানলে মারধর করতেন। তিনি ছিলেন খাঁটি নামাজী মুসলমান। শরীয়ত-মানা এলেমদার। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি খুব গোলমাল বেধে গেল। আমি নামাজ রোজা

এইসবে নারাজ হলাম। বলতে পারেন মন সায় দিল না। বাবা খুব মারধর করতেন। গ্রামের লোকজন গালমন্দ শত্রুতা অনেক করেছে। সে-সব কথা এখন আর মনে নেই।

: গ্রামের লোক আপনাকে মেনে নিল শেষ পর্যন্ত ?

: দেখছেনই তো। আসলে আমি তো কারুর সঙ্গে মারপিট করতে যাইনি, বলিনি 'ফকিরী কর'। আমি আমার মতো সাধন ভজন করতাম, গান গাইতাম। মোল্লা মৌলবীরা ডাকলে বাহাছ্ কবতাম। কেউ আমার সঙ্গে তর্কে পারেনি বা আজও পারে না এ দিগরে। আমি তো একসময়ে টানা দশ বছর এই বাড়ির একটা ঘর থেকেই বেরোইনি।

: কেন ?

: ফকিরি সাধনা কি সোজা নাকি ? সে কি লোক-দেখানি ? দমের কাজ, দেহযোগ অনেকরকম আছে। সে সব মুর্শেদেব কাছে শিখে নিজেব দেহে কায়েম করতে হয়। তবে দখলে আসে।

আমি বললাম, 'তার পরে সবাই আপনাকে মেনে নিল ?'

মযহারুল খাঁ প্রত্যয়ী হাসি হেসে বললেন, 'না মেনে আর কি কববে ? এককালে এ গাঁয়ে আমি ছিলাম বলতে গেলে একঘরে। আর আজ একচেটিয়া সব ফকিরী মতে টেনে এনেছি। নিজেরাই এসেছে। যাবা আসেনি তাবা শত্রুতা করে না। ব্যাস, ভালোই আছি।'

আমি বললাম, 'বাংলাদেশে তো গেছেন। ঐ দিকে ফকিরী মতের কেমন অবস্থা ?'

: খুবই রবরবা। আর বিরাট বিরাট সব ফকির আছে। ভালো ভালো গাহক আছে। জলিল রশিদ এদের তত্ত্ব গান খুব চালু ওখানে। কুষ্টিয়া যশোর ফরিদপুর আর রংপুরে অনেক ফকির থাকেন। জ্ঞানী। আরবি চর্চা করেছেন সব।

: আমি এবারে একটা অন্য ধরনের প্রশ্ন করব। আমার কাছে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটা লেখা রয়েছে, 'বাউলদের যৌনজীবন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ'। লেখাটা সঙ্গে আছে। ওর মধ্যে দু'একটা জায়গা আপনার কাছে বুঝে নেব, সত্যি কথা লিখেছে কি না। খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার তো ?

কৌতূহলী হয়ে ফকির বললেন, 'কি লিখেছে পড়ুন তো ?'

আমি লেখাটা বার করে একটি জায়গা পড়তে লাগলাম, মযহারুল খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলেন।

> তাদের মতে যক্ষ্মা ও অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অসুখে নারীর বুকের দুব বিশেষ উপকারী। নিয়মিত বুকের দুধ পান করলে যৌবন ও তারুণ্য সহজেই

ধরে রাখা যায় এবং দুধ প্রদানকারী নারীর সন্তানও জন্মে না। আমি একজনকে জানতাম যিনি এভাবে তার তারুণ্য ও যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিলেন এবং বাউল গানে ছিলেন অদ্বিতীয়। আশি বছরের অধিক বয়সে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁকে কখনো বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ও ভেঙে পড়া শরীরের মানুষ মনে হয়নি। মূলতঃ এগুলো সবই হচ্ছে বাউল ধর্মের অত্যন্ত গোপন প্রক্রিয়াসমূহ যা বাউলসমাজের বাইরে খুব অল্প লোকই জানেন।

সবটা শুনে মযহারুল একটু গম্ভীর হলেন। তারপর বললেন, 'এসব লিখে দিয়েছে ? কথাগুলো সত্যি। আপনি বাউলদের দলে দেখবেন নানা বয়সের মেয়ে থাকে। নানা উদ্দেশ্যে তাদের রাখা হয়। বুকের দুধ খাওয়ালে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না একথা সত্যি। হ্যাঁ, আর কি লিখেছে পড়ুন তো, জানতে মন চাইছে।'

আবার পড়তে লাগলাম,

সঙ্গিনী ছাড়া বাউলধর্ম অন্তঃসার শন্য। স্বামী স্ত্রী অথবা বিশেষভাবে নির্বাচিত সঙ্গিনীর সাহায্যে এই ধর্মের পালনীয় ক্রিয়াসমূহ নিষ্পন্ন করা হয়।

বাউলদের মধ্যে শ্বাস নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই জীবনের চরম আনন্দ ও শান্তি লুকিয়ে আছে। নিজের শ্বাসকে যদি ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবেই সকল সমস্যা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি সম্ভব। এই শ্বাস পদ্ধতিকে ভিত্তি করেই বাউলদের যৌনজীবন গড়ে উঠেছে।

পুরুষ বাউল নারীকে সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে মনে করে। নিজের তৃপ্তির সঙ্গে নারীকেও তৃপ্তিদানে তারা সচেষ্ট হয় যা গ্রামীণ আর দশজন পুরুষের মধ্যে লক্ষণীয় নয়। এই হেতু সাধারণ সংসার অপেক্ষা বাউলদের জীবন সুখী অন্তর্মুখী ও তৃপ্তিপূর্ণ।

প্রতিটি বাউল দম্পতিই নিয়মিতভাবে তাদের মাসিকের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে একটি দৃঢ ধর্মীয় বোধ। যা লালনের একটি গানে বিধৃত। গানটি হলো : সব গাছেরই ফুল ফোটে কিন্তু সব ফুলেরই ফল হয় না। অর্থাৎ মাসিক হলেই যে নিয়মিত ডিম্ব স্ফোটন ঘটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই ডিম্ব স্ফোটন নির্ণয়ের পন্থা হলো—মাসিকের স্বাদ গ্রহণ। এই স্বাদের তিনটি পর্যায় আছে। মধুর মতো মিষ্টি, নোনতা ও টক। যদি মিষ্টি হয় (যা মধুর ন্যায়) তা হলে বুঝতে হবে নারী অবশ্যই উর্বর।

এই রজঃ বা মাসিক পরীক্ষার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে এর উজ্জ্বলতা বা রং পরীক্ষা: করা। একটি সাদা কাগজ বা সাদা কাপড়ের ওপর এক ফোঁটা রজঃ নিয়ে সূর্যালোকে ধরলে এর যথার্থ রং প্রকাশিত হয়। রজের রং চার ধরনের হতে পারে। লাল, হলুদ, কালো এবং সাদা। বাউলদের ভাষায় লাল, জরদ, সিয়া ও সফেদ। এই চার রং-এর মধ্যে গভীর অর্থ বিদ্যমান। এখানেও লাল রং-এর অর্থ নারী উর্বর।

বাউলদের মতে নারী ও চাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।....এখানে বলা দরকার, বাউলদের মতে, পুরুষরা সব সময়ই উর্বর থাকে না। পূর্ণিমার সময় পুরুষদের উর্বরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।'

সব শুনে মযহারুল বললেন, 'সব কথাই ঠিক লিখেছে। আর এসব কথা তো বাউল গানেই আছে। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' শোনেন নি ? আরেকটা গান আছে 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' শুনেছেন।

: শুনেছি কিন্তু মানে বুঝিনি ?

. নারীর রজঃস্রাবের সময়কে বলে অমাবস্যা। এই সময় বাঁকা নদীর বাঁকে অধর মানুষ মহামীন রূপে খেলতে আসেন। তাঁকে ধরতে হয় সেই সময়। সেই হলো মহাযোগ। কিছু বুঝলেন না, তাই নয় ? আচ্ছা লালনের একটা গান শুনুন,

তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
রসিক সাধলে ধরে তা একই দিনে।
অমাবস্যা প্রতিপদ
দ্বিতীয়ার প্রথমে সে তো
দরবেশ লালন বলে তাই তার আগমন
সেই যোগের সনে ॥

এর মানে হলো নারীর রজঃস্রাবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের মাঝামাঝি সময়ে নারী-শরীরে আলেখের খেলা। তাঁকে ধরতে পারলে পাওয়া যাবে কোটিজন্মের সুখ আর উল্টে যদি ঘটে যায়, বিন্দুপতন তবে সাধককে চিবিয়ে চুষে খাবে কাম-কুমীর। সাধকের পতন হবে।

: বেশ বুঝলাম। কিন্তু পূর্ণিমাটা বোঝান, ঐ যে তখন বললেন 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' ?

. ও, আকাশে যখন পূর্ণিমা তিথি তখন পুরুষের জোয়ার আর সেই সময়ই যদি নারী সঙ্গিনীর ঘটে অমাবস্যা তবে সেই সংযোগ হলো সেরা সাধনসময়। খুব কম ঘটে একজীবনে।

আমি বললাম, 'এবারে বুঝলাম বাউল ফকিরদের দেহযোগ আসলে এক

লুকোচুরি খেলা। ওদিকে কামনার দারুণ টান, মহামীনের পাশেই আছেন কুমীর। ঠিকভাবে মীনকে খেলাতে পারলেই অধর মানুষ ধরা পড়বে অটলের সাধনে আর ভুল করলেই কুমীরের মুখে পতন। ঠিক বুঝেছি তো? আচ্ছা এবারে বলুন তো জীবজগতে দেখেছি দেহসঙ্গমের নির্দিষ্ট বিশেষ ঋতু আছে অথচ মানুষের শরীরীতৃষ্ণা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এমন কি সর্বদাই। তা হলে কি মানবজীবন সবচেয়ে হীন আর কলুষিত নয়? মানুষে ঈশ্বর এতখানি দেহের দাসত্ব দিলেন কেন?'

: প্রথমেই বলি, যাকে বলছেন দাসত্ব, তাকেই যদি বলি প্রভুত্ব? জীবজগৎ এই প্রভুত্ব পায় না। তারা কামনার টানে মিলিত হয়। জন্মদানই তার লক্ষ্য। তাদের আনন্দ নেই, প্রেম নেই, আপনার কথায় 'লুকোচুরি খেলা' নেই। একমাত্র মানুষকেই আল্লা এই মনের আনন্দ, দেহের সুখ, প্রেমের অনুভূতি দিয়েছেন কেন না মানুষকেই তিনি সবচেয়ে ভালোবাসেন।

এবারে আমি গভীর দৃষ্টিতে মযহারুল খাঁ-র দিকে তাকালাম। জীবনের একটা নতুন ভাষ্য এত দিনে পেলাম লোকধর্মের মধ্যে। কামনা ও প্রেমের দুই উত্তাল সমুদ্রের মাঝখানে এক চিল্‌তে বালুবেলার মত এই জীবন, কখন কিসের দ্বারা যে ভেসে যাবে কে জানে।

ভাবনার মাঝখানে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গৃহী ফকির বলে উঠলেন, 'মানুষেব উপভোগের ক্ষমতা খুব বেশি সেইজন্য আল্লা তার জন্যে এত খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। খাদ্য থেকে পুষ্টি আর তৃপ্তি। তার থেকেই বীর্যের জন্ম। সেই বিন্দুই জীবন। তাকে ধরে রাখতে পারাই মানুষের সব চেয়ে বড় কায়দা। আবার সেই কাজে যারা ব্যর্থ তারাই কামুক, তাদেরই পতন। তাদের জীবন জানোয়ারের মতো। জানোয়ারের মতোই পরনির্ভর, গরিব। জানোয়ারের মতোই তারা সকাল সকাল মরে। তারাই পাপের ভয়ে তীর্থব্রত উপোস করে মরে। অপদেবতা, কাঠের ছবি, মাটির ঢিবি পুজো করে। সেইজন্যেই গানে বলে, মানুষের করণ কর'। মানুষের করণ হল আত্মজ্ঞান, দেহের ওপর প্রভুত্ব আনা। আমাদের পথে তার নিশানা আছে। শুধু মুর্শিদ ধরে বুঝে নিতে হয়।'

আমি তর্কের ভঙ্গিতে বললাম, 'এতক্ষণ আপনি যা বলে গেলেন সবই পুরুষের দিক থেকে। রোজকার জীবনে আর যৌনতায় কি মেয়েদের কোনোই ভূমিকা নেই?'

মযহারুল বললেন, 'কি করে থাকবে?' মেয়েদের যে কামনা নেই।'

'কি বললেন?' আমি আমূল চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েদের কোনো দৈহিক কামনা নেই?'

মযহারুল খুব অনায়াসে বললেন, 'আপনি তো বিবাহিত। বলুন তো সত্যি করে, কামনা আপনারই তরফে আগে আসে না কি ?'

চুপ করে গেলাম।

মযহারুল আর একটু উজিয়ে দিয়ে বললেন, 'শরীরের দিকে যে প্রথম আকর্ষণ সে কি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নয় ? শরীরের সম্পদও কি তাদের বেশি নয় ? পুরুষ কি দস্যু ডাকাতের মতো নারীকে ভোগ করে না ?

আমি দারুণ বিভ্রান্ত হয়ে যেন খানিকটা অসহায়ের মত বললাম, 'তবে নারী কামনাময়ী হয় কি করে ? তাব দেহ কি সাড়া দেয় না ?'

. পুরুষ স্ত্রীলোকের মধ্যে কামনা জন্মিয়ে দেয়। মূলে তাদের দেহের কামনা থাকে না। তারা কামনা শূন্য।

: তাহলে নারী কী চায় পুরুষের কাছে ?

: সবচেয়ে বেশি চায় সঙ্গ আর সান্নিধ্য। সব স্ত্রী চায় স্বামীকে সেবা করতে। চায় ভালো মন্দ বেঁধে খাওয়াতে। বাইরে থেকে এলে দেখবেন স্ত্রী স্বামীকে ঘাম মুছে দেয়, পাখার বাতাস করে। কোনো স্বামী কি তার স্ত্রীকে পাখার বাতাস করে ? আপনি সব মেয়েছেলেকে জিগ্যেস করে দেখবেন তারা চায় স্বামী তার সামনে সর্বদা হাজির থাকুক, তাকেই শুধু ভালো বাসুক। বাইরের জগৎ সম্পর্কে বৌদেব খুব ভয। পাছে তার পুরুষ আর না ফেরে ! যদি তার দেহ অন্য কাউকে চায় ? মেয়েরা যে সন্তান চায় তার একটা কারণ তো মা হবার নেশা, আরেকটা কারণ স্বামীর একটা চিহ্ন ধরে রাখা। কি ঠিক বলছি ?

সন্ধেব আগেই চলে যাব শুনে সবাই মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। মনজুর এনে দিলো চালের গুঁড়োর রুটি, খেজুর গুড়ের পায়েস। খেতে খেতে বললাম, 'বাড়িতে তো গরু নেই, পায়েসের দুধ কিনতে হলো তো ?'

মনজুর লাজুক মুখে মাথা নিচু করল।

: কত করে দাম নিল ?

: সাত টাকা লিটার।

: এই অজ পাড়াগাঁয় সাত টাকা লিটার দুধ ? আমরা শহরে এর চেয়ে সস্তায় ভালো দুধ পাই। আচ্ছা মনজুর, এদিককার বাগানের আম সবই কাঁচাই ভেঙে নিয়ে যায় ভেণ্ডারে, তাই নয় ?

: হ্যাঁ, গাছে আম থাকার জো নেই। সব চুরি হয়ে যাবে।

: মাছ যা ওঠে তা-ও তো চলে যায় শহর-বাজারে ?

: হ্যাঁ, টানা বাস আছে তো ! তা ছাড়া শহরে ভালো দাম পায়। গ্রামের মানুষ তো অত দাম দিয়ে কিনতে পারবে না।

: আর কেরোসিন তেল ?

: রেশনে সামান্য পাওয়া যায়। ব্ল্যাকে কিনতে হয়। পাঁচ টাকা লিটার।

মযহারুল খাঁ আবার এসে বসলেন। বললেন, 'এভাবে এলে কি হয় ? ভাবলাম থাকবেন অন্তত রাতটুকুন। মনজুর-খৈবরদের গান শোনাব। যাকগে। আবার আসবেন যখন বলছেন তখন সে ভরসায় থাকবে বসে এই গরিব ফকির মানুষটা। আপনি এলেন তাই তত্ত্বকথা দুটো হলো। এখানে আলাপ-আলোচনার তেমন মানুষজন কই ? তা আপনি যা সব জানতে চান তার জবাবে সন্তুষ্ট হলেন তো ? আমরা তো লেখাপড়া করিনি, কথাও গুছিয়ে বলতে পারিনে। অবশ্য জিজ্ঞাসারও শেষ নেই মানুষের। কি একেবারে চুপ মেরে গেলেন যে ?'

বললাম, 'না চুপ করছি না। প্রশ্নেরও শেষ নেই। কিন্তু একনাগাড়ে তো সকাল থেকে শুধু জিগ্যেসই করে যাচ্ছি। শুধুই বকাচ্ছি আপনাকে।'

'কিছু না, কিছু না' মযহারুল বললেন, 'আমি সে রকম জ্ঞানী নই যে সব ভেতরে লুকিয়ে রাখব। আমি জানি যেটুকু তা বলতে সব সময়ে রাজি, তবে পাত্র বুঝে। বলুন আর কি প্রশ্ন ? আপনার যাবার সময়ও তো ঘনিয়ে এল এদিকে।'

আমার মাথায় ছিল বিমল বাউলের বলা সেই কুমারী মেয়ের প্রথম রজঃ দানের কথাটা। বলতে গেলে লোকধর্মের সবচেয়ে নিগূঢ় গোপন প্রসঙ্গ। তবে বিমল খবরটাই শুধু দিতে পেরেছিল, বিশ্লেষণ করতে পারেনি। তার পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। মযহারুলের মত তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে প্রশ্নটা রাখতে লোভ লাগল। খুব গুছিয়ে ভেবে চিন্তে সম্ভ্রম নিয়ে প্রশ্ন করতেই মযহারুলের মুখটা বিচিত্র উদ্ভাসে ভরে উঠলো। খুব অনুচ্চ স্বরে বললেন,

'কোটি জন্মের যায় পিপাসা
বিন্দুমাত্র জলপানে।'

বলেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'কি হলো ?' আমি বললাম, 'আপনার মনে কোনো আঘাত দিলাম নাকি অজান্তে ? তা হলে থাক ঐ প্রসঙ্গ।'

: না ওসব কিছু নয়। আমার মনের একটা খুব নরম জায়গায় ঘা লেগেছে। না না, তাতে আপনার কোনো দায় নেই। যাক গে, যে কথা আপনি বলছিলেন। কুমারী মেয়ের প্রথম রজস্নানের কথা বলছিলেন না ? সে খুব পবিত্র জিনিস। অনেক ভাগ্যে সেই বস্তু মেলে বাউল-ফকিরের কপালে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সত্যি ? কথাটা তা হলে অলীক নয় ?'

: অলীক ? হ্যাঁ, একদিক থেকে ভাবলে অলীকই তো। বিনা মেঘে বর্ষণ বলে

কথা   শুনবেন লালনের সেই গান ?

বিনা মেঘে বরষে বারি
শুদ্ধ রসিক হলে মর্ম জানে তারি ॥
ও তার নাই সকাল বিকাল
নাহি তার কালাকাল
অবধারি ॥
মেঘ মেঘেতে সৃষ্টির কারবার
তারাও সকল ইন্দ্ররাজার
আজ্ঞাকারী ॥
নীরসে সুরস ঝোরে
সবাই কি তা জানতে পারে
সাঁইর কারিগুরি ॥
ও তার এক বিন্দু পরশে ।
সে জীব অনায়াসে
হয় অমরী ॥

কিছু বুঝলেন ?

: কিছু বুঝলাম । কিছু অস্পষ্ট থেকে গেল । বিনা মেঘে যে বারিবর্ষণের কথা বলা হয়েছে তাই কি কুমারী মেয়ের প্রথম রজঃ? সেই জন্যেই বুঝি বলা হলো 'তার নাই সকাল বিকাল নাই তার কালাকাল' ?

: হ্যাঁ , ঠিকই বুঝেছেন । এ কথাটাও বোধহয় বুঝলেন, 'মেঘ মেঘেতে সৃষ্টির কারবার ?'

: এবারে বুঝলাম । দেখুন তো বুঝলাম কিনা । বলা হচ্ছে ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ বৃষ্টি দেয় তবে সৃষ্টির কারবার চলে । তেমনই সাঁইয়ের কারিগরিতে যে রসের সঞ্চার হয় তার থেকেই তো জীবনসৃষ্টির কারবার । নারীর রজঃ প্রবৃত্তির শুরু মানেই তার জন্মদানের সম্ভাবনারও শুরু । তাই নয় ?

এইভাবে বিশ্লেষণ করে চলেছি আর রোমাঞ্চ হচ্ছে ভেতর ভেতর । খুবই কি আশ্চর্য নয় যে পুঁথি পড়া বিদ্যে সম্বল করে আমি কেমন অনায়াসে বুঝে যাচ্ছি লোকধর্মের কঠিনতম অতল রহস্য । এইখানেই বোঝা যাচ্ছে গুরুর প্রয়োজন এই ধর্মে কতটা । আগে শুনেছিলাম বাউলতত্ত্বে 'বরজখ' বলে একটা শব্দ আছে । 'বরজখ' মানে স্বর্গমর্ত্যের মাঝামাঝি একটা জায়গা । শেষ বিচারের অপেক্ষায় আত্মারা সেইখানে বাস করে । মারফতীরা গুরুকে বলেন 'বরজখ' । কেন না গুরুই মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ করেন । আজকে সকাল থেকে

এত গাঢ় জীবনের তাপ মনে লাগছে তার মূলে মযহারুল খাঁ-র সঙ্গ আর ইঙ্গিত। এ সব গানতো 'লালন গীতিকা'-য় আগেই পড়েছি কিন্তু বুঝিনি একবিন্দু। মযহারুল খুব বড় বরজখ সন্দেহ নেই।

বরজখের মতো দৃঢ় মূল বিশ্বাসের স্বরে মযহারুল বললেন, 'সেই পবিত্র রজের এক বিন্দু স্বাদস্পর্শ পেলে মানুষ হয় অমর এই বিশ্বাস আমাদের। সেইজন্যেই বাউল-ফকিররা তাদের দলে সর্বদাই রাখে কিশোরী মেয়েদের। সদাসর্বদা নজর রাখে তাদের দিকে। রজ শুরুর প্রথম বিন্দু পান করতে পারলে বিপুল শক্তি আসে শরীর মনে। তাই আমরা বলি, কোটি জন্মের যায় পিপাসা/বিন্দুমাত্র জল পানে।'

মযহারুল হঠাৎ হয়ে গেলেন আনমনা। এবারকার উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাসটা ততটা স্পষ্ট হলো না। বুঝলাম অনেক প্রয়াসেও সেই দুর্লভ পবিত্র বিন্দু তিনি জীবনে পাননি। ঘনাযমান আসন্ন সন্ধ্যাব ছায়াই কি তাঁর মুখকে ম্লান করল? নাকি সে অন্যতব কোনো বেদনা?

গোবাডাঙ্গা গ্রামের প্রান্তে বাসস্টপ। দাঁড়িয়ে আছি একা। হঠাৎ এগিয়ে এলেন এক গ্রামবাসী। নাম বললেন রমজান খাঁ। বাসস্টপের কাছে একটা ঘর নিয়ে হোমিওপ্যাথি করেন। দেখলেই বোঝা যায় আত্মতুষ্ট মানুষ। প্রাথমিক আলাপ-পবিচয়ের পর বললাম, 'কেমন আছেন আপনারা এই গ্রামে?'

'খুব ভালো' বললেন রমজান, 'আমরা খুব মিলে মিশে আনন্দে থাকি। খুব একটা অভাব নেই। রাজনৈতিক গোলমাল নেই। মানুষজন শান্তিপ্রিয়।'

: কিন্তু আমরা যে শুনি গ্রামে লোকে খুব কষ্টে বাস করে? খুব দারিদ্র্য, দারুণ কষ্ট।

: সে কি? আমরা তো শহরে গেলে আপনাদের জন্যেই কষ্ট পাই। গাদাগাদি করে ঘিঞ্জির মধ্যে বাস করেন। পথঘাট দারুণ নোংরা। কেউ কাউকে দেখেন না। একজন খেতে না পেলেও খবর নেন না। মারামারি খুন জখম ছিনতাই ধর্মঘট বিদ্যুৎ বিভ্রাট। সত্যি আপনাদের নিয়ে আমরা আলোচনা করি মাঝে মাঝে। কত কষ্টে বেঁচে আছেন।

ইতিমধ্যে মনসুর এসে দাঁড়িয়েছে সাইকেল নিয়ে। সে পাশের গ্রামে যাবে। আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। রমজান বললেন, 'বুঝলে মনজুর, এঁকে এতক্ষণ বলছিলাম যে শহর কত খারাপ। কি সুখে এঁরা সব থাকেন সেখানে। তোমার মনে আছে মনজুর, গত পৌষ মাসে পশ্চিম পাড়ার আলতাফের বুড়ি দাদী শীতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, আমরা সব চাঁদা তুলে লেপ বানিয়ে দিলাম? বুঝলেন, আমাদের

গ্রামে কেউ উপোসী থাকে না। কেউ খেতে পায়নি শুনলে আমরা কোনো-না-কোনো বাড়ি থেকে তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিই। আর আপনাদের শহরে ?

আমি খুব অবাক হয়ে রমজানকে কিছুক্ষণ দেখলাম। লোকটা তার্কিক না ঝগড়াটে ? সরল ভালো মানুষ না অতি চতুর ? নাঃ মুখে তো কোনো শয়তানী ছাপ নেই। বেশ সহজ আত্মতুষ্ট ভাব।

বললাম : 'বেশ আছেন তা হলে। খুব ভালো। কিন্তু মনজুরদের মতো সচ্ছল গেরস্থ বাড়িতে গরু রাখার উপায় নেই, সাত টাকা দিয়ে দুধ কিনতে হয়। আম নেই। মাছ পাওয়া যায় না। কেরোসিন পাঁচ টাকা। বাড়িতে কাজের লোক মেলে না। খবর নিয়েছি গ্রামে ডাক্তাব নেই, লাইব্রেরি নেই। খবরের কাগজ আসে না। মিষ্টি কিনতে হলে যেতে হয় সেই নাজিব পুবে। আচ্ছা, বমজানভাই, আমবা তো গ্রাম বলতে শুনি প্রাচুর্য, অপচয় আর বিস্তার। আচ্ছা বলুন তো, মানুষের জীবনের ধর্ম গুটিয়ে যাওয়া না বিকশিত হওয়া সব দিকে ? এই যে আপনারা মেনে নিয়েছেন কখনো দুধ খাবেন না, মাছ খাবেন না, আম পাবেন না, মিষ্টি পাবেন না, বই পড়বেন না, কাগজ পাবেন না এটাই কি জীবন ? একেই ভালো থাকা বলে ? এর একটাও তো আমরা মেনে নিইনি। আপনারা সত্যিই ভালো আছেন বলছেন ?'

মনজুর খাঁ আর রমজান খাঁ খানিক মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপরে মনজুর বলল, 'তাই তো রমজান চাচা, আমরা তো মোটেই ভালো নেই। কিন্তু সেটা তো বুঝতে পারি না।'

কথা শেষ হবার আগেই বাস এসে গেল। তাতে উঠে বসে শেষবারের মতো চাইলাম গোরাডাঙ্গা গ্রাম আর বিভ্রান্ত রমজান ও মনজুরের দিকে। ধাবমান বাস দ্রুত ছিন্ন করল আলোহীন নিস্তব্ধ নিস্তেল বাংলার লক্ষ গ্রামের একটির সঙ্গে আমার শীর্ণ সম্পর্ক।

‘গৌরাঙ্গের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা’

বইয়ের পাতা থেকে পাওয়া জ্ঞান আর পথচল্‌তি জীবন থেকে উঠে আসা জ্ঞানে কত যে তফাৎ। সেই কত দিন আগে ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে পড়েছিলাম সেমানটিক্‌স্ অর্থাৎ কি না শব্দার্থতত্ত্ব। শব্দের এখন যে-অর্থ আমরা জানি, আদৌ সে-শব্দের অর্থ নাকি অনেক সময় থাকে আলাদা। তার কারণ উচ্চবর্গের মানুষ হয়ত তৈরি করলো একটা শব্দ আর নিম্নবর্গের মানুষ সেই শব্দ ব্যবহার করতে করতে মুখে মুখে মানেটাই দিল পালটে। ভারি সুন্দর একটা উদাহবণ মনে পড়ছে, সেই কবেকার ছোটবেলায় পড়া : ‘উট চলেছে মুখটি তুলে/ঊর্ণনাভ ঊর্ধ্বে ঝুলে’। ঊর্ণনাভ, যাকে বলে মাকড়শা। সেমানটিক্‌স্ পড়তে গিয়ে জানলাম ঊর্ণনাভ নয়, কথাটা মূলে ছিল ঊর্ণবাভ। বয়নার্থক বভ্ ধাতু থেকে তৈরি শব্দ। ঊর্ণা বোনে যে। কিন্তু হলে কি হবে, সাধারণ মানুষের ধারণা হলো মাকড়শার নাভি থেকে একরকম রস বেরিয়ে জাল তৈরি হয়। ব্যাস ঊর্ণবাভ হয়ে গেল ঊর্ণনাভ। অশিক্ষিত মানুষের এসব হালচাল, যারা নাকি উচ্চারণকেই বলে উশ্চারণ, অধ্যাপক মশাই খুব ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মের আরো নানা নমুনা। তখন জানতে পারিনি যে, উচ্চারণ যারা বাঁকায়, যারা উল্টে পাল্টে দেয় অর্থ সেই সব মানুষেরও আবার পণ্ডিতদের বিষয়ে একরকম ঠোঁট বাঁকানো আছে।

কাটোয়ার কিছু দূরের এক গ্রামে থাকেন প্রাণকৃষ্ণ গোঁসাই। সহজিয়া বৈষ্ণব। হেসে বললেন, ‘কৃষ্ণ মানে কি ?’

বৈষ্ণব-শাস্ত্র-পড়া চুলবুলে পণ্ডিতকে আর পায় কে ? বুক ফুলিয়ে বললাম : ‘কৃষ্ণস্তু ভগবানস্বয়ম্’।

: কী ক'রে জানলেন ?

: বৈষ্ণব শাস্ত্রে লেখা আছে। উজ্জ্বল নীলমণি......

গোঁসাই থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘থামুন থামুন। ও তো অনুমানের কথা। আমরা বর্তমানের ধারায় চলি। এবারে শুনুন, কৃষ্ণ মানে ভগবান নয়, কৃষ্ণ মানে মানুষ। কৃষ্ণ মানে যে কর্ষণ করতে পারে। কৃষ্ণ মানে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। যে ক্ষেত্র বুঝে কর্ষণ করতে পারে। বুনতে পারে বীজ। বীজ মানেও কৃষ্ণ, অর্থাৎ বিন্দু।

বুঝলেন ?'

'অতল জলে ডুবতে ডুবতে বললাম, 'তা হলে রাধা কে ?'

: রাধা ? রাধা হলো ক্ষেত্র।

আমি সচকিত হয়ে বললাম, 'তবে কি চৈতন্য মানে আমরা যা বুঝি তা নয় ? অদ্বৈত নিত্যানন্দ এসবেরও কি অন্য মানে আছে নাকি ?'

মুচকি হেসে প্রাণকৃষ্ণ গুনগুন করেন :

যে-রাধাকৃষ্ণের কথা পদে গায়
সে তো বৃন্দাবনের কৃষ্ণ রাধা নয় ॥

আমি বললাম, 'এ কি ? এ পদ কি এক্ষুনি মুখে মুখে বানালেন না কি ?'

গোঁসাই খিল খিল করে হেসে বললেন, 'কি ? আয়নাটা ভেঙে গেল তো ?'

: আয়না ?

: হ্যাঁ, একখানা বড় আয়না ছিল। তাতে একখানা সূর্য দেখা যেত। এবার ? হাত থেকে আয়নাটা হঠাৎ পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এখন কি হবে ? আর তো একখানা সূর্য দেখা যাবে না। যত টুকরো তত সূর্য, তাই নয় ?

প্রাণকৃষ্ণ আস্তে আস্তে উঠে যান তাঁর আখড়ার দিকে। সাদা আলখাল্লা পরা উদাসীন। শুভ্র জটাজুট। হঠাৎ আবার কাছে ফিরে এসে আমার বিভ্রান্ত মুখের দিকে খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'শাস্ত্র পড়ে কতটুকু জানবে ? সব শাস্ত্রই কি মান্য ? কবিরাজ গোঁসাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখেছিলেন। জানো কি সে সম্বন্ধে কেউ কেউ কি বলে ? বলে,

চৈতন্যচরিতামৃত
কারে কারো লাগে তিতো।

তাহলে ? কোনো গ্রন্থই অকাট্য নয়। অকাট্য সেই পরমতত্ত্ব। তোমাকে কি বলি বলো ? সংশয় পথের পথিক তুমি। আর আমি ভাবের পথিক। অচৈতন্য আছ, সচৈতন্য হও।'

সেই শুরু। তা বিশ বছরের বেশি বই কম নয়। সচৈতন্য হবার চেষ্টা আমার যবে থেকে শুরু তখন ধারে কাছে কোথাও চৈতন্যের পাঁচশত বছরের দুন্দুভি বাজেনি। অর্থাৎ আমার চৈতন্য প্রাপ্তির পথটি ছিল বড়ই নিঃসঙ্গ। কিন্তু আর একটা কথাও বলা দরকার। গোঁসাই মশায়ের বলা অচৈতন্য থেকে সচৈতন্য হওয়া বরং সহজ কিন্তু একটা মতামত তৈরি হয়ে গেলে তাকে ভেঙে নতুন মত গড়া কঠিন। বৈষ্ণবতা আর চৈতন্যবাদ বিষয়ে অনেকটাই যে ধারণা তৈরি হয়েছিল আমার মনে আগে থেকেই, তাকে কি বদলানো সোজা ? যেমন একটা

গান যদি একবার ভুল সুরে শেখা হয়ে গিয়ে থাকে তবে সেই সুর ভুলে শুদ্ধ সুর আয়ত্ত করা কঠিনতর। আমায় এই ব্যাপারটা পদে পদে বাধা দিল। সুশীল দে-র লেখা 'An early history of Vaisnava faith and movement', শশিভূষণ দাশগুপ্তর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে' কিংবা বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান', রাধাগোবিন্দ নাথের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা' যে কখনও মন দিয়ে পড়েছে তার পক্ষে কি সম্ভব সেই সব পুরানো পড়া ভুলে যাওয়া ? সেই সঙ্গে পরে পরে কেবলই পড়ে নিয়েছি কেনেডি বা ডিমক সাহেবের ইংরাজি বই। প্রয়োজনে ঘেঁটেছি হরিদাস দাসের সুবৃহৎ 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, মণীন্দ্রমোহন বসুর 'সহজিয়া সাহিত্য'। উলটে পালটে বুঝতে চেয়েছি 'হরিভক্তি বিলাস' কিংবা 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'। এ সবই কি বাহ্য পথ ? তা হলেও ক্রমে বুঝতে পারি চৈতন্যকে বোঝবার দুটো খুব সোজা পথ আছে। একটা হলো পণ্ডিতদের বই পড়ে বোঝা, আরেকটা বৈষ্ণব নৈষ্ঠিকমতে দীক্ষা নিয়ে আচরণের পথে বোঝা। প্রথম পথটা আমার খানিক জানা ছিল, দ্বিতীয় পথটা আমার পক্ষে জটিল। কেননা আমার তো অন্তরে ভক্তির আকুলতা নেই, দীক্ষা নেব কেন ? কিন্তু হঠাৎ কোথাও কিছু নেই খুলে গেল তৃতীয় একটা পথ। সহজিয়া পথ। প্রায় তৃতীয় নয়নের মত সে পথ এমন সব কথা আমাকে জানান্ দিল যা কোনদিন যে জানবো ভাবিনি।

বেথুয়াডহরি স্টেশনের পরের স্টেশন সোনাডাঙ্গা। সেই সোনাডাঙ্গার রেলগুমটির গায়ে একটা অন্ধকার ঘরে থাকতো এলা ফকির। অন্ধ ফকির কিন্তু মনটা ছিল ঝলমলে। আমাকে প্রথম দিন বললো, 'যদি গোরাকে জানতে চাও তো লালনের পদ পড়ো ভাল করে।'

আমি বললাম, 'সে কি ? ফকিরের চোখ দিয়ে বৈষ্ণবকে বুঝবো ?'

এলা অন্ধ চোখের হাসি ছড়িয়ে বললো, 'সে-ই তো আদি ফকির গো। গোরা ফকির। মাথা মুড়িয়ে কন্থা নিয়ে করঙ্গ হাতে গৌরাঙ্গই আদি ফকির। লালন বলছে,

শুনে অজানা এক মানুষের কথা
গৌরচাঁদ মুড়ালেন মাথা।

কি বুঝলে ? অজানা মানুষ কিনা আলেখ। তার খবর পেয়েই গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস। তো তুমি প্রথমে লালন পড়ো। কিন্তু তার আগে তীর্থগুলো দ্যাখো। নবদ্বীপ শান্তিপুর বাগনাপাড়া কালনা কাটোয়া কেঁদুলি ফুলিয়া অগ্রদ্বীপ শ্রীখণ্ড খড়দহ গুপ্তিপাড়া জিরাট মঙ্গলডিহি গোপীবল্লভপুর এসব দেখেছো ?'

আমি বললাম, 'কিছু দেখেছি কিছু দেখিনি কিন্তু তীর্থ ঘুরে কি পাবো ? লালন

যে বলেছেন 'ওসব তীর্থব্রতের কর্ম নয়' তাহলে ?

এলা বললো, 'তীর্থব্রত কাদের জন্য নয় জানো ? যাদের আপ্তুতত্ত্ব সারা হয়েছে। তোমার তো পরতত্ত্বই জানা হয়নি। ওসব ধন্দ ছাড়ো। আগে তীর্থগুলো 'পরিক্রমা ক'রে তারপরে এসো।'

আমি এমনই ক'রে কত জায়গায় কত দিন ঘুরে ঘুরে বৈষ্ণবদের ভোগরাগ, সেবাপূজা, পঞ্চতত্ত্ব সব বুঝে এলা ফকিরের কাছে আবার গেলাম।

ফকির বললে, 'বুঝলে সব ? দেখলে সব বাহ্যের সাধন ? মন্দিরে দেখলে তো গৌরাঙ্গকে শযন দিচ্ছে আবার জাগাচ্ছে ? কাঠের মূর্তি আর ছবি পুজো দেখলে ? রসকলির ছাপ দেখলে ? ডোরকৌপীন দেখলে ? তা কেমন লাগলো ?'

: ভালোই তো। বেশ ভক্তি ভাবে আছেন সব। গ্রন্থ পড়ছেন। কীর্তন হচ্ছে।

: কোন্ কীর্তন আসল

: কেন ? নাম কীর্তন। হরি নামেই মুক্তি কলিযুগে।

'তাই নাকি ?' এলা ফকির সন্দিগ্ধ হাসলো। 'তা হলে হরি বললেই হবে ? এবারে তাহলে শোনো লালন কি বলে :

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে ?'

আমি বললাম, 'তার সঙ্গে হরিনামের কি ? নামের শক্তি জানেন ?

এলা আমার কথার জবাব না দিয়ে গানের অন্তরাটা ধরলে বেশ তান লাগিয়ে :

'গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয় ?
দিন না জানলে আঁধার কি যায় ?
তেমনই জেনো হরি বলায়
হরি কি পাবে ?

কি বুঝলে ?

: বুঝলাম শুধু হরি হরি বললেই হবে না। বুঝতে হবে তার মর্ম।

: উঁহু, শুধু মর্ম বুঝলেই হবে না। বুঝতে হবে তাঁর অবস্থান। অর্থাৎ কিনা দেহের কোথায় আছেন হরি, কি তাঁর কাজ কারবার।

আমি বললাম, 'সে সব বোঝার উপায় কি ?'

: ঐখানটাতেই গুরুর দরকার। গুরু ছাড়া গৌরকে বোঝা অসম্ভব। সেইজন্যই লালন বলে,

গুরু ছেড়ে গৌর ভজে

তাতে নরকে মজে।

আমার মনে হলো চৈতন্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে এতদিন যেমন ক'রে বুঝে এসেছি তার উল্‌টো একটা দিকও তাহলে আছে। এলা ফকির খুব কৌশলে আমাকে টানতে চাইছে সেদিকে। প্রথমে সে বোঝালো মূর্তিপূজা নিষ্ফল, তার পর দেখালো হরিনামের অন্তঃসার কত কম। কিন্তু গৌড়ীয় মতে যে নৈষ্ঠিক সাধনা সে কি ভুল ? সমান্তরাল সাধনা কি হয় না ? কথাটা আরেক দিন এলার কাছে তুলতে সে তো হেসেই আকুল। বলে, 'সত্য কি দু'রকম হয় ? ফলাফল আলাদা হতে পারে অবশ্য'।

'কিরকম ?' আমি জানতে চাই।

: পাত্রভেদে ফলাফল জানিও নিশ্চয়। ভালো বীজ যদি পাষাণে রোপন করো তবে কি শস্য হবে ? তেমনই দই যদি রাখো তামার পাত্রে তবে বিষ হয়ে যাবে। একটা গানে বলছে সিংহেব দুগ্ধ মাটির ভাণ্ডে টিঁকে না। তা হলে ? সিংহের দুগ্ধ রয়না দ্যাখো স্বর্ণপাত্র বিহনে। এবারে বুঝলে পাত্রভেদে ফলাফলের ভেদ ?

: বুঝলাম। কিন্তু চৈতন্যকে দু'রকমভাবে সাধনা করা কি যায় না ? নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা যদি শুদ্ধাচারে দারু বিগ্রহে বা নামাশ্রয়ে সাধনা করে তবে ক্ষতি কি ?

: ক্ষতি। শোনো লালনের জবানীতে। সে বলছে,

যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে
জোঁকে মুখ লাগালে রক্ত এসে মেলে।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'কি সাংঘাতিক যুক্তির দাপট। এখানে তবে পাত্রভেদে নয়, অধিকারী ভেদ। দুধও সত্য রক্তও সত্য। কিন্তু অধিকারী ভেদে ভিন্ন ফলপ্রাপ্তি। বেশ ! তা তোমরা যেভাবে চৈতন্যকে বুঝছো সেটাই ঠিক আর ওদেরটা বেঠিক ? কি করে নিঃসংশয়ে বুঝলে ?

: বুঝলাম আমরা মানুষকে ধরেছি ব'লে। ঐ জন্যে আমাদের ডোর কৌপীন, তিলক, মালা, ব্রহ্মচর্য, বৃন্দাবন, মথুরা কিছুই লাগে না। আমরা বরং বলি,

সত্য বলে জেনে নাও এই মানুষলীলা।
ছেড়ে দাও নেংটি পরে হরি হরি বলা ॥

: বেশ বুঝলাম। তা ব্রহ্মচর্যে আপত্তি কোথায় ? সব ধর্মে ত্যাগ বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্যের খুব বড় সম্মান।

: সম্মান কে করে ? তোমরাই ব্রহ্মচারী হও আবার তোমরাই বলিহারি দাও। আমরা দিইনে। প্রকৃতি ছাড়া জীবন চলে কি ? এলে কোথা থেকে ? সগ্গো থেকে ভুঁইয়ে পড়লে না মা-র কোলে জন্মেছো ? মা-কে ? তোমার বাবার প্রকৃতি নয় ? 'পুরুষের লক্ষণ প্রকৃতিআশ্রয়', আমরা বলি। তাছাড়া প্রকৃতি ছেড়ে নেংটি

পরে যাবা কোথায়, কদ্দুর ? একটা সার কথা শুনবে ? স্বয়ং মহাপ্রভু প্রকৃতিসঙ্গ করেছিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া আর বিষ্ণুপ্রিয়া। অদ্বৈতর ছিল দুই প্রকৃতি। নিত্যানন্দরও তাই। তুমি তো অনেক লেখাপড়া করেছ, বলোতো চৈতন্যের আগে পরে ক'জন ব্রহ্মচারী ছিল ?

আমি গুণে গেঁথে বললাম, 'সে কথা ঠিক। শ্রীনিবাস আচার্যর দুই পত্নী আর শ্যামানন্দের তো তিনজন। রূপ সনাতন শ্রীজীব ছিলেন ব্রহ্মচারী। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এলা বলে, 'অ্যাই, এবারে তুমি ধরেছো ঠিক। প্রকৃতি ত্যাগের ভুলটা ওরাই চালু করেছে। মহাপ্রভু কখনই ওকথা বলেননি। জানো, তাঁর পার্ষদ রামানন্দ বায় দুজন দেবদাসী নিয়ে সাধনা করতেন। চৈতন্য কি তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন না তার সঙ্গেই সবচেয়ে গুহ্য আলাপ করতেন ? যাই হোক, তুমি বাপু তোমার বইপত্র ঘেঁটে দ্যাখো আমার কথা ঠিক না বেঠিক।

বইপত্র ঘেঁটে যা পেলাম তা অবশ্য এলা ফকিরকে বলা হয় না আমার। কেন না ততদিনে সে মাটির তলায়। কিন্তু ঘাঁটতে গিয়ে যা সব জানা গেল সেও তো কম রোমাঞ্চকর নয়। প্রথমে নজরে পড়লো ঢাকার বাংলা একাডেমি পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ সংখ্যায় বাংলাদেশের নামকরা পণ্ডিত আহ্‌মদ শরীফের একটি নিবন্ধে আশ্চর্য এক উক্তি। শরীফ লিখেছেন :

> জনশ্রুতিজাত ধারণা স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গুহ্য সাধন প্রণালী ছিল ; এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক।

এর চেয়েও বিস্ফোরক খবর পাওয়া গেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৯১ বর্ষের ১ম সংখ্যার এক নিবন্ধে। সেখানে অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী নৃসিংহের লেখা এক চৈতন্য জীবনীর পরিচয় দিয়েছেন। নৃসিংহ লিখেছেন সংস্কৃতে 'শ্রী চৈতন্য মহাভাগবতম্' পুঁথি। কলকাতার বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনের গোপীনাথ আঢ্য মশাই পুঁথিটি দান করেছিলেন সাহিত্য পরিষদে। অন্ধকার পরিষদ প্রকোষ্ঠ থেকে পুঁথির উদ্ধার করে পরিচয় দিয়েছেন রমাকান্তবাবু। রচনাকাল ১৬৬৫ সাল। বইটি অবচীন তো বটেই। কিন্তু রমাকান্ত চক্রবর্তীর এই মন্তব্যও যথার্থ যে, 'একটি স্থানীয়, মিশ্র, এবং হয়তো সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কোন অবচীন বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ গৌরাঙ্গ লীলার একটি বিচিত্র ভাষ্যরূপে যথেষ্ট মূল্যবান'।

এখন দেখা যাচ্ছে নৃসিংহের লেখা 'শ্রীচৈতন্য মহাভাগবতম্' পুঁথির ৫১ক পৃষ্ঠায় রয়েছে এমন এক তথ্য যে,

> 'কায়ব্যূহ' প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'কামশাস্ত্র প্রবীণ' গৌরাঙ্গ অসংখ্য নায়িকার

সহিত রতিলীলা করিতেন।*

বলতেই হয় মারাত্মক সংবাদ এবং আহমদ শরীফের মন্তব্যের সঙ্গে কোথায় যেন মিলও রয়েছে ঘটনাটির। অতএব খুঁজতেই হয় আরো। তবে ভাবের পথে নয় পুঁথিব জগতে।

একজন কথায় কথায় জানালেন, বার্নিয়া গ্রামের শ্রী নন্দন ঘোষ অনেক কলমি পুঁথিটি মালিক। মানুষটা কালোকোলো দশাসই। গলার স্বরও বাজখাঁই। খবর দেওযা ছিল। বাস থেকে নামতেই আশপাশের সবাইকে জানান দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে।

শ্রী নন্দন অচিরে নিয়ে গেলেন তাঁর কুঁড়েয়। বললেন, 'আমরা সহজিয়া। জানেন তো সহজিয়া বৈষ্ণবদের অনেক ধারা। নিত্যানন্দের স্রোত, পাটুলীর স্রোত, রূপকবিরাজী স্রোত, বীরভদ্রের স্রোত। আমার পাটুলীর স্রোত। দীক্ষাশিক্ষা পাটুলী ধামে। গোঁসাইয়ের নাম সত্যদেব মহান্ত। তিনি অপ্রকট হয়েছেন গত শ্রাবণে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, আমার কাছে অনেক কলমি পুঁথি আছে। কিন্তু কি জানতে চান ? চাঁদের সাধন না করোয়াতত্ত্ব ? দেহ কড়চা না রাধাতত্ত্ব ?'

অতশত কি জানি ? শ্রীচৈতন্যের পরকীয়া সাধনের কোনো হদিশ কি মেলে কোনো পুঁথিতে, জানতে চাইলাম সেইটা। প্রসন্ন হেসে কাঠের সিন্দুক থেকে লাল খেরোয় বাঁধা লম্বাটে এক পুঁথি বার করে মাথায় ঠেকালেন। আমাকে দিয়ে বললেন, 'মুকুন্দ দাসের লেখা "আদ্য কৌমুদী"। পড়ে দেখুন। টুকে নিন। আছেন তো সারা দিন। সেবা হতে দেরি হবে। ততক্ষণ নাড়াচাড়া করুন পুঁথি। মহাপ্রভুর পরকীয়া সাধনের খবর আছে এই গ্রন্থে।'

অনেকক্ষণ ধরে পড়তে পড়তে হঠাৎ চোখ আটকে গেল আদ্য কৌমুদীর একটি শ্লোকাংশে। সেখানে বলা হচ্ছে :

> সন্ন্যাস করিয়া প্রভু সাধে পরকীয়া
> সার্বভৌম নন্দিনী শাটি কন্যাকে লইয়া ॥
> মহাপ্রভুর পরকীয়া শাটি কন্যা লইয়া
> অটল রতিতে সাধে সামান্য মানুষ হইয়া ॥

এসব পড়ে আমি পড়লাম আরো ধন্দে। শাটি কে ? বোঝা গেল সার্বভৌম কন্যা। কোন সার্বভৌম ? বাসুদেব সার্বভৌম ? এমন কথাতো কোথাও পড়িনি। শ্রীনন্দনকে একথা জানাতে সে বললো, গৌড়ীয় মতের লোকরা এসব কথা

---

* কায়ব্যূহ ধবো গৌবঃ কামশাস্ত্র প্রবীণকঃ।
অসংখ্যনায়িকাঃ প্রাপ্য শৃঙ্গারৈস্তা অতোষয়ৎ ॥

জানাবেন না স্বভাবতই। এ যে ব্রহ্মচর্যের বিরোধী কথা।

যুক্তি আছে কথাটায়, মনে হলো। কিন্তু চৈতন্য কেন সামান্য মানুষ হয়ে অটল সাধন করবেন ? এ প্রশ্নের জবাবে তাত্ত্বিক শ্রী নন্দন বেশ প্রত্যয় নিয়ে বলেন, 'আসল কথাই তো আপনার জানা নেই তাহলে। আপনি জানেন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ ? তাঁর তিন বাঞ্ছা ?

এ আর জানবো না ? গড়গড় করে বললাম :

যাক্ গে বাংলাতেই বলি। অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কেমন। শ্রীরাধার আস্বাদ্য কৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা কেমন এবং কৃষ্ণকে অনুভব করে রাধার কেমন সুখ হয় এই তিন বাঞ্ছার অভিলাষে গৌরাঙ্গের জন্ম নবদ্বীপে; শচীসিন্ধুগর্ভে।

শ্রী নন্দন বললেন, 'এ কথা কোথায় পেলেন ? কে বলেছে ?'

: কেন ? শাস্ত্রে আছে। স্বরূপ দামোদরের লেখা।

: ধুস্। ও শাস্ত্র মানছে কে ? ও তো বামুন-বোষ্টমের লেখা শাস্তর। সব বাজে। সব বাহ্য। আসল কারণ শুনবেন—মহাপ্রভু কেন এলেন নবদ্বীপে ? তবে শুনুন।

গুন গুন করে উঠলো প্রথমে সুর। তারপরে বাণী :

বৃন্দাবনে রসরাজ ছিল
রসের তাক্ না বুঝে ধাক্কা খেয়ে
নদেতে এল।

এই এক আশ্চর্য। কেবল গান আর গান। লোকধর্মের লজিকগুলো সবই গানে গাঁথা। কিন্তু ব্রজে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কোন্ রসের তাক্ বোঝেন নি যার জন্যে তাঁর নদদ্বীপে লীলা ? গান থামাতেই হলো। বাধা দিয়ে বললাম, 'কী সব গাইছেন ? ব্রজধামে নন্দের নন্দনের কিসের অভাব ছিল ?'

: জানেন না ? তাঁর ছিল না সহজ স্বভাব তাই করতে পারেন নি সহজসাধনা। ঈশ্বরের কি সহজ স্বভাব পারে ? কি করে হবে ? পিতামাতার কামনায় রজবীজে জন্ম হয়নি তাঁর। তাই স্বভাবে কামনা-শূন্য। কামছাড়া প্রেমের উদ্দীপন নেই। প্রেম ছাড়া সহজ সাধন হয় না। তাই তাঁকে জন্মাতে হলো নদীয়ায়। রজবীজে জন্ম এবার। কামনাময় দেহধর্ম। সেই কামনাকে অতিক্রম করতে নিলেন সন্ন্যাস। শাটিকে নিয়ে পরকীয়াসাধনে এবারে হলো সহজানন্দ। তিন বাঞ্ছা শুনুন এবারে গানে,

এক, ওরে আমি কটিতে কৌপীন পরবো।
দুই, করেতে করঙ্গ নেবো।
তিন, মনের মানুষ মনে রাখবো।

এবারে বুঝলেন শেষ বাঙ্গাটাই আসল, 'মনের মানুষ মনে রাখবো'।

বুঝলাম, অচৈতন্য থেকে ক্রমশ সচৈতন্য হচ্ছি। বাড়ি এসে শাটি কন্যার খোঁজে আরও অনেক বইপত্তর ঘাঁটতে লাগলাম। না, বৈষ্ণব শাস্ত্র নয়। নিতান্ত সহজিয়া সব পদাবলী বা ফকিরী গানের সংকলন উল্টোতে উল্টোতে দুদ্দু শাহের গানে পেয়ে গেলাম শাটি প্রসঙ্গ। কী রোমাঞ্চ! তাহলে তো শুধু পাটুলীস্রোতেই নয়, মারফতী গানেও। এই যে রয়েছে:

শাটি সে গোবিন্দচাঁদের পরকীয়া কয়।
কোন চাঁদ সাধিতে গোরা শাটির কাছে যায়॥

□

ধরে শাটির রাঙা চরণ
সেধে নয় সহজ সাধন।

কিন্তু এর পরেই লোকগীতিকার স্ববিরোধ তুলে ধরে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে। জানতে চায়:

ত্রিজগৎ যাহাতে কাঙাল
তারই তরে গোরা বেহাল।
তরে নারীত্যাগের ভেজাল
কেন গোরা দেয়?

বাস্তবিকই খুব জ্বলন্ত প্রশ্ন। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সব প্রাণী যে সংগমসুখের কাঙাল, স্বয়ং গৌরাঙ্গ যে নারীর সাহচর্যে বেহাল, সেই মানুষই কেমন করে দিতে পারে নারীত্যাগের পরামর্শ? এর মধ্যে তবে কি ভেজাল আছে কিছু? মনে পড়ে গেল এলা ফকিরের অনুমান। প্রকৃতিত্যাগের নির্দেশ বোধহয় মহাপ্রভু দেননি। ওসব বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর কূটকচাল। হবেও বা। কিন্তু আমার মন জানতে চায় অন্য একটা কথা। রজবীজে জন্ম বলে মানুষের মধ্যে থাকে কামনার সংস্কার—এ কথায় একটা স্পষ্ট জীবনবোধ আর সুস্থ যৌনতার স্বীকৃতি রয়ে গেছে।

আসলে আমাদের জন্মেরও একটা ধরন আছে। হঠাৎ শুনলে অশ্লীল লাগতে পারে আমাদের উচ্চশিক্ষিত মেট্রোপলিটন মনে, কিন্তু সত্যি সত্যিই আমার খারাপ লাগেনি যখন অগ্রদ্বীপের মেলায় জীবন গোঁসাই আমাকে অবলীলাক্রমে বলেছিল, 'জন্মের ব্যাপারটা দৈব। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ নারীর গর্ভে ঠিক সময় বুঝে বীজ ফেলে। ঠিক যেন দুধের মধ্যে দইয়ের সাঁজাল। মাতৃগর্ভের বিম্বমধ্যে জলে ভাসতে লাগলেন ব্রহ্মবস্তু। নিরাশ্রয় নিরুপাধি। হঠাৎ আত্মারাম দেখা দিলেন। বীজ ভাসতে ভাসতে ঢেউ খেতে খেতে বর্তুলাকার থেকে হঠাৎ লম্বা আকার

নিলো। এবারে সেই লম্বা থেকে হঠাৎ বেরোলো দুটো খেই। ব্যাস হয়ে গেল দেহ আর দুখানা পা। আরেক ঢেউয়ে তৈরি হলো দুখানা হাত আর মুণ্ড। এবারে বৃদ্ধি।'

এই পর্যন্ত বলে জীবন গোঁসাই এক গুরু শিষ্যের জবাবী গান ধবে দেন। দীন শরতের রচনা কি অনবদ্য। শিষ্য বলে,

এমন উল্টা দেশ গুরু কোন্ জায়গায় আছে
ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে সে দেশের লোক চলতেছে।
সে দেশের যত নদনদী
ঊর্ধ্ব দিকে জলের স্রোত যায় নিরবধি
আছে নদীর নীচে আকাশ বায়ু
তাতে মানুষ বাস করতেছে।
সে দেশে যত লোকের বাস
মুখে আহার কবে না কেউ নাকে নাই নিঃশ্বাস
মলমূত্র যে ত্যাগ করে না
আবার আহার করে বাঁচতেছে ॥

স্পষ্টই দেহতত্ত্বের গান। গর্ভবাসকালে মানবসন্তানের বিববণ। গানটা হঠাৎ থামিয়ে জীবন গোঁসাই ক্ষণ-বিবতির পর গুরুর জবানীতে প্রথম গানের জবাব দিতে লাগলেন আরেক গানে :

মন রে সেই দেশের কথা এখন ভুইলা গিয়াছ।
ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে সে দেশে বাস কইরেছ ॥
বিন্দুরূপে পিতার মস্তকে ছিলে
কামবশে গর্ভাবাসে প্রবেশ করিলে
শুক্র আর শোণিতে মিলে
বর্তুলাকার ধরিয়াছ ॥
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে
হল পঞ্চমাসে পঞ্চপ্রাণ ভৌতিক দেহেতে
সপ্তম মাসে গুরুর কাছে
মহামন্ত্র লাভ করেছ ॥
চন্দ্র সূর্যের নাইরে প্রকাশ
জলের নীচে অন্ধকারে ছিলে দশ মাস
ছিল নাভিপদ্মে মাতৃনাড়ী
তাই দিয়ে আহার কইরছ ॥

দীন শরৎ বলে সাধনার ফলে
অন্ধকার কারাগার হতে এদেশে এলে
মিছে মায়ায় ভুইলে রইলে
যাবাব উপায় কি করেছ ॥

জীবন গোঁসাইয়ের এই গানে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কেবল রয়েছে মনুষ্যজন্মের একটা আখ্যান। তার শেষকালে একটা মর‍্যাল, যেমন থাকে সব ভারতকথায়। মর‍্যালটার কথা ভাবলে অন্য আরেকটা দিক জেগে ওঠে। মর‍্যালের সার কথাটা এই যে, বহু যোনী ভ্রমণ শেষে অনেক সাধনায় পেলে মানুষজনম। কিন্তু এদেশে এসেই অর্থাৎ মাটিতে নেমেই মায়ায ভুলে গেলে তোমার প্রতিজ্ঞা। মানুষ হযে মানুষের সাধন করার কথা ছিল গুরুর নির্দেশে আর তুমি আটকে গেলে কামনা-কুহকে ? এর পরেব কথা হলো . এখনও উপায আছে, ধরো খুঁজে নাও ইহজীবনের গুরুকে, শিখে নাও সহজসাধন। মনে রেখো চৈতন্যকেও। এই মানুষ জনম নিয়ে তাঁকেও সহজ সাধন করতে হয়েছিল শাটিকে নিয়ে। তবে তাঁর মুক্তি হয়েছে।

এইখানে লালনের সেই গানটার কথা উঠবে যেখানে বলা হযেছে

আব কি গৌর আসবে ফিরে
মানুষ ভ'জেয়ে যা করো গৌবচাঁদ গিয়েছে সেরে।

এই কথার পূর্বসূত্রে বেছে নেওয়া যায় আরেকটা গান, সেটাও লালনের। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ব্রজ থেকে নদীয়ায় গৌরজন্মের একটা ক্রম ছিল :

ব্রজ ছেড়ে নদেয় এল
তার পূর্বান্তরে খবর ছিল
এবে নদে ছেড়ে কোথা গেল
যে জানো বলো মোরে ॥

চৈতন্যের মৃত্যুর কোন প্রামাণ্য বাস্তব খবর সত্যিই তো নেই। কোনো চৈতন্য জীবনীতেই জানা যায় না তাঁর অপ্রকট লীলার বর্ণনা। কেউ লেখেন, তিনি জগন্নাথের দেহে মিশে গেছেন, কেউ লেখেন তিনি ভাবাবেশে লীন হলেন মহাসমুদ্রে। একমাত্র জয়ানন্দ লেখেন পুরীতে নৃত্যকালে পায়ে ক্ষত হয়ে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। এইখানে লোকধর্ম করে এক সহজ সমাধান। তাদের যুক্তির ক্রম এইরকম—চৈতন্য কেন আবির্ভূত হলেন ? মানুষকে, মায়াবদ্ধ জীবকে বোঝাতে সহজ সাধনের মাহাত্ম্য এবং নিজেও বুঝতে তার গভীরতা। ঐটুকুই শুধু তাঁর জানা হয়নি ব্রজলীলায়, অপূর্ণতা ছিল তাই। কিন্তু সেই সহজ সাধনে পূর্ণতা পেয়ে শেষ পর্যন্ত চৈতন্য গেলেন কোথায় ? তার একটা উত্তর :

কেউ বলে তার নিজ ভজন
করে নিজ দেশে গমন
মনে মনে ভাবে লালন
এবার নিজদেশ বলি কারে ॥

চৈতন্য চলে গেলেন তাঁর নিজদেশে, তাঁর সাধনোচিত ধামে। তাঁর তো লোকশিক্ষা দিতেই আসা। সে কাজ সাঙ্গ ক'রে, জাতিবর্ণের ভেদ ঘুচিয়ে, মানুষের মধ্যে ভক্তির আকুলতা এনে, মানুষের সামনে রেখে এক ভাবোন্নত আদর্শ তিনি চলে গেলেন। এখন আমাদের কি হবে ? আমরা কেমন করে তাঁকে পাবো বুঝবো ? তাঁকে কিভাবে পাওয়া যাবে ? কেবল অনুমানে ?

জবাব মিললো গোরাডাঙ্গা গ্রামে বাউল-ফকির সংঘের সম্মেলনে। পৌষের প্রচণ্ড শীতের মধ্যরাত। চারপাশ নদীয়া-মুর্শিদাবাদের তাবৎ বাউল-ফকিরে ছয়লাপ। গাঁজার গন্ধে বাতাস মত্ত। একটা মোটা কম্বলে জ্বাড় কমছে না কিছুতে। গান ধরেছেন সনাতন দাস। সত্তর বছর পেরোনো উদাসীন। গান তো নয়, যেন আত্মনিবেদন। কতক গান আর কতক বোঝান। গায়ক আবার কথক। হঠাৎ হঠাৎ নেচেও ওঠেন। কী সে নাচ, কত তার আর্তি। গেয়ে উঠলেন :

হিসাব আছে এই মানব-জমিনে
গড়েছে তিন কারিগর মিলিয়ে শহর
টানা দিয়ে তিনগুণে।
শুভাশুভ যোগের কালেতে
জীব মায়াগর্ভে প্রবেশ করে ক্ষিতির পথেতে
উলোট্ দল কমল যথা বিশেষ মতেতে ॥

মাতৃগর্ভের কথা বলছি গো। তিন কারিগর হলো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর তিন গুণ হলো সত্ত্ব রজ তম। উলোট্ দল কমল হ'ল মাতৃগর্ভের ফুল। সেখানেই জীবনের সূচনা গো। এবারে শোনো :

এইবার সৃষ্টিকর্তা গড়লেন আত্মা
জীবের কর্মসূত্রের ফল জেনে।
প্রথম মাসে মাংস শোণিতময়
দুই মাসে নর নাভী কড়া অস্থি-র উদয়—
তিন মাসে তিন গুণে জীবের মস্তক জন্মায়
চতুর্থেতে নেত্র কর্ণ ওষ্ঠ চর্মলোম..... ।

মানুষ কি একদিনে হয় ? এ কি পশু যে শুধু জীবনধারণ করবে ? মানুষকে যে ক্রিয়াকরণ করতে হবে। বুঝতে হবে সব কিছু। চেতনা চাই। চাই

ভালোমন্দের জ্ঞান, সৎ অসতের বিবেচনা। তাই ধীরে ধীরে তার গঠন।

পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার
পঞ্চতত্ত্ব এসে করলেন আত্মাতে সঞ্চার।
সেইদিন হলো জীবের আকার ও প্রকার
ছয় মাসেতে ষড়রিপু বসিল স্থানে স্থানে ॥

পঞ্চতত্ত্ব মানে পঞ্চভূত। পৃথিবীর যত ফুল ফল দানাশস্যের মধ্যে থাকে পঞ্চভূত। সেই গর্ভফুলেব শোণিত থেকে সন্তান পায় পঞ্চভূত। ছ মাসে জীব যেই আকার আকৃতি পায় অমনি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ আর মাৎসর্য এই ষড়বিপু তাকে ভর কবে।

সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে—
এরা আপন আপন শক্তি লয়ে বসিল এসে।
অষ্টমেতে অষ্টসিদ্ধি এল ভোগের কারণে ॥
নয় মাসেতে নয় দ্বার প্রকাশ
দশ মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে ॥

নবদ্বার বলতে বোঝায় দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখবিবর, পায়ু আর লিঙ্গ। দশ মাস পুবে গেলে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ফুটে ওঠে। তখন গর্ভমধ্যে সন্তান ছটফট করে। বলে, 'মুক্তি দাও এ অন্ধকার থেকে। বাঁচাও আমাকে এই গর্ভকষ্ট থেকে ; এ যে শোণিতময় পিচ্ছিল'। স্রষ্টা তখন বলে, 'জনম হলে কি করবি মনে থাকবে তো ?' 'হ্যাঁ, মনে থাকবে। করবো মানুষ ভজন। নির্বিকার হ'য়ে করবো সাধন'। কিন্তু ঘটে ঠিক উলটো। তাই—

গোঁসাই কালা বলছেন শোন্ রে গোপালে
বায়ু কর্তা নেত্র এলো বাহির মহলে—
এইবার জীব মূলে ভুলে কাঁদিছে পড়ে ভূতলে।

প্রসবের সময় প্রথমে তো মুণ্ডই বেরোয়, তাতে থাকে চোখ। সেই চোখ প্রথম পৃথিবী দেখে আর মায়ার ঝাপট লাগে সেই চোখে। সে কেঁদে ফেলে আর সেই সুবাদে মূলেই ঘটে যায় ভুল।

সে কাঁহা কাঁহা কাঁহা বলে
জীবের সম্বন্ধ তাই ঠিক থাকে না
যখন উদয় যেখানে ॥

সে কেবল কাঁহা কাঁহা বলে। কোথায় সে কোথায় আমি ? কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম ? কোথায় গেল আমার স্রষ্টা। তখন জননী দিল স্তন। আঁকড়ে ধ'রে দুহাতে শিশু দিল টান। জন্মালো তার কামনা। ভেসে গেল

প্রতিজ্ঞা। এই তো জীবন বাবাসকল।

বাপরে, এ যে পুরো ফ্রয়েডিয়ান চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু এর সঙ্গে চৈতন্যের সম্পর্ক কোথায় ? গানের শেষে সনাতন দাস বসে গাঁজা টানছেন টোঙের ঘরে। আমি অকুতোভয়ে ঢুকে পড়ে জিগ্যেস করলাম, 'যে গান গাইলেন তার সঙ্গে গৌরাঙ্গ তত্ত্বের যোগ আছে কিছু ?'

সনাতন নিমীল চোখে বললেন, 'গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যতত্ত্বের সঙ্গে সব কিছুর যোগ আছে। এই যেমন ধরো আমাদের দুই গুরু—দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু। এখন দীক্ষাগুরু হলেন কৃষ্ণস্বরূপ আর শিক্ষাগুরু রাধাস্বরূপ। তাহলে দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরুর সংযোগ হচ্ছে এই শিষ্যদেহে। তাহলে শিষ্যই চৈতন্য। আর শুনবেন ?'

খুবই নতুন কথা সন্দেহ কি। তাই উদ্বুদ্ধ হয়ে বললাম, 'আরো বলবেন ? বলুন। এসব কথা আগে শুনিনি।'

: হুঁ। ভ্রান্ত বুদ্ধি। আমাদের সব এই শরীর দিয়ে জানতে হয়। যাক শুনুন তাহলে চৈতন্যতত্ত্ব। চৈতন্য কোথায় জন্মালেন, কার বীজে ? তাঁর জন্মদাতা জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ কে ? জগতের প্রভু অর্থাৎ জীব আর ঈশ্বরের মিশ্রণ যেখানে। সেই মিশ্র বীজে তাঁর জন্ম। বীজ ও হ্লাদিনীর সমন্বয় এই হলো চৈতন্য। চৈতন্যতত্ত্ব বোঝার জন্য সেই কারণে প্রকৃতি লাগে। প্রকৃতি ছাড়া ধর্ম হয় ? আনন্দস্বরূপ রসের প্রয়োজনে প্রকৃতি। অদ্বয় চৈতন্য লাভের জন্যও প্রকৃতি। সব বুঝতে পারছেন ?

: সবটাই কি আর বুঝছি ? কিছু বুঝছি, কিছু আবছা থাকছে। খুব সহজ তো নয়।

'তবে এই মুখে কুলুপ আটলাম' সনাতন দাস বললেন, 'আর কোন ভাবেই কিছু বলাতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, গাঁজার ঘোর লেগেছে ভাবও লেগেছে। একটা গান গাই বরং। যদি জিগ্যেসের জবাব পান—

আছে রূপের দরজায় শ্রীরূপ মহাশয়
রূপের তালা ছোড়ান
তার হাতে সদাই।
যে জন শ্রীরূপ গত হবে
তালা ছোড়ান পাবে।

কি বুঝলেন গো ?'

আমি বললাম, 'শ্রীরূপ মানে তো নারীদেহ। ঠিক বলেছি ?'

সনাতন এগিয়ে এসে আমার মাথার চুল এলোমেলো করে দিলেন দু'হাতে। তারপর জ্বলজ্বলে চোখে হেসে বললেন, 'তবে তো নিত্যানন্দ বোঝা সারা হয়েছে। এগোন, আর একটু এগোন। তাহলেই চৈতন্য আর অদ্বৈত বুঝবেন'।

আমার সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

আমি বললাম, 'যেন অনেকটাই বুঝতে পারছি তবু সব তো পরিষ্কার হলো না। কি করি বলুন তো ? কোথায় যাই ?'

: কোথায় কোথায় গেছেন ?

: সব বৈষ্ণবতীর্থে। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, বাগনাপাড়া অগ্রদ্বীপ কাটোয়া আদি সপ্তগ্রাম·····

: ও সবই শ্রীপাট। কিন্তু সহুজেদের আখড়ায় বেশি যাননি। একবার নসরৎপুর যান দিকিনি। আর পাটুলী।

এবারে অগ্রদ্বীপ থেকে বারুণীর স্নান সেরে ফেরার পথে পাটুলী নামলাম। সুন্দর গ্রাম একধারে। আরেকধারে গড়ে উঠছে গঞ্জ। নতুন নতুন বাড়ি বাজাব হিমঘর। ওদিকে আমার কাজ কি ? বরং গঙ্গার দিকে ছড়ানো-ছিটোনো অনেক কুঁড়েঘর আর মেটে দাওয়া। এখানেই দু'তিনশো বছর ধরে সহজিয়াদের ডেরা। এঁরা করেন এক গোপন দেহসাধনা। বিশেষ এক ক্রিয়াকরণ থেকে এঁদের সাধনধর্মের নাম হয়েছে পাটুলী-স্রোত। এঁদের বহির্বাস বলতে সস্তাদরের সাদা মার্কিনের আলখাল্লা আর জনতা ধুতির লুঙ্গি। মাথায় চূড়াবেশ। গলায় তুলসীকাঠের মালা। হাতে নারকোল মালার কিস্তি। অনেকে করেন দুই চাঁদের সাধনা, অনেকে চার চাঁদের। খাঁটি ব্রহ্মচারী বাবাজী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সহজিয়াদের খুব ঘৃণা করেন। বলেন, পাষণ্ডী, ভ্রষ্ট। বলেন সহুজেরা কদর্য ভক্ষণ করে আবার গৌরের নাম করে। ছিঃ।

এসব খানিকটা জানা ছিল বলে পাটুলীর সদাব্রত অধিকারীর আখড়ায় আমার খুব অসুবিধা হয়নি। কথায় কথায় বরং অন্য কথা তুললাম। বললাম, 'আচ্ছা এই যে চূড়াকেশ রেখেছেন, পরেছেন আলখাল্লা আর তুলসীমালা—এর তাৎপর্য কি ? লোক দেখানো না অন্য কিছু ?'

সদাব্রত বললেন, 'খুব ভালো কথা জিগ্যেস করেছেন, কিন্তু কেউ কখনও জানতে চায়নি এ কথাটা। তবে শুনুন, কেন এই পোশাক। শাকের ক্ষেত দেখেছেন তো। সামান্য জিনিস। কিন্তু তাকেও রক্ষা করতে একটু বেড়া দিতে হয়। নইলে ছাগলে মুড়িয়ে খাবে। সাধকের পোশাক তেমনই তার বেড়া, রক্ষাকবচ। হাজার হলেও আমরা তো মানুষ। কুচিন্তা কুকর্মে মন যায় না কি ? যায়। তখনই হাত রাখি কণ্ঠিতে, চূড়াকেশে, আলখাল্লায়। বলি, তুমি না সাধু,

ধরেছো উদাসীনের বেশ, তবে ? ব্যাস, আত্মসংযম ফিরে এলো। পতনের হাত থেকে রক্ষে। বুঝলেন ?'

বুঝলাম, মানুষটার ভিতরে বিশ্লেষণ আছে, অর্থাৎ জ্ঞানী। হয়ত পেতেও পারি কিছু গৌরতত্ত্বের হদিশ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা নিয়ম, হঠাৎ কথাটা তোলা যাবে না। খেলাতে হবে খানিক। তাই বললাম, 'বেশ বলেছেন। কিন্তু এমন করে তো সবাই বলতে পারে না। এই বলা কি ভেতর থেকে আসছে ?'

: না, ভেতব পরিষ্কার হলেই বাক্য আসে না। বাক্যের চর্চা করতে হয়। খুব বড় সাধক দেখেছেন ? তাঁদের ভেতরটা পরিষ্কার জ্ঞানে টইটম্বুর। কিন্তু দেখলে বুঝতে পারবেন না। স্তব্ধ শান্ত। প্রকাশ নেই। আর বাচক যারা তাদের ভেতরে যেমনই হোক, বাইরে শান দিতে হয়। যেমন ধরুন এই হ্যারিকেন লণ্ঠন, ভেতরে হয়তো আলো আছে কিন্তু কাঁচটা চকচকে করে না মাজলে তেমন আলো পাবেন কি ? সাধকের সেইজন্যে ভেতর বার দুই-ই পরিষ্কার রাখতে হয়।

: তার মানে মন ও শরীর।

: হ্যাঁ, তবেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞান। ঐ তিনেই এক। অদ্বৈত।

মনে হলো এবাবে কথাটা তোলা যেতে পারে। তাই বলে ফেললাম, 'আচ্ছা খুব সংক্ষেপে গৌরাঙ্গতত্ত্বটা কি ?'

: খুব সংক্ষেপে তো একটা বীজমন্ত্র। সেটা গোপন। আমাদের পাটুলী-ঘরের শ্রীমন্ত্র। দীক্ষা শিক্ষা ছাড়া তা দেওয়া যায় না। তবে একটু বিস্তারে বলতে গেলে :

পূর্বে রাধা ছিলে তুমি আমার অন্তরে।
এবে রাধা আমি রই তোমার অন্তরে ॥

কিছু বুঝলেন ?

: হ্যাঁ বুঝলাম। ব্রজে কৃষ্ণের অন্তরে ছিলেন রাধা আর নবদ্বীপলীলায় রাধার অন্তরে ছিলেন কৃষ্ণ। সেইজন্যেই অন্তর্কৃষ্ণ বহির্রাধা। সেইজন্য চৈতন্যের গৌর অঙ্গ।

সদাব্রত বললেন, 'প্রায় বুঝেছেন, তবে গৌর অঙ্গের অন্য মানে আছে। একটা গানে সে তত্ত্বটা আছে। ওহে, হরিদাসী, আমার সারিন্দাটা দাও দিকি। একটু মহতের পদ গাই।'

এতক্ষণে হরিদাসীকে দেখা গেল। শাদা ব্লাউজ আর শাদা থান-পরা বৈরাগিনী। নাকে, কপালে গেরিমাটির তিলকসেবা। গায়ের বর্ণ ঘোর কালো।

খুব ভক্তিভরে মেটে দাওয়ায় বাদ্যযন্ত্রটি নামিয়ে একপাশে নতমুখে বসলো। তার যন্ত্র টুং টাং শব্দে বাঁধা হচ্ছে সেই ফাঁকে আমি বলে বসি, 'হরিদাসীর গান শুনবো না ?'

হরিদাসী মধুর হেসে ঘাড় কাত করে সায় দেয়। কতজন আমাকে বলেছে, গান যদি শোনেন তো রাঢ়ের বোষ্টমীদের গলায়। শুনেছি অবশ্য অগ্রদ্বীপের মীরা বাঈয়ের আখড়ায় অনেক বোষ্টমীর গান। তবে সে হলো মাঠে মেলায়। সেখানে নিগূঢ় গান কম হয়। ইতিমধ্যে সারিন্দা বাঁধা শেষ। সদাব্রত গলা চড়িয়ে ধরেছেন :

গৌর তুমি দেখা দাও আবার
অগ্নিকুণ্ডের কোলাহলে
কান ফেটে যায় ভূমণ্ডলে
ঝাঁপ দাও সেই চিতানলে
যদি বাঞ্ছা হয় আবার ॥

এরকম গান কখনও তো শুনিনি। গৌর তুমি দেখা দাও আবার। কোথায় দেখা দেবেন ? কোন্ রূপে ? অগ্নিকুণ্ডের কোলাহল আর ঝাঁপ দাও বলতে কামাগ্নি বোঝাচ্ছে কি ? তবে তো গৌরকে সাধক তার নিজের দেহেই আহ্বান করছে। আশ্চর্য গান তো ? গানের বাকি অংশ ·

সে-অগ্নিতে হলে দাহন
হয়ে যাবে অগ্নিবাহন
কর্ম হবে সিদ্ধ কারক
কাঞ্চন বর্ণ হবে তার।
গৌর তুমি দেখা দাও এবার ॥

গান থামিয়ে সদাব্রত বললেন, 'গোরা রূপের মানে পেলেন ? কামের রঙ কালো, ঘোর কৃষ্ণ। সেই কামে ঝাঁপ দিয়ে শোধন করে প্রেমের জন্ম। সেই প্রেমের বরণ কাঞ্চন। গৌরাঙ্গই প্রেমস্বরূপ। তাঁর বরণ হেম।'

আশ্চর্য, সকল লোকধর্মই গানে গানে আমাকে বোঝাতে চাইছে যে, চৈতন্য কোনো ব্যক্তি নন, অবতার নন, চৈতন্য একটা স্তরান্বিত চেতনা। তাঁকে মূর্তিতে বা মন্ত্রে পাওয়া যাবে না। পেতে হবে সাধনার বিমিশ্রণে, শোধনে। ব্যাপারটা আমাকে কেবলই টানতে লাগলো এবার। আমি বললাম, 'গৌরাঙ্গকে নিয়ে সহজ সরল গান নেই আপনাদের ?'

: সরল মানে ? শুনতে না বুঝতে ? আমি যেটা গাইলাম সেটাও খুব সরল গান অবশ্য যদি বোঝেন। আচ্ছা এবারে একটা শুনতে সহজ গান শুনুন। নাও

হরিদাসী, সুর ধরো।

সদাব্রত চোখ বন্ধ করে সারিন্দায় চড়া পর্দায় সুর তোলেন আর সেই পর্দা থেকে হরিদাসী ধরে :

গুরু হে, চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলই
চাঁদ গৌর আমার জপের মালা
গৌর গলার মাদুলী
আমি গৌর গহনা গায়ে দিয়ে
ধীরে ধীরে পা ফেলি ॥
নয়নের অঞ্জন গৌর
গৌর নোলক অলক তিলকা চন্দ্রহার
গৌর কঙ্কন গৌর চাঁপাকলি।
গৌর নাম করি গায়ে নামাবলী ॥
গৌর আমার শঙ্খ শাড়ি
গৌর মালা পুঁইচে পলা চুলবাঁধা দড়ি
দুই হাতের চুড়ি গৌর আমার
গৌর কাঁচুলি ॥

গান শেষ হতে দেখি হরিদাসীর চোখভরা জল। বিশ্বাসের জগতে আমি জিজ্ঞাসু নাস্তিক! খুব বেমানান লাগে। আমি বললাম, 'এই কি গৌরনগর ভাবের পদ?'

'তা হবে' খুব উদাস ভঙ্গিতে বললেন সদাব্রত, 'ও সব কথা তো আপনাদের। আর আমাদের কথা হলো একটাই—কবে গৌর পাবো।'

জিজ্ঞাসুর সঙ্গে ভক্তের এইখানটায় তফাৎ, জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের। আমি তো বুঝতে চাই স্তরে স্তরে, বিন্যাসে এবং শ্রেণীকরণ করে। ওঁরা উপলব্ধি করেন প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধ এইসব থাকে থাকে। ওঁদের জানাটি খাড়াখাড়ি, আমারটা আড়াআড়ি। আমি সমাজসত্যের ব্যাপ্তিতে ধরতে চাই চৈতন্যকে, ওঁরা ব্যক্তিক বোধের সীমায় নিজের ক'রে চান চৈতন্যকে। অথচ ওঁদের, মানে লোকধর্মে লজিক ছাড়া মীথ ছাড়া কিছুই গৃহীত হয় না। সেইজন্যেই নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে ভালোবাসেন ওঁরা। লড়াই লাগে না উচ্চবর্গের সঙ্গে। তাই ওঁদের মীথ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের মূলে থাকে কৌতুক। আমাদের বেদপুরাণ আর শ্রেণীবর্ণ চেতনা সম্বন্ধে ওঁদেরও কৌতুক আছে কিন্তু কৌতূহল নেই। চৈতন্য সম্পর্কে দুটো শ্লোক তো আমি কতবার শুনেছি। তার একটা :

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়

তার মাঝে গোরা এক দিব্যযুগ দেখায়।

এখানে তো স্পষ্টই আমাদের পৌরাণিক যুগবিন্যাস আর অবতারতত্ত্বকে বাতিল করা হয়েছে। নিম্নবর্গের উদাব-ভাবনায় দিব্যযুগ শব্দটি এক নতুন সৃষ্টি। এখানে দিব্যযুগ এক আদর্শ স্বপ্নের যুগ যা ব্রাহ্মণ্য পোষিত নয়, রাজন্যশাসিত নয়, নয় শ্রেণীবর্ণে দীর্ণ। গৌরাঙ্গ যদি কোন সুস্থ সমাজ গঠনের আদর্শ এনে থাকেন তবে তা মুক্ত সমাজ। মানবিকতায় সমুজ্জ্বল, দেহধর্মে উষ্ণ, কামনাবাসনায় মর্ত্যধর্মী। এই বোধে দাঁড়িয়ে লোকধর্মের আরেকটা বক্তব্য হলো :

গোরা এনেছে এক নবীন আইন দুনিয়াতে
বেদপুরাণ সব দিচ্ছে দূষে সেই আইনের বিচারমতে ॥

গোরার এই নবীন আইনই তাহলে নিম্নকোটির অভয়মন্ত্র। এই আইনের বলেই তাঁরা শাস্ত্রকে খাটো করেন মানুষকে বড় করে দেখেন। ঘটে পটে পূজার বিরোধিতা কবেন। পুরুষ আর নারীব মধ্যে আরোপ করেন কৃষ্ণরাধার মীথ। সহজিয়াদের এই ধর্মের ছক এমন কি এম· টি· কেনেডির মত বিদেশীরও বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি স্বচ্ছভাষায় লেখেন :

> The worshipper is to think of himself as Krishna and to realise within himself the passion of Krishna for Radha, who is represented by the female companion of his worship. Through sexual passion solvation is to be found. The Radha-Krishna stories are held as the justification of their practices which are secret and held at night.

এখন এই রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী, বড়াই বুড়ি চন্দ্রাবলী-আইহনের মীথ, গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-শচীমা-র ত্রি-কাহিনী এসবের পেছনে স্পষ্ট যুক্তি পরম্পরাও যে আছে তা অন্তত আমি কোনো নিবন্ধে পড়িনি। লোকধর্মের আরেক স্ফুরণ তর্জা-পাঁচালী-কবিগান-বঁদগান ও কথকতায় পুরাণের এত ভাঙাগড়া হয় মুখে মুখে গায়কে গায়কে, যার কোনো বিশ্লেষণ কেউ লিখে রাখেনি। রাখলে বাঙলায় পেতাম আর এক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীকে।

এই সব ভাবনা থেকে দুপুরবেলার অন্নসেবার পরে আমি সদাব্রতকে বললাম, 'কিছু খুচরো প্রশ্ন আছে। জবাব দেবেন ?' সদাব্রত রাজি হ'তে আমি জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা আপনাদের বিশ্বাসে কি বলে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি অপরাধ ? কেন তাঁকে মহাপ্রভু ত্যাগ করলেন ?'

সর্বজ্ঞের মত হেসে সদাব্রত বললেন, 'ত্রেতা যুগে যিনি সীতা, কলিতে তিনিই

বিষ্ণুপ্রিয়া। মায়ামৃগের ঘটনা মনে আছে তো ? লক্ষ্মণের নিষেধ না মেনে গণ্ডী পেরিয়ে সীতা যেই রাবণকে ভিক্ষা দিলেন অমনি রাবণ সীতাহরণ করলেন। সেবারের নিষেধ অমান্য করার জন্যেই এবারে মহাপ্রভু ত্যাগ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কি, এবারে শচীমা-র কথা মনে জাগছে তো ?'

: অবশ্যই। মাতৃঋণ শোধ না ক'রে চৈতন্য কেন তাঁকে কাঁদালেন ?

: শচী মা ত্রেতা যুগে যে ছিলেন কৈকেয়ী। পুত্রবিরহের বেদনায় মা কৌশল্যা কৈকেয়ীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ছেলে ছেড়ে থাকার কষ্ট তুই পাবি কলিযুগে। তাই নিমাই সন্ন্যাস।

: জগাই মাধাইয়েরও এরকম ব্যাখ্যা আছে নাকি ?

: হ্যাঁ, যুগে যুগেই তো ভগবানের সঙ্গে শত্রুভাবে ভজনা চলছে। কলিতে যারা জগাই মাধাই মূলে তারা স্বর্গের দারোয়ান জয় বিজয়। ব্রহ্মশাপে তাদের নরদেহ আর শত্রুভাব। এরাই আগে হয়েছিল রাবণ-কুম্ভকর্ণ ত্রেতায়, শিশুপাল-দন্তবক্র দ্বাপরে।

চমৎকার। আমাকে তারিফ করতেই হয়। এবারে শেষ প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা চৈতন্যকে দীক্ষা দিলেন কেশবভারতী এর তাৎপর্য কি ? ভগবানের আবার দীক্ষা কেন ?

: গুরুতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতেই এমন ঘটেছে। আর এ ঘটনাও তো নতুন নয়। সত্যযুগে সনক ঋষি, ত্রেতায় বিশ্বামিত্র, দ্বাপরে গর্গ যেমন তেমনই কলিতে কেশবভারতী।

সদাব্রত নিজেই যে ক্রমে নিজের জটে জড়িয়ে পড়ছেন তা বুঝতে পারছিলেন না। অথচ এতো খুব স্বচ্ছভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির বাইরে যারা দিব্যযুগ মানেন তাঁরা কেন তাঁদের মীথের সমর্থনে সেই সত্য ত্রেতা দ্বাপরকে টানবেন ? এইখানে নিম্নবর্গের চিন্তাভাবনার স্বরূপটাই ধরা আছে। একদিকে উচ্চবর্গের পুরাণ ও মীথের প্রতিবাদী চেতনা থেকে তাঁরা নিজেদের নতুন মীথ তৈরি করেন অথচ আবার নিজেদের যুক্তি দিয়ে বানানো মীথের সমর্থন খোঁজেন উচ্চবর্গের পুরাণেই। একইসঙ্গে প্রতিবাদ আর সহকারিতা।

সেদিন সদাব্রত আমাকে এগিয়ে দিলেন পাটুলী স্টেশন পর্যন্ত। দুপুর শেষের ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লোকালের স্বরূপ চৈতন্যতত্ত্বের মতই দুর্জ্ঞেয়। কখন আসবে কে জানে ? ব'সে আছি স্টেশন চত্বরের সিমেন্টের বেঞ্চে। মাথার উপর কাঠমল্লিকা ফুল পড়ছে টুপটাপ। বইছে এলোমেলো বাতাস। জমছে দুটো পাঁচটা করে যাত্রীর দল। হঠাৎ এসে পড়লো একদল বাউল। কোনো মেলামচ্ছব থেকে আসছে বোধহয়। খানিক গাঁজা খেলো সবাই। আমি গুটি

গুটি তাদের মাঝখানে বসে পড়লাম তাবপর ঘষটাতে ঘষটাতে গিয়ে বসলাম বাউলদের মাল্‌তে অর্থাৎ দলনেতার সামনে। বললাম, 'কিছু তত্ত্বকথা জানতে চাই, বলবেন ?'

গাঁজায় টং চোখ লাল বাউল গোঁসাই বলেন, 'তত্ত্ব জানতে চাও, তা আত্মতত্ত্ব সেরেছো ?'

আমি বুঝলাম, সেই বাঁধা ফবমুলা। আমার পবীক্ষা হবে। বললাম, 'জিজ্ঞাসা করুন।'

: তুমি কে ? এলে কোথা থেকে ?

: আমি মানুষ। ছিলাম পিতাব মস্তকে, বিন্দুরূপে।

: বাঃ বেশ। পিতাব বিন্দু কোথা থেকে এলো ?

: দানা শস্য ফলমূল থেকে। তাব মূলে পঞ্চভূত।

: ভালো। খুব ভালো। তো পঞ্চভূত কি ?

সব প্রশ্নই পটপট জবাব দিলে প্রশ্নকাবীব অহং আহত হয় জানি, তাই বোকা সেজে মুখ বিপন্ন কবে বলি, 'ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম পর্যন্ত জানি। তাঁরা যে কে জানি না।'

অজ্ঞতা এসব সময়ে কাজ দেয়। ঠিক তাই হলো। বাউল গোঁসাই দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ব্যোম মানে চৈতন্য, মরুৎ নিতাই, তেজ অদ্বৈত, ক্ষিতি গদাধব আব অপ হলো শ্রীবাস।'

: তাহ'লে পঞ্চতত্ত্বে দেহের গঠন ?

: ঠিক বলেছ। তোমার প্রবর্ত দশা ঘুচেছে। আচ্ছা, আর একটা কথা তোমারে আমি শুধাবো। জবাব দিলে তবে তোমার তত্ত্ব কথার জবাব পাবে। কি, রাজি তো ? আচ্ছা বলতো, হনুমানের কেন মুখ পুড়লো ? লঙ্কার আগুন ল্যাজে লেগেছিল, সেই আগুন মুখে ঘষেছিলো—এসব বাজে কথা বলবে না কিন্তু। নাও, এবাবে বলো।

হা ঈশ্বব। শেষকালে আমাকেই বানাতে হবে মীথ এবং তা নিম্নবর্গের অদ্ভুত যুক্তি মেনে ? এমন বিপদ থেকেই মীথের জন্ম নাকি ? যাই হোক, খেলে গেল বুদ্ধি। গ্রামের মানুষেব স্পর্শকাতর ভাবনা কিছু কিছু জানতাম। তাই মনে রেখে বললাম, 'হনুমানকে রামচন্দ্র বলেছিলেন অশোকবনে গিয়ে জানকীকে রামের অঙ্গুরীয় দেখাতে এবং বলতে যে, মা জননী তোমার ভয় নেই। তোমার উদ্ধারের জন্যে যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে। কিন্তু হনুমান সীতাকে এইসব বলে তারপরে এক বাড়তি কথা বলে ফেললে। 'মা জানকী রামচন্দ্রকে দেখবে ? তবে ওঠো আমার কাঁধে। তোমাকে নিয়ে একলাফে আমি সাগর পারে যাবো।' এতে

দুটো দোষ হলো। আরে মূর্খ হনুমান, তুই করবি সীতার উদ্ধার ? এই অহংকার তার এক নম্বর অপরাধ। আর তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ এই যে হনুমান সীতাকে কাঁধে চড়াতে চেয়েছিল ! তার মানে তার অঙ্গস্পর্শের বাসনা হয়েছিল। পশু তো ? এই দুই পাপে তার মুখ পুড়লো।

বাউল গোঁসাই বললেন, 'সাবাশ'। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

বাউল গোঁসাইয়ের মনটা বেশ খুশি খুশি। বললেন, 'একটা গান শোনো। দেখি তুমি এ-তত্ত্বটা ধরতে পারো কিনা। শোনো আর ভাবো :

তুমি ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন
সেইতো তোমার গুরু বটে
সে যে আছে, দেহের মাঝে
তারো ভালোবাসা অকপটে ॥'

আমি ভাবলাম এ-তত্ত্ব তো বেশ কঠিন। এই কি চৈতন্যতত্ত্ব ? আমি ঘুমালে জেগে থাকে আমার চেতনা। কিন্তু ততক্ষণে গানের পরের অংশ এসে গেছে :

জীব চলে বলে ফিরে
শুধু তো তাহারই জোরে
সুখ দুঃখ আদি করে
সকলই ঘটায় এই ঘটে।

চেতনার বশেই কি মানুষ চলে বলে ? না কি প্রাণের কথা বলা হচ্ছে এখানে ? কিন্তু প্রাণই কি সুখ দুঃখের কারক ? এবারে পরের অংশ :

করিলে তাঁর, সাধনা
সকলই যাইবে জানা
হবে না আর আনাগোনা
এ ভব সংসার সংকটে।

না, নিশ্চয়ই প্রাণ বা চেতনার কথা বলা হচ্ছে না এ-গানে। প্রাণ বা চেতনার সাধনা খুবই ভাববাদী কথা। বস্তুবাদী বাউল এ গান গাইবে কেন ? এমন কিসের এই সাধনা তাহ'লে যাতে জন্মমরণ পার হওয়া যায় ? এবারে শেষ অংশ :

সে যেদিনে ছেড়ে যাবে
তোমারে তো শব করিবে
কেনা বেচা ফুরিয়ে যাবে
এত্ত সাধের ভবের হাটে।

চমৎকার। এবারে বুঝেছি। বললাম, 'শ্বাসের কথা বললেন তো' ? শ্বাসই তাহলে গুরু ? সেই চালায় তাই চলি। সে না থাকলেই আমি শবমাত্র। আর

সেই শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জ্যান্তে মরার অনুভূতি হয় অর্থাৎ দেহমনের বাস্তব চেতনা থাকে না। ঠিক বুঝেছি তো ?

: বেশ বুঝেছো। আর একটু বোঝো। ঐ শ্বাসের চলাচল থেকেই বিন্দুর চলাচল। শ্বাস নিযন্ত্রণ থেকেই বিন্দু রক্ষা। বিন্দুই চৈতন্য বিন্দুই কৃষ্ণ। বিন্দুর আবেক নাম মণি।

যেন একটা দমকা হাওয়াব ঝাপট লাগে সহসা। 'তাঁকে জানতে গেলে গুরুকে বশ করো' গানের মানে এবারে এতদিনে কি তবে বুঝলাম ? গুরু মানে শ্বাস ? তিনি মানে কৃষ্ণ অর্থাৎ চৈতন্য। একেবাবে দিশেহাবা হয়ে, আবার আনন্দে উত্তেজনায় বললাম, 'তবে কি চৈতন্যতত্ত্ব বুঝে ফেললাম ?'

'বোঝো নি, তবে বোঝাব পথে এবারে খানিক দাঁড়িয়েছো' বললে বাউল, 'গবম থাকতে থাকতে আরেকটা গান শুনে নাও .

কোন্ কৃষ্ণ হয় জগৎপতি
মথুরায় কৃষ্ণ নয় সে,
সে কৃষ্ণ হয় প্রকৃতি।

গান থামিযে বললে, 'কি বুঝলে ? প্রকৃতি মানে কি ?'

বললাম, 'প্রকৃতি মানে বিন্দু'।

: ঠিক ঠিক। এবাবে শোনো

জীবদেহে শুক্ররূপে
এ ব্রহ্মাণ্ড আছে ব্যেপে
কৃষ্ণ তারে কয়।
পুরুষ যেই হয় সেই রাধার গতি ॥

এ কি তত্ত্ব ? কৃষ্ণ যদি হয় বিন্দু তবে তাকে ধারণ করে আছে যে পুরুষ দেহ সেই রাধা ৷ অন্তর্কৃষ্ণ বহির্রাধার তাহলে এমন ব্যাখ্যাও হতে পারে ? আমি বাউল গোঁসাইয়ের দুহাত জড়িয়ে ধরে বলি, 'বলুন বলুন, আর একটু বলুন। গানের বাকিটুকু।'

কিন্তু হঠাৎ দারুণ হৈচৈ চারধারে। দৌড়াদৌড়ি। শতশত লোক চারদিকে উথাল পাথাল। ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লোকাল দেখা দিয়েছে দু ঘণ্টা লেটে। উঠে দাঁড়িয়ে আমার ছলছল চোখের দিকে চেয়ে বাউল বললে, 'তোমার একটু দেরি আছে। তবে জানতে পারবে তাঁকে।'

চৈতন্যকে বোঝার একটা সোজা পথ তো ইতিহাসে, শাস্ত্রে, জীবনীগ্রন্থে ধরা আছে। আর একটা পথ গোপ্য ও নির্জন। সে-পথ একবার আমাকে অনেক দূর এগিয়ে দেয় আবার উলটো টানে গভীর রহস্যে ফেলে সরে দাঁড়ায়। আমার মনে

তাই কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্ত আসে না যে চৈতন্য-কে আমি কোন দিক থেকে বুঝবো। তাঁকে কি ভাববো একজন ঐতিহাসিক যুগপুরুষ, ধর্মনেতা ও সমাজত্রাতা ব্যক্তিরূপে? না কি ভাববো গভীর নির্জন পথের এক আলোকচেতনার উপলব্ধি রূপে? এ দ্বৈধ থেকে আরেকটা প্রশ্ন জাগে। উচ্চবর্গের বৈষ্ণব সমাজ যাকে অধিনেতা ভাবে, মনে করে অবতার ও পূজ্য, এমন কি গড়ে মূর্তি ও পূজাপদ্ধতি; নিম্নবর্গের মানুষ কেন তাকে মানতে চায় অমূর্ত আচরণে, গোপন সাধনে? এরমধ্যেই কি রেখায়িত হ'য়ে আছে কোনো অভিমানী প্রতিবাদের অনচ্ছ সমাজচিত্র? কোনো অধিকার বিচ্যুতির গহন দুঃখ থেকে কি তারা চৈতন্যকে গোপন করলো ব্যক্তি থেকে ভাবে?

এইসব সূত্র চৈতন্য সমকাল ও তাঁর প্রয়াণ পরবর্তী বৈষ্ণবমণ্ডলীর ইতিহাসে খোঁজকরা উচিত। আসলে চৈতন্য থেকেই বাংলা সমাজে একধরণের ভাঙনের শুরু। কিসের ভাঙন? ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তথা বৈদিক সংস্কৃতির ভাঙন। তার মানে, জাতিবর্ণ শাস্ত্র সামন্ত সমাজের ভাঙন। এক দিকে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের সমাজনেতৃত্ব আরেক দিকে মুসলমান রাজতন্ত্র আর তার মাঝখানে ছিল চৈতন্যের বৈষ্ণব সমাজের স্বপ্ন ও আহ্বান। লড়াইটা ছিল অসম কিন্তু আদর্শ ছিল মানবিক। সব মানুষ সমান, শুধু হরি বললেই মুক্তি, বৈষ্ণবকে হতে হবে অতিসহিষ্ণু দীনাতিদীন—চৈতন্য তো এই তিনটে সার কথা বলেছিলেন তাঁর ধর্ম-আন্দোলনে। কথাগুলি শুনতে চমৎকার, ভাবতেও ভালো কিন্তু আচরণে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তাঁর এই নতুন ভাবনার সঙ্গে ছিল ভক্তি ও সাহস আর অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেহের দীপ্তি। সেই ব্যক্তিত্বের টানে কত লোক ভক্তিতে ভালোবাসায় আবার আত্মরক্ষা বা প্রতিবাদে ছুটে এলো তাঁর পাশে, নিলো শরণ। এখানে মনে রাখতে হবে চৈতন্য ব্রাহ্মণ ব'লেই তাঁর বাণীগুলি মানিয়ে গেল, হ'লো সকলের গ্রহণীয়, সবাই তাঁকে মানলো। তিনি নীচুজাতির মানুষ হ'লে ধর্মভেদ, মন্ত্রমূর্তি ও শাস্ত্রাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ কি সেকালে মানাতো বা তাঁকে সবাই অমন করে মানতো? এইখানেই চৈতন্য আন্দোলনের দুটো ফাঁক রয়ে গেল। তিনি ব্রাহ্মণ বলেই স্বাভাবিক নেতৃত্ব পেলেন, তাঁকে তা অর্জন করতে হ'লো না এবং এই ব্রাহ্মণত্বের রন্ধ্রপথেই ভবিষ্যৎ বৈষ্ণব-সমাজের পতনের বীজ পোঁতা রইলো। তাঁর প্রয়াণের একশো বছরের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব' অংশ হটিয়ে দিলো ব্রাত্য ও জাত-বৈষ্ণবদের মূল স্রোত থেকে। নবদ্বীপের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠলো বৃন্দাবন। যাঁরা হ'টে গেলেন তাঁরা তো চৈতন্যকে ভালবাসতেন তাই বৈষ্ণবতার উচ্চবর্গে স্থান না পেয়ে গড়ে নিলেন আরেকধরণের বৈষ্ণবতা। এখান থেকেই চৈতন্যকে ঘিরে গৌণধর্মগুলির

উদভাবনেব বীজ খুঁজতে হবে। এই পবাজয ও প্রত্যাখ্যান থেকেই তাঁদেব গোপনতাব সাধনা। চৈতন্যকে ব্যক্তিরূপে না ভেবে সংকেতেব মধ্যে বোঝাব সূচনা এইভাবেই।

ইতিহাস আবেকটা কথাও বলে। চৈতন্য তাঁব ধর্মআন্দোলনেব প্রথম পর্যাযে মুসলমান বাজশক্তিব কাছ থেকে যতটুকু প্রতিবোধ পেযেছিলেন তাব শতগুণ প্রতিবোধ এসেছিল সমকালীন ব্রাহ্মণ সমাজ ও হিন্দু সমাজপতিদেব কাছ থেকে। তাঁব সমকালে স্মার্ত বঘুনন্দন ব্রাহ্মণ্যবাদেব প্রচুব নিযমকানুন তৈবি কবেন এবং তাঁব সহপাঠী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (শোনা যায ইনিই কালীমূর্তি ও কালীপূজাব প্রবক্তা) গড়ে তোলেন বহুতব শাক্ততান্ত্রিক তামসিকতা। এখানেই শেষ নয। শেষপর্যন্ত চৈতন্যকে নবদ্বীপ ত্যাগ কবতে হয কেন এবং কেন তিনি তাঁব জীবনেব শেষ আঠাবো বছবে গৌড়বঙ্গেই প্রবেশ কবেন নি তাব সদুত্তব কে দেবে? একটা উত্তব অবশ্য লোকগীতিকাবদেব বচনায কৌশলে গাঁথা আছে। সেখানে বলা হযেছে

মহাপ্রভুব বিজযেব কালে
যত দেশেব বিটলে বামুন
তাবে পাগল আখ্যা দিলে।
মানুষ অবতাব গোঁসাই
সাত্ত্বিক শবীবে উদয
দেখে তাই পামব সবাই
ভির্মি বোগ বলে॥

তাহ'লে প্রথমে পাগল, তাবপবে ভির্মিবোগী বলে তাঁকে অবজ্ঞা কবা হযেছিলো। কিন্তু তাতেও যখন মহাপ্রভুব বিজয অভিযান ঠেকানো গেল না তখন কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণবা কি কবলেন?

যখন দেখে মিথ্যা কিছু নয
বৈষ্ণব এক গোত্রসৃষ্টি পায
দেশেব বামুন মিলে সবাই
শাস্ত্রব টীকা লিখে নিলে॥

এই হলো চিবকালেব বাঙালী ব্রাহ্মণ্যসমাজেব কৌশল। মনে পড়া উচিত যে, চৈতন্যজন্মেব অনেক আগে তুর্কী আক্রমণেব মুখে, অত্যাচাবেব ভযে অনেক ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণেব মানুষ আশ্রয নিযেছিলেন বর্ধিষ্ণু জনপদ থেকে বহু দূবেব অনুন্নত প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে অনার্য সমাজ কাঠামোব এক কুসংস্কাবান্ধ জনমণ্ডলী পূজা কবতো তাদেব কৌম দেবদেবী চাণ্ডী, মনসা, ধর্ম বা

অন্যকিছুকে। যাদের কোনো Anthropomorphic গঠন ছিল না, যাদের তারা খুঁজে নিয়েছিল পাথুরে নুড়ি বা সিজবৃক্ষে এবং এমনকি বন্য জন্তু ও সাপে। তাদের বানানো অপদেবতাদের রুদ্রকাহিনী ও প্রতিহিংসাপ্রখর ভয়ংকরতা নিয়ে তারা মুখ মুখে বানিয়েছিল মেয়েলি ব্রতকথা। ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চবর্ণযুক্ত নবাগত শিষ্টসমাজ অচিরে হিন্দু পুরাণের সঙ্গে কল্পনা কৌশলে ব্রতকথাগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি করে নিলেন মঙ্গলকাব্য। এইভাবে মুখে-মুখে চলা গ্রাম্য ব্রতকথা পেয়ে গেল মার্জিত সাহিত্যের উচ্চ সম্মান। কথক ঠাকুররা সেই মঙ্গলগান গাইতে লাগলেন গ্রামে-গ্রামান্তরে। জীবিকার একটা পথও খুলে গেল। কেন না আসর বসতো এক মঙ্গলবার থেকে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত। এইভাবেই অনার্যসমাজের কাঁধে হাত রেখে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা (দু'দলই উপবীতধারী) পেয়ে গেলেন সম্মান ও সম্ভ্রম। অন্ত্যজরাও খুশি হলো। কেন না তাদের কাহিনী পেল মান্যতা। তারা তো উঁচু হলো। এইভাবে সাপের দেবী মনসা হলেন শিবের কন্যা, আদিবাসী চাণ্ডী হলেন দুর্গার প্রতীক চণ্ডী। অচ্ছুৎ অশ্রুত ব্রাত্যকাহিনী পেল অভিজাত বর্গের স্বীকৃতি। ব্রাহ্মণ্যকরণ সম্পূর্ণ হলো।

শ্রী চৈতন্যের বেলাতেও ঠিক এমনই হলো। ব্রাহ্মণরা যখন দেখলো চৈতন্যের বিপুল প্রভাব, বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক গ্রহণীয়তা, যখন সমাজের বণিক সম্প্রদায় ও বৈশ্যশূদ্ররা তাঁকে মানতে লাগলো, তখন ব্রাহ্মণ সমাজ চৈতন্যকে নিয়ে লিখতে লাগলো শাস্ত্রটীকা-ভাষ্যজীবনী। হিসেব নিলে দেখা যাবে এখন পর্যন্ত যত বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ টীকা ও পদ সংকলন হয়েছে তার পনেরো আনাই ব্রাহ্মণপ্রণীত। অবশ্য তাঁরা হিন্দু ব্রাহ্মণ নন তখন আর। 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে এরকম পরিষ্কার নির্দেশ ছিল যে কোনো ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব-দীক্ষা নিতে গেলে নিতে হবে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের কাছে। শূদ্র বৈষ্ণবের অধিকার নেই ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের। নরহরি, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এ নিযম মানেননি। অবশ্যই তাঁরা বিরল ব্যতিক্রম। একথা ঐতিহাসিক সত্য, বাংলা ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবতার মূল ধারা ছিল ব্রাহ্মণমুখী। চৈতন্য নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রধান দুই সহকারী অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর মধ্যে রূপ-সনাতন জীব রঘুনাথ ও গোপালভট্ট এই পাঁচজনই ছিলেন ব্রাহ্মণ। চৈতন্যপরবর্তীকালের নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণব জাহ্নবীদেবী, রামচন্দ্র ও বীরভদ্র ছিলেন ব্রাহ্মণ। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণবধর্মের বাঙালী তাত্ত্বিক শ্রীনিবাস আচার্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নরহরি চক্রবর্তী ও রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মণ।

সহকর্মী এক অধ্যাপক বন্ধু বললেন, 'বৈষ্ণব আন্দোলন আসলে এক

ফ্র্যাগমেন্‌টেসনের ইতিহাস। চৈতন্য যতই জাতিবর্ণভেদ ঘোচাতে চান, এক নিত্যানন্দ , নরোত্তম আর শ্যামানন্দ ছাড়া আর কেউ ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। বিমান বিহারী মজুমদার জানিয়েছেন শ্রী চৈতন্যের ৪৯০ জন প্রত্যক্ষ শিষ্যের মধ্যে ২৩৯ জন ছিল ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন বৈদ্য, ২৯ জন কায়স্থ, ২ জন মুসলমান, ১৬ জন স্ত্রীলোক আর ১১৭ জন শূদ্র। আরেকটা কথা বিচার্য যে চৈতন্য সমকালে ও পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে অর্থাৎ ব্রজ মণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে কোন সংহতির সম্পর্কও ছিল না। ফলে যে যার মত কাজ করে গেছেন। জাতিভেদ প্রথা বিলোপের ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা নির্দেশও ছিল না।'

আমি বললাম, 'নিত্যানন্দ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?'

: নিত্যানন্দ ছিলেন উদার প্রকৃতির জীবনরসিক। সাজ গোজ ভালো বাসতেন। ভালোবাসতেন সোরগোল, হৈ চৈ। একটু তান্ত্রিক ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল। জীবনরসে ভরপুর। জাতিবর্ণ চেতনা একেবারে ছিল না। চৈতন্য পুরী থেকে নিত্যানন্দ আর অদ্বৈতকে বলে দেন গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার করতে। আর রূপ-সনাতনকে বলেন বৃন্দাবনে গিয়ে শাস্ত্রটীকা রচনা করতে। দুটোর মধ্যে প্রথম থেকে সমন্বয় ছিল না। এর ফলে খুব খারাপ হয়েছে। যাই হোক নিত্যানন্দের কথা হচ্ছিল। খুব বড় ব্যক্তিত্ব। 'প্রেম বিলাস' পড়লে দেখবেন বৃদ্ধ বয়সে অদ্বৈত ভক্তির চেয়ে জ্ঞানমার্গের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন, ফলে প্রচার আর বৈষ্ণবীয় দীক্ষার দিকটা বেশি নেন নিত্যানন্দ। সারা দেশ কাঁপিয়ে দেন। বৌদ্ধ বিকৃত কামাচারী বারো শো নেড়া আর তেরোশো নেড়ীকে নিত্যানন্দই গৌরমন্ত্র দিয়ে জাতে তোলেন।* তাঁর দৃপ্ত ও দর্পিত ঘোষণা ছিল :

নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরো।
আচণ্ডাল আমি যদি বৈষ্ণব না করোঁ ॥
জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিয়া সভে নাচামু কীর্তনে ॥

নিত্যানন্দের এই সমদর্শী উদার নীতি উচ্চবর্ণের এবং বিশেষত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উচ্চবর্গের ভাল না লাগারই কথা। তাঁর নিজের শিষ্য বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে,

---

* মতান্তরে বীরভদ্র।

দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস ॥

এবং এমন কি বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে এতদূর বিদ্বিষ্ট ছিলেন যে, "নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়"। তাহলে ?'

আমি বললাম, 'ঐ জন্যেই নিত্যানন্দের প্রয়াণের পর তাঁর স্ত্রী জাহ্নবা দেবী আর ছেলে বীরভদ্র পরবর্তী কালে বৃন্দাবন গিয়ে সেখানকার গোস্বামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও নির্দেশ নেন। তার মানে নিত্যানন্দের গণআন্দোলন আবার পড়লো গিয়ে উচ্চবর্ণের খপ্পরে।'

অধ্যাপক বন্ধু তাঁর আলমারি থেকে ননীগোপাল গোস্বামীর লেখা 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বইখানা নিয়ে পড়ে শোনালেন :

> শ্রী চৈতন্য যতদিন বর্তমান ছিলেন ততদিন বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর নেতৃত্বের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক বছরের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া পরস্পর বিবদমান কতকগুলি উপশাখার সৃষ্টি হইল—গৌরনাগরবাদিগণ, অদ্বৈত সম্প্রদায়, গদাধর সম্প্রদায় ও নিত্যানন্দ বিদ্বেষী সম্প্রদায়।... যিনি যেভাবে পারিলেন নেতা হইয়া বসিলেন। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ যখন বিপর্যস্ত, তখন সেখানে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল 'গুরুবাদের' প্রবর্তনে।

আমি বললাম, 'এই গুরুর হাতেই রইলো দীক্ষাশিক্ষার ভার, তাই গুরুছাড়া গৌরভজন হ'লো অসাধ্য। ভক্ত আর গৌরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন গুরু। এদিনে বৈষ্ণব-আচারের বই "হরিভক্তি বিলাস" স্পষ্টই ব্রাহ্মণের স্বার্থ দেখলো বড় করে। ব্রাহ্মণ মানে 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব'। হরিভক্তি বিলাস মেনে নিলো সমাজের বর্ণভিত্তি, ব্রাহ্মণের শীর্ষভূমিকা। এই শাস্ত্র শূদ্রদের বিরুদ্ধাচরণ করলো, শূদ্রদের কাছ থেকে কোনো দান গ্রহণে দিলো নিষেধাজ্ঞা এমনকি চণ্ডালকে দেখলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলো। ফতোয়া জারি করলো যে, ব্রাহ্মণ গুরু শ্রেষ্ঠ এবং সববর্ণের মানুষকে দীক্ষা দিতে পারে ব্রাহ্মণ। অবশ্য বলা হলো শূদ্রও দীক্ষা দিতে পারে তবে স্ববর্ণে বা আরো নিচের বর্ণস্তরে কিন্তু কখনই ব্রাহ্মণকে নয়।'

বন্ধু বললেন, 'ঐ জন্যেই নিম্নবর্ণের মানুষ চলে গেল সহজিয়া লাইনে। নিম্নবর্ণে তো সংস্কৃতে লেখা 'হরিভক্তিবিলাস' চলতো না, ব্রাহ্মণরাও ছিল ওদের সম্পর্কে নিস্পৃহ। তাদের নজর ছিল মহন্তগিরির দিকে। আর এই সুযোগে অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত এমনকি বিকৃত বুদ্ধি অনেক মানুষ শূদ্রদের গুরু সেজে

বসলো। ওরা তাদের মত ব্যাখ্যা করলো পরকীয়াবাদের, মঞ্জরী সাধনার, চৈতন্যের গুহ্যসাধনার। কে সে সব দেখতে গেছে তখন ? এইখানে রমাকান্ত চক্রবর্তীর বক্তব্য শুনুন। Society and change পত্রিকার প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা থেকে আমি পড়ছি :

> Non-Brahmana Vaisnava gurus sought new in rural and tribal areas whentheyfreely preached their own versions of the legends of Radha Krishna and Caitanya. Most of these versions were deeply with sex and fundamentally different from the orthodox Vaisnava concepts which had been couched in Sanskrit and which were, therefore, in comprehensible to the common people.'

এই মন্তব্য শুনেই আবার মনে পড়ে গেল গোরাডাঙ্গা গ্রামেব মযহারুল খাঁ-ব কথা। মানুষটা ষাট বছর বয়সী তাত্ত্বিক ফকির। নিজে পদও লেখেন। উনি আমাকে একবার বলেছিলেন চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ড পড়তে, সেখানে না কি লেখা আছে চৈতন্য নয় নিত্যানন্দই আসল। খুঁজে খুঁজে জায়গাটা বাব করলাম। পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতকে মহাপ্রভু বলেছিলেন,

রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করাবেন আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥
আমার সফল কর্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥

এর পরে যখন মযহারুল ফকিরের কাছে আবার গেলাম তখন জানতে চাইলেন চৈতন্য ভাগবতের সেই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি কিনা। যেই ঘাড় নাড়লাম অমনি ফকির বললেন, 'বলুন তো নিত্যানন্দ-দ্বার মানে কি ? বলতে পারলেন না তো ? ওর মানে স্ত্রী লোকের যোনি। গৌরাঙ্গ ঠারে ঠোরে বলে গেছেন চৈতন্যতত্ত্বের মূল বুঝতে গেলে নিত্যানন্দ-দ্বারে যেতে হবে।'

ঘরে হঠাৎ বাজ পড়লেও এতটা চমকাতাম না, সেদিন যা চমক লেগেছিল। ব্যাখ্যার চকিত অভিনবত্বে শুদ্ধ শাস্ত্র কীভাবে উল্‌টে দেওয়া যায় তার চরম নমুনা বোধহয় মযহারুল দিলেন। কিন্তু এতো তাঁর নিজের উদ্‌ভাবন নয়, কথাটা মুখে মুখে গোপনে চলছে বাউল ফকিরদের ভেতর ভেতর কয়েক শতক নিঃসন্দেহে। শাস্ত্রকে দুভাবে ব্যাখ্যা যে কতরকম স্তরে হতে পারে তার নানা রোমাঞ্চকর নমুনা

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে **এদিকটা** অনুধাবন করা হয় নি। কিন্তু বিশেষভাবে বলবার কথা হলো ময্‌হারুল ফকির বা তাঁর পূর্ব পূর্ব লোকায়ত গুরু কয়েক শতক ধরে 'নিত্যানন্দ-দ্বার' বলতে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বেশ অনেক দূর পর্যন্ত চারিয়ে গেছে। এসব শুনে অনেকে বিরক্ত হবেন, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মনে খুব আঘাত পাবেন, কিন্তু লোকায়ত বিশ্বাসকে তো টলানো যাবে না। লৌকিক গুরু বৈরাগী উদাসীনরা এমন অনেক কথা বৈধী ধারার সমান্তরালে চিরকাল বলে গেছেন যাচ্ছেন এবং যাবেন।

আসলে জট পাকিয়ে আছে চারশো বছর আগে থেকে। চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর- শ্রীবাস পর্বের পর বাংলার বৈষ্ণবধর্ম যে বিচ্ছিন্নতা ও শীর্ণতার মধ্যে আত্মকুণ্ঠ হয়ে পড়ে তার থেকে তাকে বাঁচাতে বৃন্দাবন থেকে শ্রীজীব গোস্বামীর দীক্ষিত-শিক্ষিত নরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ এবং পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নরহরি ও রাধামোহন যতই চেষ্টা করুন তবু বৈষ্ণবধর্মের পতন ও বিচ্ছিন্নতা রোখা যায় নি। খেতুরিতে মহাসম্মেলন ডেকে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে নরোত্তম বাংলার সব বৈষ্ণব নেতাকে এক জায়গায় বসিয়ে সমন্বয়ের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু হরিভক্তিবিলাসের কাঠিন্য, শুদ্ধিকরণ আর ব্রাহ্মণত্বের নেতৃত্ব কি ঠেকাতে পারে কোনো স্ফূর্ত বৈষ্ণব গণশক্তিকে? মহাসম্মেলনে সেই মানুষগুলোকে ডাকা হলো কই যারা অবহেলিত মানহারা? 'জাত বৈষ্ণব' নাম দিয়ে তাদের কি কেবলই ঠেলে দেওয়া হয় নি ভ্রষ্টবুদ্ধি মূর্খ গুরুদের হাতে? আর সেই সুযোগে প্রকৃতি-সাধনার এক জীবনস্পন্দী আহ্বানে সহজিয়া আর বাউল ফকিররা কি কেবলই অশিক্ষিত নিম্নবর্গের অনেককে টেনে নেয় নি রসের পথে? এইভাবেই ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীচৈতন্য হয়ে যান গোপ্য সাধনার এক স্তরান্বিত সংকেত। নিত্যানন্দ হয়ে যান দেহ কেন্দ্রিক যৌনসাধনার এক গূঢ় ইঙ্গিত। কৃষ্ণ আর রাধাকে তত্ত্বরূপে 'আরোপ' করা হয় মানুষ-মানুষীর শরীরী মিলনে। অন্য দিকে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা ব্যস্ত থাকেন কৃষ্ণরাধা আর গৌরাঙ্গকে দারুভূত বা প্রস্তরীভূত মূর্তি করে মঠে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিতে। গ'ড়ে তোলেন তাঁরা পূজা ও বিধান, শাস্ত্র ও পদাবলী। সব কিছুকে ঐশী ও অপ্রাকৃত বিশেষণ দিয়ে প্রবহমান জীবনের উলটো মুখে নিশ্চিন্তে বসতে চান তাঁরা। 'চৈতন্যের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা' তো সত্যিই এক ট্র্যাজিক উচ্চারণ।

এখানে অবশ্য বলে নেওয়া উচিত যে চৈতন্যকে এই গৌড়বাংলাতেই অবতার বলে, পরমতত্ত্ব বলে প্রতিষ্ঠা করাও খুব সহজ হয় নি। কেননা বৃন্দাবনের বৈষ্ণবরা কখনই কৃষ্ণতত্ত্বের বাইরে স্বতন্ত্র চৈতন্যতত্ত্বকে মানেন নি। তাঁরা মনে করতেন চৈতন্য 'উপায়' এবং কৃষ্ণ 'উপেয়'। অন্য দিকে গৌড়ীয়

বৈষ্ণবকুল চাইছিলেন গৌর পারম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে। এদিকে বাংলাতেই একদল বৈষ্ণব গৌর-নিতাই বিগ্রহ গ'ড়ে মন্দিরে বসালেন, আরেকদল বসালেন গৌরগদাধর মূর্তি, খিতুরী মহোৎসবের পর নরোত্তম চালু করলেন গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল মূর্তি এটা চাননি বৃন্দাবনের গোঁসাইরা। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবাদেবীর পালিত পুত্র রামচন্দ্র গোঁসাই বাঘনাপাড়ায় যে শ্রীপাট গড়েন সেখানে সহজিয়া বৈষ্ণব ভাবনার বেশ কিছু স্ফুরণ ঘটে এ কথা সত্য। চৈতন্যকে পরমতত্ত্ব রূপে প্রতিষ্ঠায় দেশের রাজশক্তির পক্ষ থেকেও বাধা আসে। আঠারো শতকে ব্রাহ্মণ সমাজপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে নবদ্বীপে 'শ্রীগৌর' মূর্তিকে ছয় মাস যাবৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখা হয়েছিল।** নদীয়া রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ১৮৭৫ সালে স্পষ্ট ভাষায় লিখে গেছেন :

> ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধিকার প্রায়ই শাক্ত ও অত্যল্পাংশ বৈষ্ণব, এবং শূদ্রবর্ণের অধিকাংশ বৈষ্ণব ও কিয়দংশ শাক্ত ছিল। রাজারা শাক্ত কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন।*

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের এই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে শূদ্রবর্ণের অধিকাংশ বৈষ্ণব ছিল। অর্থাৎ সহজিয়া বৈষ্ণব ও জাত-বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ অংশের মূল ভাগ ঝুঁকে পড়েছিল শাক্ততন্ত্রে। হতমান, সম্পত্তিহীন (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে) জমিদার ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গ তখন কৃষ্ণের প্রতি দীন ভক্তি প্রদর্শনের চেয়ে শক্তিময়ী কালীর কাছে শরণ ও পঞ্চ ম-কারে বেশি আস্থা দেখাবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে রাজন্য বণিক ও জমিদাররা বৈষ্ণবধর্মকে একবার নতুন ক'রে জাগাতে চেয়েছিলেন। সেই ইতিহাস জেনে নেওয়া উচিত।

সপ্তদশ শতকে খেতুরিতে যে বৈষ্ণব মহাসম্মেলন হয় সেখানে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি ছিল বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের ব্যাপক প্রয়াস। বিষ্ণুপুর ও খেতুরি এই দুই কেন্দ্র থেকে ধর্মপ্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর ও খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে যুক্ত হন। ক্রমে এগিয়ে আসেন ময়ূরভঞ্জের রাজা, পঞ্চকোটের রাজা, পাইকপাড়ার রাজা। ঝাড়িখণ্ড-উড়িষ্যা অঞ্চলে শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দের চেষ্টায় এগিয়ে আসেন উড়িষ্যার অনেক রাজা ও রাজন্য। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণবীয়ানার একটা হুজুগ উঠলো। গঙ্গার এপারে বরাহনগর,

আড়িয়াদহ, পানিহাটি, সুখচর, খড়দহ, কাঞ্চনপল্লী ও কুমারহট্ট এবং ওপারে মাহেশ, আকনা, বিষখালি, জিরাট, গুপ্তিপাড়া, আদি সপ্তগ্রাম জেগে উঠলো নতুন বৈষ্ণব কেন্দ্ররূপে। বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম ছাড়াও কালনা, পূর্বস্থলী, পাটুলী, কাটোয়া, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, কুলাই, শ্রীখণ্ড, দক্ষিণখণ্ড, বীরভূমের ময়নাডাল ও মঙ্গলডিহি, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের অনেক জায়গায় তৈরি হলো বৈষ্ণবী বাতাবরণ। লেখা হতে লাগলো বহুতর বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ, মহান্তজীবনী, পদসংকলন, বৈষ্ণব শাখা নির্ণয় ও ব্রতদিন নির্ণয়ের বই। হরিভক্তি বিলাসের নিয়মে চললো চব্বিশ ঘণ্টার ভজনসাধন কীর্তন। বৈষ্ণব গুরু ও আচার্যরা কৌলিক পদবী ত্যাগ করে সবাই নিলেন গোস্বামী পদবী। গৃহী ও সন্ন্যাসী দু'রকমের বৈষ্ণবই সমাজে মান্যতা পেলেন।

ইতিমধ্যে সমাজবিবর্তনের লক্ষণ দুভাবে সূচিত হলো। অষ্টাদশ শতকে একদিকে জাগলো শাক্তধর্মের ও শাক্তগানের অভ্যুত্থান, আরেক দিকে শূদ্র সমাজে ঘটলো ব্যাপক সহজিয়া যোগাযোগ। সহজিয়া ধারা এদেশে নতুন নয়। বৌদ্ধ মহাযান মতের একটা স্রোত এবং তান্ত্রিক বামাচারের ধারা আগেই ছিল লোকায়ত জীবনে। বৈষ্ণব সহজিয়া এদের ভাবধারা ও ক্রিয়াকরণ অনেকটাই নিলেন। সুফী প্রভাব ও মারফতী প্রভাব ইসলাম ধর্মেও কিছুটা বিবর্তন আনলো। সত্য সংঘ, কর্তাভজা, সাহেবধনী, খুশি বিশ্বাসী এইসব হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়াত্মক গৌণ লোকধর্মগুলি জেগে উঠলো গ্রামে গ্রামে। হয়তো চৈতন্যকে আদর্শ করেই প্রবর্তক-কেন্দ্রিক নানা উপধর্ম রূপ নিলো। সবচেয়ে আশ্চর্য যে, সহজিয়া বৈষ্ণব নানা উপশাখা তাদের প্রবক্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা রূপে ব্যবহার করতে লাগলো বিখ্যাত বৈষ্ণবগুরুদের নাম। নিত্যানন্দ-বীরভদ্র-নরোত্তম-কৃষ্ণদাস কবিরাজ- রূপ কবিরাজ—এইসব মহানব্যক্তির নাম তাদের মূলধারায় জড়িয়ে নিলো। এইভাবেই কি তারা চাইলো তাদের শাস্ত্রছুট প্রকৃতিসাধনায় একরকমের বৈধতা আনতে ? প্রতিবাদের গভীরে রাখতে চাইলো একরকমের সহকারিতাও ?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক কালে ছিলেন সন্ন্যাসী অথচ এখন গৃহী এমন একজন হলেন সুকান্ত মজুমদার। মঠে মন্দিরে অন্তত পনেরো বছর কাটিয়েছেন, শাস্ত্র পড়েছেন, নিয়েছেন গৈরিক বাস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছেড়ে এসেছেন সেই পথ। তবে আচরণ তো রক্তে মেশা। বৈষ্ণব বিনয় ও নিরভিমান স্বভাব সুকান্তবাবুর মধ্যে মজ্জাগত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যাই তাঁর কাছে খটকা ঘোচাতে। সেদিন কথায় কথায় এমনই এক জিজ্ঞাসায় তাঁকে

বললাম 'বাংলায সহজিযা বাদেব উৎস ও প্রসাব সম্বন্ধে কিছু বলুন। গোঁড়া বৈষ্ণবদেব প্রতিক্রিযাতেই তাব ব্যাপকতা ?'

প্রথমে 'আমি কি জানি বলুন', 'কতটুকুই বা পড়াশুনা কবেছি' এইসব গৌবচন্দ্রিকা ক'বে সুকান্ত বললেন, 'আসলে সহজিযাদেব সূচনা মহাপ্রভুবও আগে। চণ্ডীদাসেব পদে পাবেন অনেক ইঙ্গিত। গৌড়বঙ্গে কৃষ্ণ ধামালীব একটা লৌকিক গল্প চালু ছিল, কৃষ্ণ বাধা আযান ঘোষ আব বড়াই বুড়িকে নিযে। অবৈধ প্রেমেব দেহকেন্দ্রিক গল্প। জানেন তো ভাগবতে বাধাব নাম কোথাও নেই ? জযদেব লৌকিক কাঠামো থেকেই বাধাকে তৈবি কবেন। বড়ু চণ্ডীদাস সেই কৃষ্ণবাধাব গল্পে কামনা আকুলতা ছলনা আব বিবহ বুনে তাকে জনপ্রিয কবে দেন। সহজিযাবা এই গল্প ও গান খুব পছন্দ কবতো। এবপবে বৌদ্ধ সহজিযা, তান্ত্রিক ক্রিযা কলাপ ধীবে ধীবে তাদেব মধ্যে কিছু এসে যায। এসব ছিল খুব গোপন।'

কিন্তু সহজিযাবা কি তখন ধর্মসম্প্রদায ছিল এখনকাব মত ?'

মনে হয না। ওটা ছিল গোপন আচবণ, সমাজেব খুব অন্ত্যজবর্গে। কিন্তু মহাপ্রভুব পবে যাবা সহজিযা ব'লে ফুটে বেবোলো তাবা কিন্তু বেশ সংগঠিত ও সচেতন। আসলে গৌড়ীয বৈষ্ণবদেব গোঁড়ামি, বৃন্দাবনেব সংস্কৃতি অনেক শূদ্রেব পক্ষে সহ্য হয নি। তাবা প্রতিবাদ খুঁজছিলো। শ্রীখণ্ডেব নবহবি সবকাবেব 'গৌবনাগব সাধনা', নবদ্বীপেব 'মঞ্জবী সাধনা আব পবকীযাবাদেব অন্য ব্যাখ্যা থেকে সহজিযা বৈষ্ণববা জেগে ওঠে। শ্রী চৈতন্যেব গুহ্যসাধনাকে সামনে বেখে দেহ-কড়চা নামে অজস্র পুঁথি লেখা হয। সে সবই কি শূদ্রেব লেখা বলতে চান ? উচ্চবর্ণেব লোকেবাও ভেতবে ভেতবে সহজিযাদেব মদত দেয নি কি আব ? তবে পবে ঐ নবদ্বীপ শান্তিপুব খড়দহ শ্রীখণ্ড এইসব জাযগাতেই কেবল খাঁটি গৌড়ীয বৈষ্ণববা ঘাঁটি গাড়ে, সহজেবা ছড়িযে যায গ্রামে গ্রামে আখড়ায আখড়ায। বিকৃতিও আসে তাদেব মধ্যে। তাবপবে গড়ে ওঠে নানা বৈষ্ণব উপসম্প্রদায।

কিন্তু ঠিক কোন সমযে এই সব উপসম্প্রদায মাথা চাড়া দেয বলুন তো ?

একেবাবে আঠাবো শতকেব শেষার্ধে। সেটা বোঝাতে গেলে আপনাকে সিদ্ধ বৈষ্ণব তোতাবাম বাবাজীব ঘটনা বলতে হয। শুনবেন ?

'অবশ্যই শুনবো। এসব বলবাব মত যোগ্য লোক তো আপনিই' আমি

বললাম।

বিনত মুখে সুকান্ত শুনলেন আত্মপ্রশংসা। তারপর খানিক ভেবে নিয়ে বললেন, 'শ্রীনিবাস আচার্যের বংশের সন্তান রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন আঠারো শতকের মানুষ। ১৭৮১ সালে তাঁর দেহান্তর ঘটে। বলতে পারেন রাধামোহনই বাংলার শেষ বৈষ্ণব ইনটেলেকচুয়াল। একবার বৃন্দাবনে দুজন বৈষ্ণবের মধ্যে স্বকীয়া আর পরকীয়াবাদ নিয়ে বিতর্ক হয়। কোন পথ সঠিক ? জয়পুরের রাজসভার বিচারে স্বকীয়া মত জেতে। তাতে প্রতিপক্ষ খুশি না হ'য়ে গৌড়ের পণ্ডিতদের মতামত দাবী করেন। জয়পুবের রাজা তখন তাঁর সভাসদ ও স্বকীয়াপন্থী কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যকে বাংলায় পাঠান। নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর দরবারে বিচার বিতর্ক হয়। রাধামোহনের কাছে তর্কে হেরে কৃষ্ণদেব অজয়-পত্র লিখে দেন। ব্যাস, সেই থেকে বাংলায় পরকীয়া মত চেপে বসলো। এখানে একটি কথা বলি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পরকীয়াবাদ এক শুদ্ধ নিষ্কাম conception। সহজিয়ারা কিন্তু সে conception নেয় নি। তারা পরকীয়া বলতে বুঝলো ও বোঝালো, অবিবাহিতা সাধনসঙ্গিনী। ক্রমে কিশোরীভজন এবং পরস্ত্রীগমন হ'লো পরকীয়া সাধনার পক্ষে প্রশস্ত।'

আমি বললাম, 'এই পরকীয়াবাদের সমর্থনে তারা পয়ার বানালো না ?'

সুকান্ত বললেন, 'অবশ্যই। জানেন না গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কথায় কথায় যেমন বৃন্দাবনী সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়, সহুজেরা তেমনই পয়ার ওগড়ায়। পরকীয়ার পক্ষে পয়ার শুনবেন ?

স্বকীয়াতে বেগ নাই সদাই মিলন।
পরকীয়া দুঃখসুখ করিল ঘটন ॥

এবারে যুক্তিটা শুনুন। গৌরাঙ্গকে বুঝতে পরকীয়া সঙ্গিনী কেন ? স্বকীয়ার ত্রুটি কোথায় ? জবাব হলো, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সত্যভামা-রুক্মিণী-কুব্জা এইসব স্বকীয়া থাকতেও তিনি কেন রাধা প্রেমকে আশ্রয় করলেন ? বিশ্লেষণে বলা হলো, স্বকীয়া প্রেমধর্মে বাধাবন্ধ নেই, সমাজের অনুশাসন নেই, তাই ওতে বেগ নেই। পরকীয়ায় আছে দুঃখকষ্ট ভোগের রোমাঞ্চ। উৎকণ্ঠা থেকে মিলনে পৌঁছানোর জন্য দারুণ আত্মপীড়ন, কুলত্যাগের সাহস, সমাজের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করার শক্তি। প্রেমের সত্যিকারের গভীরতা তো এসবেই ফুটে ওঠে।'

: কিন্তু তোতারাম বাবাজির কথা কেন তুললেন ?

:ঐ পরকীয়াবাদ থেকেই তো সব বৈষ্ণব গৌণ সম্প্রদায়ের উদ্ভব। তারা দেখলো কৃষ্ণরাধা তত্ত্বের সঙ্গে তাদের পুরুষ প্রকৃতিবাদ বেশ খাপ খায়। কৃষ্ণ হলেন তাদের সাধনার 'বিষয়' আর রাধা হলেন 'আশ্রয়'।

চললো নির্বিচার 'আরোপ' সাধনা। তোতারাম বাবাজী এদের সম্পর্কে তাঁর অসহিষ্ণুতা জানান। তার থেকেই প্রথম তেরোটি উপসম্প্রদায়ের বিষয়ে খবর মেলে। দ্রাবিড় দেশের পণ্ডিত তোতারাম ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের মানুষ। ন্যায় পড়তে আসেন নবদ্বীপ। সেখান থেকে যান বৃন্দাবন। আবার নবদ্বীপে এসে আখড়াধারী বাবাজী হন। কিন্তু সহজে বৈষ্ণব আর অন্য গৌণধর্মীদের আচরণে ব্যথিত হ'য়ে ঘোষণা করেন :

আউল বাউল কর্তাভজা নেতা দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখীভাবুকী স্মার্ত জাত গোঁসাই ॥
অতিবড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে—এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি ॥

লক্ষ করতে হবে, যে-তেরোটি উপসম্প্রদায় সম্পর্কে এখানে বিরুদ্ধতার কথা বলা হয় তার মধ্যে আউল বাউল নেড়া সাঁই আর দরবেশীরা আদৌ বৈষ্ণব নয়। কিন্তু তোতারাম যে জাত গোঁসাই আব গৌরনাগরীদেরও অপাংক্তেয় করেছেন এখানেই বৈষ্ণব বিচ্ছিন্নতাবাদের খুব বড় প্রমাণ রয়ে গেছে। এই অসহিষ্ণুতা ও বিচ্ছিন্নতায় বৈষ্ণবরা আরও টুকরো হতে থাকে। এর পরের আরেক পয়ারে তার প্রমাণ। বলা হচ্ছে :

পূর্বকালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন তেরো বাড়লো এবে ধর্ম রাখা দায় ॥

এইভাবে বাহান্নটা উপসম্প্রদায় তো তখনই জন্মে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কোন ধর্ম রাখা দায় বলা হচ্ছে এখানে ?

আমি বললাম, 'কেন ? নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলা হচ্ছে। অবশ্য হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই তুলেছেন আপনি। মহাপ্রভু যে-উদার জাতিবর্ণহীন বৈষ্ণবতার স্বপ্ন দেখেন, নিত্যানন্দ যাকে রূপ দিতে চান, সে কি শেষ পর্যন্ত আচণ্ডাল জন সমাজের কল্যাণকামী ছিল আর কোনভাবেই ? তা কি রুদ্ধ হয়ে যায় নি সংস্কৃত শাস্ত্রবাণী আর গুরু মহান্তের ব্যাখ্যায় ? সেখানে সেই উচ্চ বৈষ্ণবদের গজদন্ত মিনারে সাধারণ মুমুক্ষু নীচু জাতের মানুষ আর কি করে আশ্রয় নেবে ? সহজিয়া বৈষ্ণব, জাত বৈষ্ণব আর নানা খণ্ডিত বৈষ্ণবইতো সংখ্যায় বাড়বে। ওদিকে সামাজিক স্মার্ত মত মেনে চলে যারা তারাই বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিক বিধি নিয়ে ক্রমে হয়ে উঠেছে এখনকার উন্নত বৈষ্ণব। তোতারাম যে স্মার্তদের অপাংক্তেয় মনে করেছেন এখন তো তারাই সবচেয়ে মান্য বৈষ্ণব। দেখুন ইতিহাসের কি অদ্ভুত কৌতুক। ঠিক এখন মানে এই সময়ে বৈষ্ণব কারা ? এক নম্বর, মঠ ও

আখড়াধারী ব্রহ্মচারী গোঁসাই। দু'নম্বর, এদের দ্বারা উপেক্ষিত জাত গোঁসাই এবং ঘৃণিত সহজিয়া বৈষ্ণব। তিন নম্বর, গৃহী বৈষ্ণব ভদ্রলোক, যাঁদের মন্ত্রদীক্ষা হয়, হরিনাম করেন যাঁরা অথচ মেনে চলেন হিন্দুসমাজের প্রচলিত স্মার্তমত। জন্ম মৃত্যু বিবাহে এঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে। এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কি সুকান্তবাবু, ঠিক বললাম ?'

'একেবারে ঠিক' সুকান্তবাবু সায় দেন এবং বলেন, 'চৈতন্যমহাপ্রভুকে সঠিক কেউ বুঝলো না তাহ'লে। কিন্তু দেহবাদী সহজিয়ারা তাদের সাধনায় যেসব কড়চা ও শাস্ত্রের দোহাই পাড়ে সেও খুব অদ্ভুত। তারা লিখেছে সেসব শাস্ত্র কড়চা নিজেরাই অথচ চালায় রূপ কবিরাজ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বীরভদ্র, নিত্যানন্দ এমন কি নরোত্তমের নামে। এমনও বলে যে রূপ কবিরাজ ছিলেন বীরভূমের লোক শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। পরকীয়াবাদের সমর্থন করেছিলেন বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অংশ থেকে বিতাড়িত হন। প্রতিবাদী বিতাড়িত মানুষটাই নাকি তাদের আদিগুরু। এই বলে গান গায় যে,

শ্রীরূপের পদে যাব নিষ্ঠা হলো
মানুষের করণ সেই সেধে গেল ॥
শ্রীরূপের চরণ সাধি
শ্রীরূপের পেল সিদ্ধি শাস্ত্রদেবতা দুষে গেল ॥'

আমি বললাম, 'এখানে তো শ্রীরূপের দুটো মানে রয়েছে। শ্রীরূপ মানে রূপ কবিরাজ, শ্রীরূপ মানে নারী। ঠিক তো ? কিন্তু লৌকিক স্তরে যে-গৌরাঙ্গতত্ত্ব খুব গোপনে চালু আছে আপনি তা জানেন ? আমি যতদূর বুঝেছি, পুরুষ দেহ রাধা আর তার মধ্যে মণিবিন্দু কৃষ্ণ। একাঙ্গে এটাই গৌরাঙ্গ। সেই গৌরাঙ্গের উপলব্ধি করতে লাগে নিত্যানন্দের দ্বার।'

সুকান্ত বললেন, 'এ যে ফরমুলার মত বলে গেলেন। না না অত সহজ নয়। মাঝখানে আপনার জানার একটু ফাঁক আছে। কৃষ্ণ রাধার আরেকটু জটিলতা আছে। সেটা আমিও জানি না। আচরণ ঘটিত সেটুকু। শুনেছি একমাত্র দরবেশী মতের কেউ কেউ সেটা জানে। আমি ঠিক ঠিক দরবেশী মতের লোক পাই নি। আপনি খোঁজে থাকুন।'

আমি ভাবলাম, আবার কোথায় খুঁজবো ? গৌরাঙ্গের মর্ম তবে কি আমার অজানাই থেকে যাবে ?

শেওড়াতলার আহাদের মাজারে অম্বুবাচীতে মচ্ছব হয় প্রতি বছর। সেবার সেখানে খুব আলোপ হলো বাদলাঙ্গীর খেজমৎ ফকিরের সঙ্গে। ফকির বললেন, 'আপনি তো চাপড়া থানার কাঁহা কাঁহা সব গৈ-গেরামে ঘুরেছেন কিন্তু কখনও

আমাদের বাদলাঙ্গী গাঁয়ে আপনাকে দেখিনি। একবার আসুন এবারে, হ্যাঁ, কার্তিক মাসের পুন্নিমে, ঐ দিন আমার গোঁসাইয়ের পারুণী। খুব বড় মচ্ছব হবে। বসবে শব্দ গানেব আসর। বাংলা দেশ থেকে বর্ডার পেরিয়ে অনেক আলেম দরবেশ ফকির আসবে। গান শুনবেন তাদের। খুব ভালো তত্ত্বের গান। আসবেন তো ?'

এসব ক্ষেত্রে ওই যেমন সায় দিতে হয় সেই রকম ঘাড় নেড়েছিলাম। পরে যথাবীতি ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের শহুবে ক্যালেণ্ডারে কার্তিক মাসেব পূর্ণিমা আর কোথায় ? কিন্তু খেজমৎ ভোলে নি। লাল কালিতে লিখে এক পোস্টকার্ড ঠিকই পাঠিয়েছে মচ্ছবের সাত দিন আগে। আরো আশ্চর্য, 'সুধীব চক্রবর্তী, প্রোপেসব কৃষ্ণনগব' এমন অসম্পূর্ণ ঠিকানা সত্ত্বেও সে চিঠি ডাক বিভাগ আমাকে পৌঁছেও দেয়। এব পব কি না গিয়ে চলে ?

বাসে যেতে যেতে অবশ্য ভাবছিলাম একটা গোলমেলে কথা। খেজমৎ ফকির যাব নাম, তাব গুরু কী করে হন পবমানন্দ গোঁসাই ? গুরুর প্রয়াণ দিবসেব স্মবণেই তো এই মচ্ছব। পৌঁছেই প্রথমে সেই কথা পাড়লাম। বসতে দিয়েছে খাতির ক'বে এক অসামান্য কারুকার্য খচিত কাঁথায়। কাঁথায় সুতোর ফোঁড়ে হাতি ঘোড়া পদ্ম শঙ্খ বোনা আর এক কোণে লেখা 'মযদানী বিবি বাদলাঙ্গী'। তারিফ কবতেই লাজুক মুখে খোদ ময়দানীবিবি হাতপাখা নিয়ে এসে সামনে বসে। খিজমৎ বলে, 'বাবুকে ভক্তি দাও'। ময়দানী গড হযে প্রণাম করে।

এও কম আশ্চর্য নয়। কোনো ফকিরেব বাড়িতে কখনও আমি প্রণাম পাই নি। আসলে প্রণাম ওরা করে না। আর প্রণাম না বলে 'ভক্তি দেওযা' এ জিনিস আমি ফরিদপুরের থেকে আসা নমঃশূদ্র সমাজ ছাড়া কখনও শুনিনি। অবাক হয়ে তাকাতেই খেজমৎ বলে, 'কি অবাক হলেন তো ? আমাদেব গোঁসাই যে ফরিদপুরের এড়াকান্দিব সিডিউলড্ কাস্ট ছিলেন। তাঁব কাছ থেকেই এসব শেখা। আমি জন্মে ফকির কর্মে নই। লিয়াকত ফকিরের ছেলে বলে লোকে আমাকে খেজমৎ ফকির বলে। অবশ্য ফকিরীতন্ত্রে অনেকটা রাস্তা আমি হেঁটেছি। তাবপরে বছর দশেক আগে হঠাৎ বেতাই-জিৎপুরে মতুয়াদের মেলায় আমার সদ্‌গুরু লাভ হলো। গোঁসাইয়ের আখড়া কুলগাছি। সেখানেই আমার দীক্ষাশিক্ষা। সহজিয়া মত আমাদের। নিত্যানন্দের ধারা।'

ধীরে ধীরে বিকেল শেষ হয়। একটু একটু হিমেল হাওয়া। গাঁয়ের লোক দুটো চারটে করে জমছে। খেজমৎ খুব ব্যস্ত, আহ্বান আপ্যায়নে। বাউল বৈরাগীরা এসে গেছে। দুটো একটা গান হচ্ছে। শিক্ষানবিশদের গান। বুঝলাম

ট্রেনিং চলছে। বাংলাদেশের দল এই এসে পড়বে আর কি। আমি এদিক ওদিক খানিক ঘুরিফিরি। উঠোনের একদিকে বিশাল কড়ায় খিচুরি পাক হচ্ছে। খেজমৎ সেখানে আমাকে দেখে বলে, 'বাবুর খুব একা একা লাগছে তো ? গান তো হবে সেই রাতে। তো আসুন এদিক পানে। নসরৎপুত থেকে একজন গাহক এসেছে। যাদুবিন্দুর গান জানে। গলা খুব আহামরি নয়, তবে ভাব আছে। তত্ত্ব জানে। তার গান শুনুন।'

নসরৎপুরের গাহকের নাম মোহন খ্যাপা। বিনয় সহকারে বসালে। খেজমৎ বললে, 'বাবু, আমি যাই, ওদিকে বোধহয় বাংলাদেশের দলের খবর এলো'। আমি মোহন খ্যাপাকে বললাম, 'যাদুবিন্দর গৌরাঙ্গতত্ত্বের গান শোনাবে ? তত্ত্ব বোঝাতে হবে কিন্তু।'

'তত্ত্ব আর কতটুকু জানি বলুন ? যিনি বোঝাবার তিনিই আমার বাক্য হয়ে আপনারে বোঝাবেন বৈকি। তবে আগে যাদুবিন্দুর গুরু কুবির গোঁসাইয়ের পদ গাই একটা, শুনুন।' দোতাবা বেঁধে গান ধরে :

দয়াল গুরু হে তোমা বই কেউ নাই
আমি খেতে শুতে আসতে যেতে
তোমারই গুণ গাই।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি যীশু তুমি কৃষ্ণ
অন্তিম কালে যেন তোমার স্বরূপ বুঝে যাই॥

চমকে গিয়ে গান থামাই। কি বললে মোহন খ্যাপা ? আশ্চর্য, কোথায় যে কি মিলে যায় কে জানে ? তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ ঠিকই তো আছে ? কিন্তু তুমি যীশুটা কি ব্যাপার ? একি ধর্ম সমন্বয়ের কথা ? আমার বিশ্লেষণ শুনে মোহন বলে, 'না বাবু, আমার গোঁসাই এ গানের অন্য তত্ত্ব দিয়েছেন।'

: কি রকম ?

: উনি বলেন আর সেটাই ঠিক যে বিন্দু বা শুক্র ছাড়া কেউ তাঁকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ যে নামেই ডাকি আসলে তিনি তো এক ! সেই জন্য আরেকটা পদে বলছে, 'গৌর গৌঃ বলছো যারে/ সে গৌর তোমার সঙ্গে ফেরে'। এ কথার কি ওই অর্থই নয় ?

কার্তিকের কুয়াশা কেটে পূর্ণিমার চাঁদ জাগছে। আমার চেতনালোক উদ্‌ভাসিত করে যেন নতুন একটা চাঁদ উঠছে। কেটে যাচ্ছে কুয়াশা। আমি মনে মনে বিড় বিড় করি শাস্ত্রে-পড়া শ্লোক : একশ্চৈতন্যচন্দ্র : পরম করুণয়া সর্বমাবিশ্চকার। এ শ্লোক কতবার ক্লাসে নিষ্প্রাণ আউড়েছি ছাত্রদের সামনে। আজকে সেই আবিষ্কার কি তবে পূর্ণ হতে চলেছে ? ইতিমধ্যে আমাদের ঘিরে

অনেকে জমেছে। বাংলাদেশের দলও এসে গেছে। মোহন গাইছে যাদুবিন্দুর পদ :

যাদের আছে সুসঙ্গ
দেখে গঙ্গা গৌরাঙ্গ
সময় সময় সুরধুনীর বাড়ে তরঙ্গ।

গান চলে। আমি কেবল কার্তিকের কুয়াশা ভেঙে এগিয়ে যাই খেজমতের ভিটে ছেড়ে বাইরে, মাঠে যেখানে রাশি রাশি ধানের পাঁজা। গানটার মানে নিজে নিজেই খুঁজে পাই। স্পষ্টই বুঝি এগানে 'গঙ্গা গৌরাঙ্গ' এক সঙ্গে বলতে বোঝাচ্ছে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার পথে বিন্দুর চলাচল। মাঝে মাঝে সেই তরঙ্গ বাড়া বলতে বোঝায় উদ্দীপন। নিজের দেহকে জানা, নিজের মধ্যে গতিময় কৃষ্ণকে জানা যায়, তার গতায়াতকে নিয়ন্ত্রণ করে সম্ভোগ করা এই তাহ'লে গৌরতত্ত্ব ? এ তো শাস্ত্রেও থাকতে পারে না, কাব্যেও না। এ তো লিখে বোঝানো যাবে না। সেই জন্যই কি এই তত্ত্ব গুরুশিষ্য পরম্পরায় লোকায়তিক। মৌখিক অথচ সর্বত্র উচ্চার্য নয় ! ক্রিয়াত্মক অথচ গোপন।

অথচ তখনও কতটা বোঝা বাকি ছিল বুঝি নি। একটা ঘোরের মধ্যেই যেন রাতটা কেটে গেল। অন্নসেবা, গানেব পর গান, চাঁদনী রাত সব কোথা দিয়ে কেটে গেল আমি বুঝি নি। বসেছিলাম শেষরাতে মযদানী বিবির কাঁথা পেতে ঘরের দাওয়ায়। গান থেমে গেছে। সব দিক চুপচাপ। কে কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ঢেঁকির পাড দেবার শব্দ ঢুপ ঢুপ ঢুপ। শেষরাতে বৌ-ঝিরা উঠে ধান ভানছে। বাংলাদেশের দলটা আশ্রয় নিয়েছে আমার কিছু দূরে দাওয়ায়। সবাই পথক্লান্ত নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন। কেবল একজন বৃদ্ধ ফকির বসে বসে তসবি মালা জপছে বিড়বিড় করে। খানদানী দরবেশ। জেল্লাদার আলখাল্লা। কুষ্টিয়ার বারখেদা অঞ্চলের ফকির।

বারখেদার ফকিরকে দেখে একটা কথাই মনে হতে লাগলো যে মানুষটা খিদে তেষ্টা শ্রান্তি সব কিছুকেই জয় করেছেন। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশেব কুষ্টিয়া যশোর রাজশাহী এসব জায়গায় শুনেছি অনেক ক্ষমতাশালী ফকির আছে। ক্ষমতাশালী বলতে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শ্বাসের কাজ আর শরীরী দুঃখকষ্টকে জয় করা। কুষ্টিয়া থেকে তিনদিন আগে রওনা হয়ে বেশির ভাগ হাঁটাপথে এই দল এসে পৌঁছেছে বাদলাঙ্গী। কিছু না হোক ষাট সত্তর মাইল হাঁটতে হয়েছে। অথচ এখানে আসা ইস্তক এই মানুষটা খাড়া বসে আছেন। মাঝরাত পর্যন্ত সারাক্ষণ বসেছিলেন শব্দগানের আসরে। এখন দলের সবাই ঘুমে কাদা অথচ ফকির একলা বসে আপন মনের গভীরে জপ করছেন। এরা নাকি শ্বাসের মধ্যেই

জপক্রিয়া করে, শ্বাসেই এদের নামাজ। সে নামাজ অবশ্য বাতুল বা অপ্রকাশ্য। বাতের এয়সা নামাজ থেকে শুরু হয়েছে শ্বাসের ক্রিয়া, শেষ হবে খুব ভোরে, সেই ফজর নামাজের সময়।

আমার ঘুমও নেই, নামাজও নেই। আমি নিঃসঙ্গ জিজ্ঞাসু। আমার সঙ্গী বলতে রবীন্দ্রনাথের সেই গান : 'ফিরি আমি উদাস প্রাণে/ তাকাই সবার মুখের পানে'। সত্যিই কত জনের মুখের দিকে তাকিয়েই যে আমার জীবনের অর্ধেক কাটলো। এই সব আপাত অর্থে অজ্ঞ মূর্খ মানুষগুলো আমাকে যা শিখিয়েছে জানিয়েছে তার কণামাত্রও কি পেয়েছি শিষ্ট বিদ্বান মহলে ? এইতো সন্ধ্যেবেলাতেই মোহন খ্যাপার মত সাধারণ স্তরের গাহক আমাকে যে-পথ রেখা দেখালো তা কি আমার বিদ্যেবুদ্ধির পুঁজি থেকে কোনো দিন বেরোতো ? বসে আছি ময়দানী বিবির হাতে তৈরি নক্শী কাঁথায়। তাতে জড়িয়ে আছে যে-সেবাধর্মের তাপ, যে সুন্দরের অভিবন্দনা তার কি আমি প্রতিদান দিতে পারবো কোনোদিন ? অনিমীল চোখে বসে আছেন বারখেদার ফকির। জীবনের কত বড় সম্পদ আর সম্পন্নতা পেয়ে গেছেন আপন অন্তরে। সে-শান্তি, সে-নিশ্চিতি কি একটুও আছে আমার অর্থ-কীর্তি-স্বচ্ছলতায় ? এই সবই ভাবছি, আবার নবলব্ধ চৈতন্যতত্ত্বের কথাও ভাবছি। সেই যে পাটুলী স্টেশনে বাউল গোঁসাই বলেছিলো, 'তোমার একটু দেরি আছে, তবে জানতে পারবে তাঁকে' কত দেরি আর ? রাতচরা পাখির হঠাৎ ডাকে চিন্তার সূত্র কেটে যায়। রাত কি তবে শেষ হয়ে এলো ? যেন একটা শীতের কাঁপন্ শেষরাতে শরীরকে জানান দেয়। একটু একটু চোখ জ্বলে। আমি খুব নির্ভার শূন্য মনে আশ্চর্য এই মানব পরিবেশে খানিকটা বিস্ময় পোহাই। শস্যের গন্ধ ওঠে উদাসী।

চিন্তায় ডুবে ছিলাম আনমনা। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরলো খস্খস্ আওয়াজে। দেখি, দাওয়া থেকে খুব চুপিসাড়ে উঠে ফকির যাচ্ছেন পুকুরে গোসল সারতে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো মোহন খ্যাপা। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ফিস্ফিস্ করে বললো, 'আমি খবর নিয়ে জেনেছি, মস্তবড় জান্নেওয়ালা মুর্শিদ ঐ আলাল ফকির। একশো বছরের ওপরে বয়স। শেষ রাত থেকে ঘাপটি মেরে বসে আছি। চলুন বাবু পুকুর ঘাটে যাই, ধরি ওনাকে। এই তো সময়। বারখেদার ঐ লোকগুলো আমারে বলেছে, ফজরের আগে গোসল সারার ঠিক পরে ফকিরকে যা জিগ্যেস করা যাবে তার জবাব মিলবে। তারপর সারাদিন তো থাকবেন মৌনী। চলুন চলুন। আপনার কোনো নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে ইচ্ছে নেই ?'

নিগূঢ় তত্ত্ব ? হ্যাঁ, চৈতন্যতত্ত্বই তো সঠিক জানা হয় নি। সুকান্ত বলেছিলেন

দরবেশরা জানেন তা। তবে কি সেই সুযোগ এলো এতদিনে ? স্বপ্নতাড়িতের মত গিয়ে দাঁড়ালাম লুকিয়ে এক বকুল গাছের আওতায়। এবারে শুধু অপেক্ষা। গন্ধে বুঝছি, বুনো ফুলের আর্দ্র অস্তিত্ব। আবছা অন্ধকার। এক, দুই, তিন, চার···মুহূর্ত এগোচ্ছে। কোন্ সাধক বলেছিলেন যেন,This is the hour of God's awakening। ঐ তো ঐ যে আলাল ফকির সোজা উঠে আসছেন। সপ্‌সপ্ আওয়াজ উঠছে। আলখাল্লার শেষপ্রান্ত ভিজে গেছে না কি ? তাঁর চোখ সুদূর মগ্ন উদাস, অন্যজগতে। ঠিক আততায়ীর মত চকিতে গিয়ে সামনে দাঁড়াই আমি আর মোহন খ্যাপা। প্রথমে সামান্য ত্রস্ত, তারপরেই ক্ষমার উজ্জ্বল শান্ততায় চোখ ভরে তাকালেন, 'বলো বাবা, কি জানবে ?' বহু বাসনায় বহুদিনের আকুলতা মিশিয়ে জানালাম অভিলাষ। হাসলেন সামান্য। তার পরে হাতটা ওপর দিকে তুলে বললেন, 'কি জানো বাবা, মাথার মণি বিন্দুই কৃষ্ণ। তাঁর যাতায়াত দেহের মেরুদাঁড়া ধরে বায়ুর ক্রিয়ায় লিঙ্গের মুখে। তাঁর রসরতির খেলা নিত্যানন্দের দ্বারে। প্রথমে কৃষ্ণ মণিকোঠা থেকে যাবেন অধোবেগে যোনিমুখে। এবার সাধক তেনারে দমের বলে উল্টে নিয়ে উর্ধ্ব বেগে নিয়ে যাবেন মণিকোঠায় ফিরিয়ে। যখন তিনি অধোমুখী তখন তিনি 'ধারা'। যখন উলটে গিয়ে হলেন উর্ধ্বমুখী তখন তিনি হলেন 'রাধা'। এইভাবে চলবে ধারা থেকে রাধা আবার রাধা থেকে ধারা। এই চলাচল আর স্থিতির নাম গৌর। বুঝলে ? ধারার বরণ শ্বেত, রাধার বরণ পীত। দেহের মধ্যে গৌরকে কায়েম করতে বহু বহু বছর লাগে বাবা। নিত্যানন্দ সহায় হলে তবে তো গৌর পাবে। গৌরচাঁদকে ধরো। শান্তি পাবে।

চলমান পদশব্দ জানিয়ে দিল ফকিরের প্রস্থান। দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের মত স্তব্ধ গভীরতায়। খুব ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালো এক বর্ণময় নিষ্পাপ বায়ুপূরিত স্বচ্ছ দিনের উষাকাল।

গভীর নির্জন পথের উল্‌টো বাঁকে

সত্যিকারের মনের মানুষকে যারা খোঁজে তারা নিশ্চয়ই প্রথমে খুঁজতে চায় সেই গভীর নির্জন পথ। কিন্তু আমি যখন মনের মানুষের পথসন্ধানী মানুষগুলিকে গ্রামে গ্রামে খুঁজে বেড়াতাম তখন আমার পথ ভরা থাকত অজস্র মানুষে। তারা পদে পদে সামনে এসে দাঁড়াত। বিপুল তাদের জিজ্ঞাসা এবং সবই ব্যক্তিগত। 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?' 'আপনি কার বাড়ি যাবেন?' 'আপনি যে-সব কথা জানতে চাইছেন তা বলব কেন? তাতে আমাদের কি লাভ?' 'এ গাঁয়ে কেউ কি আপনাকে চেনে? তবে আপনারে বিশ্বাস করব কেনে?' 'জানেন, দু বছর আগে গরমেণ্ট থেকে একটা লোক এয়েলো গাঁয়ে কটা ঢেঁকি আছে তাই গুনতে। গুনেগেঁথে তো চলে গেল, তার পরেই হলো কঠিন ডাকাতি।'

কঠিন ডাকাতি? প্রথম দিন বিশেষণটা হজম করতে পারি নি। পরে দেখলাম মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ী অঞ্চলে কঠিন শব্দটা সুন্দর বা ভয়ঙ্কর অর্থে চলে। বেলডাঙ্গার ইমানালি সেবারকার বিধ্বংসী বন্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বললে: 'বাবু আমাদের সব দিগরে এবারে হয়েছিল কঠিন বন্যা।' কুমীরদহের শিবশেখরের বাড়িতে মচ্ছবের খিচুড়ি খেতে খেতে একজন বলে উঠলে আমাকে, 'খুব কঠিন খিচুড়ি, না কি কহেন?'

কিন্তু সে কথা থাক। আপাতত কঠিন থেকে সরে আসি। হচ্ছিল গ্রামের মানুষের সন্দেহ বাতিকের কথা। তাদের এত যে প্রশ্ন, এত অবিশ্বাস, অথচ আমরা কিছু জিগ্যেস করলেই অদ্ভুত নির্বিকার জবাব মিলবে।

সেবার যাচ্ছি সাতগেছিয়ার গ্রামের রাস্তা ধরে। দু পাশে আল-বাঁধা ভুঁই, মাঝখানে তৈরি-হয়ে-যাওয়া সরু পথ। শস্যের টাটকা ঘ্রাণ এবং গোবরের। পাঁচনি হাতে চাষা থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। মাঠের মাঝখানে অদ্ভুত এক গাছতলায় আখের রস জ্বাল হচ্ছে। প্রশ্নটা উঠল আমার স্ত্রীর মনে: 'এটা কী গাছ?' যে রস জ্বাল দিচ্ছিল তাকে জিগ্যেস করতেই আনমনে উদাসীন উত্তর এল: 'ঐ গাছটা? হ্যাঁগো তোমরা জানো নাকিন কি গাছ ওটা?' খ্যা খ্যা করে নিজেই খানিকটা হেসে বললে: 'ওটা তাহলে কী-জানি গাছ কিংবা না-জানি

গাছ।' এর পবেই এক মর্মভেদী নগ্ন প্রশ্ন : 'তা আপনাদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ? কোথায় যাওয়া হবে ? সঙ্গে কি আপনার নিজের পরিবার না আন্‌খা মেয়েছেলে ?'

অপমানিত স্ত্রীকে নিমেষে চোখেব ভ্রূকুটিতে সামলে আমি ঠিকানা পেয়ে যাই এক নির্জন আখড়ার। ঠারেঠোবে আন্‌খা মেয়েছেলেব ইঙ্গিত বুঝতে আমার দেরি হয় না। আমার মনে পড়ে যায অন্ধ এলা ফকিরের সতর্কবাণী : 'বাবু, তুমি এ পথে নেমেছ, খুব আপ্ত-সাবধান থাকবা। এ লাইনে হরেক মানুষ। সব বাউল-বৈরাগী উদাসীন সেজে আছে। সবাই কি তাই ? শোনো তুমি, শুনে রাখো। বৈরেগী পাঁচ রকম—চ্যাটাস্তি, প্যাটাস্তি, মালাটেপা, ওষুধবেচা আর অ্যালাখ্যাপা। কিছু বুঝলে ?'

কী করে বুঝব ? শহুরে সংস্কৃতিব মার্জিত মানুষ। তার ওপরে মহাবিদ্যালয়ে পুঁথিপড়া জ্ঞানদান করে থাকি। আমার অসহায় মুখখানা অন্ধ এলা ফকির ভাগ্যিস দেখে নি। একটু তদ্‌গত হেসে এলা বলেছিল : 'শোনো তোমাকে বুঝিয়ে দিই। বাউল-বৈরাগীব মধ্যে বেশির ভাগ প্যাটাস্তি মানে পেটেব ধান্দায় ভেক নিয়েছে। ভজন নেই, ভোজনে দড। খাওয়া ছাড়া আব কিছু বোঝে না। আর মালাটেপা মানে ভেতরে ঢুঁঢুঁ, শুধু চোখ বুজে তসবি মালা টিপছে। সাবধান। ওষুধবেচা বৈরাগী কেমন জানো ? কতকগুলো জড়িবুটি নিদেন-পথ্য জানে, ঐ বেচে খায়। সাধনভজন জানে না। আর অ্যালাখ্যাপা মানে গেঁজেল। সাধনভজনের চেয়ে ছিলিমের দিকে ঝোঁক। সব ঊর্ধ্বচোখ অধোমুখ. হাসি-হাসি ভাব। এদের যতটা পারো এড়িয়ে চলবা।'

'আর চ্যাটাস্তি ?' আমি খেয়াল রেখেছি এলা ফকিব প্রথমটা প্রথমে বলে নি।

এলা রুষে উঠল, 'অশৈল কথাটা তুমি সেই উচ্চারণ করলে ? ও কথাটা খারাপ। খুব খারাপ। শোনো তোমাকে বলি, ও কথাটার মানে যারা ধম্মের নামে মেয়েমানুষ ভোগ করে কেবল। বাবা, খুব সাবধানে থাকবা।'

:এত-সব চিনব কী করে। দেখলেই তো বোঝা যায় না।

: সব বুঝবে। লক্ষণে ধরা পড়বে। তিনিই চিনিয়ে দেবেন। ঐ যে খারাপ কথাটা বললে, ওদের আখড়ায় দেখবে শুধুই মেয়েছেলে, আন্‌খা মেয়েছেলে। তাদের মুখগুলো দেখবে নিপাট ভালোমানুষের পারা।

সেই আন্‌খা মেয়েছেলে কথাটা এলা ফকিরের পর দ্বিতীয়বার শুনলাম এই সাতগেছিয়ার গ্রামে। সেদিন আর নয়। পরের রবিবার আবার হাজির হলাম। এবার একা। রস জ্বাল দেবার কারিগরই এবারে হদিশ দিলে : 'সোজা দুখান মাঠ

ভাঙলে পাবেন একখানা পাকুড় গাছ। ঐটে নিশানা। ব্যাস, ডান দিকে পোয়াটাক হাঁটলেই নদী। নদীর পরপারে আখড়া।'

ধারাগোলের নির্দেশ মেনে একেবারে সটান পৌঁছে যাই আখড়ার চত্বরে। তকতকে উঠোনে যত না গোলা পায়রা তত ছেলেমেয়ে। নানা বয়সী। সুনসান গ্রীষ্মের দুপুর। দক্ষিণ চরের আখড়ায় গরম বাতাস মারছে ঝাপট। আমি এদিক-ওদিক খানিক ঘুরে একটা একানে দাওয়ায় উঠে জানালা নিয়ে ঘরে উঁকি মেরেছি। সর্বনাশ, এ কী দৃশ্য ? দেখি এক মাঝবয়সী মানুষের দুই হাঁটুতে ব'সে দুই নারী। লোকটির টেরিবাগানো দিব্যি বাবরি। সাদা মেরজাই সাদা ধুতি। মুখে নিশ্চয়ই গ্যাঁজার বিড়ি। তাতে অগ্নিসংযোগ করবার জন্যে মধুর হাতাহাতি করছে তার দুই জানুর ওপর ব'সে দুই সেবাদাসী। মানুষটির আনন বহুদর্শী ঝুনো। ঠোঁটে হাসি। চোখ বন্ধ। বাপরে, এ যে কালীঘাটের জ্যান্ত পট! অনিবার্যভাবে এলা ফকিরের বলা সেই অশৈল শব্দটা মনে খেলে গেল। আর মনে পড়ল : 'সাবধান, আপ্ত—সাবধান থাকবা।'

আর কি দাওয়ায় থাকতে আছে ? একছুটে একেবারে বাগানে। সেখানে আবার আরেক আশ্চর্য। ভরা জ্যৈষ্ঠের অনেক আমগাছে ফলে আছে অজস্র আম, পুরুষ্টু নধর। সবুজ পাতা আর হলুদ আমের দোলাচল। অভিনব দৃশ্য বৈকি, বিশেষত হালের গ্রাম বাংলার। কেননা এখন ফাগুন চোতে আমের গুটি পুরুষ্টু হলেই ভেণ্ডাররা গাছ ভেঙে সব কাঁচা আম চালান করে দেয়। অথচ এখানে বাবাজীর আখড়ার বাগানে পাকা আম তো কেউ নেয় না।

আমার উর্ধ্বচারী চাহনি দেখে এগিয়ে এল এক সেবাদাসী। বলল : 'পাকা আম দেখে অবাক হচ্ছো ? এর মূলে আমাদের গুরুদেবের মহিমে। শোন্‌বা সেই বিত্তান্ত ? বছর পাঁচেক আগে আমাদের এই আখড়ার বাগানে এক ভেণ্ডার এয়েলো আম চুরি করতে। তা আমাদের গুরু-ঠাকুরের মহিমে তো জানত না বেটা। যেই আমে হাত দিয়েচে অমনি হাত গেছে এট্‌কে। তখন তানকানা পাখির মতো সারারাত ঝটর পটর ঝটর পটর।'

:বুঝেছি। এবার গল্পের বাকিটুকু বলি। তারপর তো সারারাত্র সেই ঝটর পটর কিন্তু হাত আর ছাড়ে না। এদিকে তোমাদের গুরুঠাকুর ধ্যানবলে সবই জেনেছিলেন। সকাল হতে সকলকে ডেকে এনে মন্ত্রবলে চোরকে ছাড়ালেন। চোর বেটা গুরুর পা চেপে ধরে বললে : 'তোমার মহিমে আগে বুঝি নি বাবাঠাকুর। তাহলে কি এই গুখোরি কাজ করি ? আমাকে বাঁচান বাবা।' সেই থেকে এ বাগানের ফল-ফুলারিতে আর কেউ হাত দেয় না। কি ঠিক বলেছি না ?

'এক্কেবারে ঠিক', বিস্মিত সেবাদাসী সম্ভ্রম নিয়ে এগিয়ে এসে আমাকে অনেকক্ষণ নিরিখ করে বলল : 'তুমি বাবা কোন্ গুরুঠাকুর ? কেমন করে জানলে ?'

আমি বললাম : ঠিক এই গপ্পো আমি পাঁচটা আখড়ায় শুনেছি তো ? ব্যাপার কি জানো ? ঐ চোরটা ছিল সাজানো আর তোমাদের গুরুঠাকুর আসলে হলেন বাংলার জাতীয় পক্ষী। অর্থাৎ যাকে বলে ঘুঘু।'

সেখান থেকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়ে আখড়া-সংলগ্ন চায়ের দোকানে বসি এবং সংগ্রহ করি গুরুঠাকুরের উদাহবণীয জীবনী। আখড়া-সংলগ্ন গ্রামেই শ্রীমৎ-এর আদি বাস্তু। জাতে সদ্গোপ। বাপ ছিল নাংলা চাষা। বৃত্তি পাশ দিয়ে শ্রীমান্ ভিড়ে যান পাটুলির এক সহজিযা আখড়ায়। সেই থেকে সহজানন্দে আছেন। বাপ বিয়ে দিয়ে ঘরে টেনেছিল। বউ কেন যে গলায় দড়ি দিল কেউ জানে না। ইনি ততদিনে বৈরাগ্য নিয়ে এখানে থানা গড়েছেন। ভারতবর্ষ সেকুলার দেশ। এখানে সাধন-ভজনের কোনো বাধা নেই। ধর্ম আর কর্ম। তার পরে ধর্ম থেকে ধাম অর্থাৎ এই আখড়া, আর কর্ম থেকে কাম। এমন মান্যমান রাত স্মরণীয় ব্যক্তির কাহিনী অমৃত সমান। সে-সব শুনতে শুনতে সন্ধে ঘনিয়ে এল। সাঁঝবাতি জ্বাললেন সেবাদাসীরা। একবার খড়ম পরে উঠোনে ঘুরে গেলেন শ্রীমৎ। আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন আমি এক পরম পাপী আর তিনি এক মহান মিনি সাঁইবাবা।

কিন্তু আমার মনে এ কথা না এসে পারল না যে এত সেবাদাসী কোথা থেকে আসে ? আগে ভাবি নি তবু জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে মনে এল। এ পোড়া দেশে বৈধব্যেরও শেষ নেই, সেবাদাসীরও নেই কম্‌তি। গ্রামদেশের গরিব গলগ্রহ নিঃসন্তান বিধবা কি কম ? ভাসুর-দেওরের উটকো কামাগ্নি থেকে বাঁচতে কেমন ক'রে এরা গুরুবরণ করে, জুটে যায় আখড়ায়, কারা তাদের টানে, ফুসলোয়, উপহার দেয় যৌনরোগ, সে সব কিছুর সামাজিক ইতিহাস কে লেখে ? সঙ্গে সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মেলায় দেখা একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে মনে। সেবারে কিশোরদাস আর তার বউ রূপকুমারী ঘুরে ঘুরে বাউল গান গাইছিল। হঠাৎ 'ও মাগো' বলে পেট খামচে মাটিতে ব'সে পড়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগল রূপকুমারী। এমনি চটকদার রূপসী মেয়ে। ব্যথায় মুখখানা করুণ। ছুটে যেতে আমাকে বললে : বাবুগো, আর বাঁচবনি। না খেয়ে খেয়ে আমার পেটে গ্যাসটিক। যম যন্ত্রন্না।

সেই রূপকুমারীকে আবার দেখি অগ্রদ্বীপের মেলায় কদম-গাছতলায় ভিক্ষে চাইছে। কোটরাগত চোখ, মলিন চাহনি, রোগা, প্রেতের মতো চেহারা। একজন

চেনা বৈরাগী কানে কানে বলল : বাবু, ঠিকই ধরেছেন। এ সেই রূপকুমারী। কী গান গাইত মনে আছে ? রূপের কী চেকনাই বাহার ছিল ? সব গেছে।

: কি হয়েছে ওর ? কী রোগ ?

ফিসফিস করে লোকটা বলল : খারাপ রোগ। কত বৈরেগী ওকে শুষে খেয়েছে জানেন ? ও তো ঘরের বউ ছিল। বিধবা হ'তে কিশোরদাস ওকে ফুসলে বার করেছিল।

: এর কোনো প্রতিকার নেই ?

: প্রতিকার আবার কি ? এরা তো আপ্ত ইচ্ছায় এ পথে এসেছে। প্রথমে বোঝে নি। যখন বোঝে তখন সমাজে জায়গা কই আর ? আপনাকে বলছি বাবু, এ আমি অনেক দেখলাম, বাউলবৈরেগীর যৌবন টেকে না। এদের মরণ গাঁজায় আর কামে।

আখড়া-সংলগ্ন চা-অলাও প্রায় একই কথা বলল, 'এত যে দেখছেন সেবাদাসী তার মধ্যে ভক্তিমতী আর কজন ? বেশির ভাগ আন্‌খা মেয়েছেলে। কোথা থেকে জুটে যায়। সব উস্‌কো আড়কাঠিতে নিয়ে আসে। আখড়া কে আখড়া এই বিত্তান্ত। নিজেরা সব নষ্ট হয়েছে, আবার এরাই গেরস্তের বৌ ঝিদের ধম্মের নামে এখানে এনে নষ্ট করবে। এখানে ব'সে কত দেখলাম।'

: গ্রামের লোকেরা প্রতিবাদ করে না ?

: অজ্ঞ মূর্খ সব চাষার বাস। তায় বেশির ভাগ মুসলমান। কি বলবে ? ধম্ম নিয়ে কথা বললে রায়ট বেধে যাবে।

ফেরার পথে গ্রামের মুখে অন্ধকারে আমার মুখে ঝলসে উঠল তীব্র এক টর্চের আলো। 'কে ? কে যায় ?' এটাও গ্রাম-দেশের রীতি। টর্চধারী যুবক আমার পরিচয় জানতে চাইল। তারপরে ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'ও, মহাপুরুষ দর্শনে গিয়েছিলেন ?'

তবে যে চা-অলা বলল প্রতিবাদ নেই ? ভালো লাগল প্রতিবাদী যুবকের বিদ্রুপ। সে বলে চলল, 'তা আপনাকে তো শিক্ষিত শহুরে লোক ব'লেই মনে হচ্ছে, এখানে কেন ? দাদা কি একেবারে ফেঁসে গেছেন ? তো মহাপুরুষ কত টাকা চাইল ? দুশো না আড়াইশো ?'

চমকে গিয়ে বলতেই হলো, 'মানে ? উনি কি দীক্ষা দিতে অত টাকা নেন ?'

ততক্ষণে আধোরহস্যের মায়া জাগিয়ে কোদালে-কুড়ুলে মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো একটু একটু দেখা দিচ্ছে। অচেনা যুবকটির মুখে লেখাপড়ার ছাপ স্পষ্ট। অবাক হয়ে বলল, 'আপনার কথা শুনে প্রথমে মনে হচ্ছিল ন্যাকা বোষ্টমের মতো। এখন বুঝেছি কিস্যু জানেন না মহাপুরুষ সম্পর্কে। জানেন না,

ওটা একটা অ্যাবর্শন্ সেন্টার ?'

যেন মুখে একটা চাবুক পড়ল। এবারে বুঝলাম সাতগেছিয়ার পথে গুড়অলা কেন সেদিন আমার স্ত্রীকে মনে করেছিল আন্‌খা মেয়েছেলে। ছেলেটি গড়গড় ক'রে ব'লে গেল · 'গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুবলে এমন অ্যাবর্শন্ সেণ্টার মাঝে মাঝে পাবেন। তবে বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। ওপরে ধর্মের মোড়ক। নামগান কেত্তন হচ্ছে। মেলা মচ্ছব, দিবসী, পাব্বন সব চলছে। নাটের গুরু একজন আছেন। পতিহাবাব পতি ফিরে আসবে, অন্ধ পাবে দৃষ্টি, বোবায় কথা বলবে, বাঁজা মেয়ের সন্তান হবে, এ-সব হচ্ছে প্রকাশ্য শ্লোগান। আসলে এসব আখড়া সেমি-ব্রথেল্। আর গ্রাম-দেশে কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ প্রেগন্যাণ্ট হয় তবে তাদের বাপ-মা এইসব আখড়ায় মাসখানেক রেখে যায়। গ্রামের লোকদের বলে, মেয়ে গেছে গুরুসেবা দিতে। তাবপর মেয়ে দিব্যি খালাস হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। দু-একটা মবেও যায়। চরেব বালি খুঁড়ে, ডেডবডি হাপিস করে দেবারও লোক আছে। থানা বহুদূবে। সেখানে নিয়ম করে গুরুঠাকুর প্রণামী পাঠান।সব ঠিকঠাক চলছে। এই তো আমাদের দেশ।'

: আপনি কিছু কবছেন না। কোনো প্রতিরোধ ?

: তারই চেষ্টা চলছে। কঠিন। কঠিন কাজ। আপাতত একটা নাইট স্কুল খুলেছি। অনেক লোক শত্রুতা করে পেছনে লেগে গেছে এর মধ্যে। অঞ্চলপ্রধান বাধা দিচ্ছে। সেও তো গুরুঠাকুরের শিষ্য। কবে একদিন হয়তো আমায় গণধোলাই দিয়ে খতম করে আমার হাতে একটা পিস্তল ধরিয়ে দেবে। আপনারা খবরের কাগজে রসিয়ে পড়বেন : রাখালগাছি গ্রামে নদীর চরে সশস্ত্র যুবক গণধোলাইয়ে খতম।

ম্লান হাসি যুবকের মুখে। হঠাৎ বলল, 'ভালো কথা। আপনি এই রাতে থাকবেন কোথা ?'

: থেকে যাব কোথাও। অভ্যেস আছে।

: তা কি হয় ? আমার ডেরা অবশ্য একটা আছে তবে সেখানে থাকলে আপনার উটকো ঝামেলা হবে কাল সকালে। তার চেয়ে চলুন আপনাকে কালোসায়েবের বাড়ি নিয়ে যাই।

কালোসায়েব নামটা যত অদ্ভুত মানুষটা তার চেয়ে কম অদ্ভুত নয়। একটা মরা সোঁতার ওপরে বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো,.তার ওপিঠে কালোসায়েবের বাড়ি। ভট ভট ক'রে জেনারেটর চলছে। কালোসায়েবের বাড়ি আলোকিত। গ্রাম-দেশে খুব অভিনব দৃশ্য বৈকি ! যুবক আমাকে কালোসায়েবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েই কেটে পড়ল 'চলি দাদা, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

কালোসায়েব আসলে কালো নন, রীতিমত গৌরবর্ণ শালপ্রাংশু পুরুষ। বয়স আন্দাজ ষাট বছর। খুবই অভিজাত ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন একখানা সাবেকি ডিভানে। সুন্দর সাজানো ঘর, শ্বেত পাথরের গোল টেবিল, উনিশ শতকের রঙিন বিলিতি ছবি দেওয়ালে বাঁধানো, ঝাড়বাতির মধ্যে জেনারেটরের কল্যাণে ডুম জ্বলছে। চমৎকার। যেন উত্তর কলকাতার এক তস্য গলির সাবেক কলকাতাকে খুঁজে পাবার বিস্ময় আমার চোখে।

'কালোসায়েব আমাকে বলে সব হিংসায়' মানুষটি আমাকে বোঝাতে চান বিশদ করে, 'আসলে আই হেট দিস্ ভিলেজ অ্যাণ্ড দোজ ভিলেজারস্। দে আর ন্যারো মাইণ্ডেড্ অ্যাণ্ড আনক্লিন। ঐ সন্তোষ ছোকরা, যে আপানাকে আনলো আরকি, ওর সঙ্গে আমার যেটুকু মেলামেশা, কথাবার্তা।'

: গ্রামে কি সবায়ের সঙ্গে মেলামেশা না করলে টেঁকা যায়? অত্যাচার করে না? ডাকাতি হয় নি?

অ্যাটেম্‌টেড্, বাট ফেলড্। মশাই, আমার চার বোরের বন্দুক আছে তিনখানা। আমি, আমার গিন্নি আর আমার বৌমা সব বন্দুকে ওস্তাদ। আমরা হলাম সেল্‌ফ্ সাফিসিয়েণ্ট ফ্যামিলি। দাঁড়ান সব আপনাকে দেখাই। কিন্তু সব আগে চা জলখাবার।

কালোসায়েব উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে রাখা এক স্বনির্মিত দেশজ মডেলের টেলিফোন তুলে বোতাম টিপে সুরু কবলেন সংলাপ : হ্যালো, কে বউমা? হ্যাঁ, শুনেছ বোধ হয় গেস্ট এসেছেন একজন। হ্যাঁ, রাতে থাকবেন, খাবেন। হ্যাঁ, দোতালার দক্ষিণের ঘরটাই ভালো হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এক্ষুনি জলখাবার পাঠাবে। লুচি বেগুনভাজা একটু ক্ষীর? নাইস। হ্যাঁ, তোমার শ্বশ্রুমাতাকে একটু এ ঘরে পাঠাও দেখি।

একগাল প্রসন্ন হাসি। সফলতার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে দাঁড়ালেন গোলগাল এক কালো মধ্যবয়সী মহিলা। অদ্ভুত কনট্রাস্ট। একজন নির্মেদ খাড়া গৌরবর্ণ ছ ফুট পুরুষের পাশে স্থূলাঙ্গিনী, দারুণ বেঁটে, মিশকালো নারী। কিন্তু অপূর্ব সুখী একখানা স্থিরচিত্র যেন। কালোসায়েব সগর্বে বললেন : খুব দুরন্ত ছিলাম। কুড়ি বছর বয়েসে বাড়ি থেকে পালাই জাহাজের খালাসী হয়ে। পরে মেকানিকের কাজ শিখি। সাতঘাটের জল খেয়ে বাড়ি এসে থিতু হয়ে তবে বিয়ে করি। বিয়েতে আমার একটাই শর্ত ছিল কেবল—মেয়ে যেন কালো আর বেঁটে হয়।

: এমন অদ্ভুত শর্ত কেন?

: আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি, আমাদের দেশে কালো আর বেঁটে

মেয়েদের বড় হেনস্থা। তারা যাবে কোথায় ? কালো আর বেঁটে বলে ভালো বিয়ে হবে না ? আমার ছেলের বিয়েও দিয়েছি কালো মেয়ের সঙ্গে। তো আপনাকে যা বলছিলাম। নেভির চাকরিতে অনেক টাকা রোজগার করেছিলাম তাই আব গোলামী করি নি কোনোদিন। ছিলাম জাহাজের মেকানিক। যন্ত্রপাতির দিকে খুব শখ। এ-সব টেলিফোন জেনারেটর নিজে করেছি। চাষবাস করবার জন্যে নিজে ট্রাক্টর চালাই, ছেলে চালায়। কারুর ধার ধারি নে।

: আপনাকে কালোসায়েব বলে কেন ?

: কাবণ আমার সব টিপটপ। বাড়িতে এই দেখছেন ধুতি আর বেনিয়ান। কিন্তু বাইরে বেরুলেই ট্রাউজার, ফুল শ্লীভ শার্ট আর বুট। ঐ-সব লুঙ্গি, পাজামা, হাওযাই চটি, হাওয়াই শার্ট আমার চলে না। ও-সব সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড্ ওয়ারের পর এসেছে। আমি টেরিকটনও পরি না। সব কটন।

মজার মানুষটিকে ঘাঁটাতে বেশ লাগে। বলে বসি . গ্রাম থেকে কিছু কেনেন না ?

'কেন কিনব ? জমিতে অঢেল সব্‌জি তরকারি, পুকুরে মাছ, পোলট্রিতে ডিম। মাসে একবার পোস্তাবাজার থেকে সাবা মাসের আলু-পেঁয়াজ-আদা-রসুন-তেল-মসলা-চা-চিনি কিনে লালগোলার ট্রেনে চাপাই। তারপরে মুড়োগাছা স্টেশনে নামিয়ে নিই। তারপরে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে সোজা এই রাখালগাছি। ব্যাস্।'

ইতিমধ্যে সুবাসিত চা আর জলখাবার পর্ব চুকেছে। মানুষটির দিকে তাকিয়ে বিস্ময় আর শেষ হয় না। ভদ্রলোক তাঁর মনের কথা বলার মতো লোক পান না বোধ হয়। তাই অনর্গল বলে চলেন, 'এই গ্রাম নষ্ট হয়ে গেছে। রট্ন্। সব সময় গমকল ভট্‌ভট্ করছে, ট্রানজিস্টার্ ক্যাঁ ক্যাঁ করছে, বাজার-হাটে কতকগুলো কুচ্ছিৎ মাছ বিক্রি হয়, জঘন্য সব নাম : তেলাপিয়া, সাইপিয়ন, গ্রাসকাপ। কপি, বেগুন মুলো খান কোনো টেস্ট নেই, সব বিষ ছড়ানো। বাজার করেন নিজে ? শুনুন একটা টিপস্ দিই—বাজারে বেছে বেছে কানা বেগুন কিনবেন। ওতে কীটনাশক দেওয়া নেই। যে-সব তরকারি দেখবেন চকচক করছে কক্ষনো কিনবেন না, সব ফসফেটে ভর্তি।'

এতক্ষণ মুখ সুড়সুড় করছিল, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম : মানুষজন আপনার সহ্য হয় না কেন ?

হো হো ক'রে খানিক হাসলেন উচ্চকণ্ঠে আপন মনে। তার পর বললেন : মানুষজন আপানে দেখতে পান আর ? কোথাও আছে ? সব আই· আর· এইট· ভ্যারাইটি।

: আই· আর· এইট ? সে তো একরকম ধানের নাম ! তাই না ?

: প্রথমে ধানের বীজ ছিল। তারপরে শব্‌জির আই· আর· এইট বেরিয়েছে। সব শেষে এখন মানুষের আই· আর· এইট দেশ ছেয়ে গেছে। উচ্চ ফলনশীল। দেখতে ভালো, ভেতরে টুঁটুঁ। বিস্বাদ। অড্‌ লুকিং ব্যাড ক্যারেক্‌টার্স। চারি দিকে থিক থিক করছে আই· আর· এইট· মানুষ। দেখেন নি ?

আমি বললাম, : নিশ্চয়ই দেখেছি কিন্তু বুঝি নি। আপনি বোঝেন কি করে ?

: কেন, লক্ষণ দেখে ! এই তো আমার পাশের বাড়ির ছোকরা, নামের খুব জোর, সন্দীপন। গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু একখানা দরখাস্ত লিখতে পারে না। কি বুঝবেন ? আই· আর· এইট· গ্র্যাজুয়েট। ও পাড়ার নন্দ গোঁসাইয়ের মেয়ে 'সংগীত প্রভাকর'। কিন্তু গান গাইতে বলুন, হয় বলবে সঙ্গে গানের খাতা আনি নি কিংবা হারমোনিয়ম কই ? আই· আর· এইট গায়িকা। ঐ বাড়িতে থাকে সতীশ বিশ্বেসের ছেলে সুবল। মাস্টার। কিন্তু আদ্ধেক দিন ইস্কুল যায় না, কী না পার্টি করে। ছাত্ররা আড়ালে প্যাঁক দেয়। অঞ্চল প্রধানকে দেখুন—চোর। পুলিশ ডাকুন কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এসেই ঘুষ খাবে তার পরে এসে বলবে মিউচুয়াল করে নিন। সব আই· আর· এইট·। মেকি। ভুয়ো। সাইপিয়ন মাছের মতো। আর কী সব ভাষা। আগে ইতর ছোটলোকেরা কথায় কথায় যেমন শকার বকার করত এখন লেখাপড়াজানা ছেলেরা সেইরকম ব্যাড মাউথ করে। শোনেন নি ?

: ব্যাড মাউথ ?

: হ্যাঁ। মানে মুখ খারাপ।

: এত সব আই· আর· এইটের ভিড়ে আপনি টিঁকবেন কি করে ? তাছাড়া নতুন ছেলেমেয়ে যদি সমাজের হাল না ধরে দেশ কি ক'রে এগোবে ?

: এই নিয়ে তুমুল তর্ক বাধে আমার সঙ্গে সন্তোষের। একেবারে বাইশ ক্যারেট সোনা ঐ ছোকরা। খুব আশাবাদী। ও বলে, সমাজ পাল্‌টাবে, মানুষ নাকি বদ্‌লে যাবে। আমি তো উল্টোটাই দেখি, পাল্‌টানোটা দেখি না। সন্তোষের মতো ছেলে আর কটা ? গাঁয়ে ঘুরুন। সব প্রিন্টেড টেরিকটনের বুকচেরা হাওয়াই শার্ট, ডোরাকাটা পাজামা আর হাওয়াই চটি। এ দেশের এই হলো ন্যাশনাল ড্রেস। যেমন কুচ্ছিৎ সমাজ তেমনি ছোকরাদের ড্রেস। কিন্তু একটানা তো ব'কেই যাচ্ছি। আপনার কথা তো কিছু জানলাম না। ধুতি পাঞ্জাবী পরে সভ্যসমাজে ঘুরে বেড়ান, আপনি তো মশাই সোনামুগের মতো দুর্লভ ভ্যারাইটি।

সোনামুগের উপমাটা বেশ নতুন। ব্যাখ্যা চাইলাম। বললেন এদেশে সোনামুগের বীজ নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। আর ফলে না। 'সোনামুগের ডাল

খেয়েছেন ? এক বাড়িতে রান্না হলে সারা পাড়ায় বাস ছুটত তার। কি করে আর খাবেন ? দেশটা ঘোড়ামুগে ভরে গেল। তা আপনি তো শিক্ষকতা করেন, সেখানে আই· আর· এইট· নেই ? থাকলেও অবিশ্যি আপনি চিনবেন না। যাই হোক আমাদের পাশের গ্রামে একটা ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুল হয়েছে, আশ্চর্য মশাই, যতদিন সায়েবরা ছিল ততদিন ইংলিশ মিডিয়াম ছিল না এত।'

: তা হলে হঠাৎ এত গজালো কেন ? আপনার কি মত ?

কালোসায়েব বললেন, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। এখন আমন ধানের চেয়ে জয়া-রত্নার কাটতি বেশি। রুই মিরগেলের চেয়ে বেশি চলে সিলভারকাপ। ইংলিশ মিডিয়াম তো ক্রসব্রিড ভ্যারাইটি, তেলাপিয়ার মত এখন খুব চলবে।'

চমৎকার ঝকঝকে কথার মাঝখানে কোথায় যেন নৈরাশ্যবাদ বোনা আছে ভদ্রলোকের। তাই বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে বললাম : সবই তো আপনার খারাপ লাগে। কিন্তু আমি যে-কাজটা করার জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরি সেগুলো কিন্তু জেনুয়িন। আপনি জানেন আমি কোন্ কাজে ব্যস্ত ?

: সে খুব জানি। সন্তোষের কাছে শুনেছি।

কালোসায়েবের ভঙ্গীতে কেমন একটা ঔদাসীন্য আর অবজ্ঞা আমার চোখ এড়ালো না। তাই খুঁচিয়ে তুললাম প্রসঙ্গটাকে আবার নতুন ক'রে। জিগ্যেস করলাম : আমার কাজটাও তাহ'লে আপনার পছন্দসই নয়। সেটাও কি আই· আর· এইট· ?

: কাজটা জেনুয়িন। আপনি মানুষটাও সোনামুগ। কিন্তু যে-গান খুঁজছেন তাতে অনেক ভেজাল।

: সে কি ? কেন ?

: তাহ'লে একটু বিশদ ক'রে বলি। বাউল বৈরাগীরা আগে ছিল সাধক ভক্ত। এখন হয়েছে ব্যবসাদার। পথে ঘাটে মেলায় ট্রেনে কারা বাউল গান করে দেখেছেন ? সব সাজানো বাউল।

বেশ চমকদার কথা। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকও বটে। সত্যি সত্যিই নকল বাউলও আছে বৈকি। ঘোষপাড়ার মেলায় দেখেছি। সাঁইবাবার মত চুল, গেরুয়া আলখাল্লা আর মাখন জিনের প্যারালাল পরা যুবক বাউল গাইছে। গান শেষ হ'তেই আলখাল্লা খুলে ব্যান্‌লনের লাল গেঞ্জি পরে আসরের কোণে বসে গঞ্জিকা সেবন করতে লাগলো। ঠিক ঠিক। আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম, 'আপনি আই· আর· এইট· বাউল বোঝেন কি ক'রে ?'

: প্রথমে আলখাল্লা থেকে।

: কী রকম ?

: কেন দেখেন নি ? গেরুয়া রঙের টেরিকটন বেরিয়েছে।

: সে কি ?

: হ্যাঁ। পরখ ক'রে দেখবেন। আই· আর· এইট· বাউল সব সময় গেরুয়া টেরিকটনের আলখাল্লা পরে। তার মানে কি ? জেল্লাদার, টেঁকসই, অ্যাট্রাকটিভ। একটা কথা শুনেছেন ? আগে বলতো, 'মন না রাঙায়ে বসন রাঙালি যোগী'। আমি কথাটাকে ঘুরিয়ে বলি কি জানেন ? বলি, 'বাউল না হয়ে বাউল সাজ্‌লি ভোগী'। কি, কেমন বানিয়েছি ?

আমি বললাম, 'বাঃ, বেশ বানিযেছেন তো। সত্যিই পথে ঘাটে মেলায় যেসব সৌখীন বাউল দেখি তাদের প্রধান কাজ হ'লো ভিক্ষে করা আর সেইজন্যেই তাদের ঐ রকম পোষাক'।

'আর অদ্ভুত সব উদ্ভট গান' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কালোসাহেব বলেন।

'উদ্ভট গান ?' আমি জিজ্ঞাসু হই।

'হ্যাঁ, উদ্ভটই তো। শোনেন নি ? আচ্ছা দাঁড়ান, আমার হিসেবের খাতায় একটু টুকে রেখেছি খানিক। পেয়েছিলাম লালগোলার ট্রেনে এক টেরিকটন-বাউলের কাছে। এই, এই যে পেয়েছি। শুনুন গানের কথাগুলো :

মন যদি চড়বি রে সাইকেল।
আগে দে কোপ্‌নি এঁটে অকপটে সাচ্চা কর দেল ॥
ফুটপিনে দিয়ে পা
হপিং ক'রে এগিয়ে যা,
পিনের পরে উঠে দাঁড়া
সামনে রাখ্‌ নজর কড়া
আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যান্‌ডেল্‌ ॥
সীটের পরে ব'সে
ব্যালান্স করবি কষে
মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল্‌ ॥

কি বুঝলেন ?'

: বুঝলাম যে এই গানটা হ'লো টেরিকটন-বাউলের গাওয়া একখানা সাচ্চা আই· আর· এইট· গান, তাই তো ?

একগাল হেসে বললেন কালোসায়েব, 'অনেকটাই বলেছেন। তবু একটু বাকি। এ গানের লেখক কে ? খোঁজ করলে দেখবেন ওটি রচনা কলকাতানিবাসী কোনো আই· আর· এইট· লোকগীতিকারের। সুর দিয়েছেন,

"খ্যাপা" নামধারী কোনো সিন্থেটিক ব্যক্তি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে একখানা কোলাবোরাটিভ স্কিম যাকে বলে। তাহলেই বুঝছেন আপনার কাজটি বেশ কঠিন।'

: 'কেন কঠিন ?'

: কঠিন নয় ? আপনাকে তো টেবিকটনের যুগে কটন খুঁজতে হবে। সে কি খুব সহজ ?

রাতে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কোথা থেকে কোথায় না এসে পড়েছি। নিছক একটা শব্দের টানে খুলে গেল কত না জগৎ। 'আন্‌খা মেয়েছেলে' কথাটা টেনে নিয়ে গেল এক সহজিয়া আখড়ায়, সেটা নাকি আবার অ্যাবরশন সেন্টার। সেখান থেকে যদি বা পড়লাম সন্তোষেব হাতে সে এনে ফেললো এক অদ্ভুত মানুষের কাছে। স্বচ্ছ চোখে যাব কেবলই ধরা পড়ে সমাজ-কাঠামোর বিপ্রতীপ চেহারা আর ভণ্ডামি, স্ববিবোধ আর কৃত্রিমতা। আই· আব· এইট-কে এমন আশ্চর্য প্রতীক আব প্রতিমায বাঁধা, এও কি কম অদ্ভুত ? সব মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

হযতো নতুন পরিবেশ ব'লে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙেছিল। সারা গা ঘামে জবজবে। উঠে বাড়িব বাগানে গিয়ে একটা আশশ্যাওড়া তুলে দাঁতন কবছিলাম এমন সময় সন্তোষ এল। নির্মল হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল : 'কেমন ডেরা বলুন তো ? কালোসায়েব আমাদের মানুষটা সোজা। শিরপ্যাঁচ নেই।' একটু থেমে· বলল, 'ভালো কথা। আপনি যে গ্রাম্য গান সংগ্রহ করেন কেমন গান সে-সব ? ধম্মে আমার ইন্টারেস্ট নেই। অন্য ধরনের গ্রাম্য গান আমার সন্ধানে আছে, নেবেন ?'

'সত্যি ?' আমি অবাক মানি। 'আমি তো অনেকদিন থেকে অন্য গান খুঁজছি। আমি বিশ্বাস করি দেহতত্ত্ব, শব্দ-গান আর ফকিরি গানের বাইরে নিশ্চয়ই একটা অন্য গানের জগৎ আছে। কিন্তু কোথাও পাই নি। তোমার কাছে আছে ? দেবে আমায় ?'

সন্তোষ বলল, 'আমার কাছে নেই, তবে আমার সন্ধানে আছে। যেতে হবে কড়েয়া গ্রামে। সাইকেল চড়তে পারেন ? সেখানে এক অন্ধ গায়েন আছে। নাম দোয়াতালি। যদি কপাল ভালো থাকে তবে পেয়ে যেতেই পারি।'

আমি বললাম, 'কেন ? অন্ধ যাবে কোথায় ?'

: ও তো বেশির ভাগ দিন সকালে বেরিয়ে যায় ভিক্ষেয়। বার্নিয়া, ধোপট এই-সব গ্রামে। ফেরে দিন গডালে, তার পরে খায়।

: সারাদিন ভিক্ষে ক'রে তার পরে আবার রাঁধে ?

: না না, ওর বিবি আছে। সুরতন্নেছা। সে অন্ধ। আমরাই দুজনের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। বেশ আছে। মাঝে মাঝে রাতে ওদের আস্তানায় থাকি, গান শুনি। সে-সব গান দারুণ। একেবারে অন্য রকম। চলুন চলুন দেরি করব না।

খুব তাড়াতাড়ি চা জলখাবার খেয়ে কালোসায়েবের বাড়ির সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কড়েয়ার পথ ধরলাম। জ্যৈষ্ঠের সকাল। তখনো বাতাস তাতে নি। কত কি ফুলের পাতার গন্ধমাতাল সকাল পেরিয়ে গপ্পে গপ্পে আমরা পৌঁছলাম দোয়াতালির বাড়ি মানে কুঁড়েঘরে। কপাল ভালো। অন্ধ বসেছিল দাওয়ায়। ব'লে উঠল, 'পায়ের শব্দে মনে হচ্ছে সন্তোষ। ঠিক কিনা ? সঙ্গে কে ?'

পরিচয়পর্ব মিটতে দোয়াতালি বললে, 'বাবু আমি গরিব, বড্ডা গরিব। তবু এয়েছেন যখন কিছু খান। কিছুই নেই আমার। আছে ক'খানা তালগাছ। কটা তালশাঁস খান। দাও গো বাবুদের ক'টা তালশাঁস।' দোয়াতালির বিবি সুরত আমার সর্বাঙ্গে তার অন্ধ চোখের মায়া বুলিয়ে বলল, 'বোসো বাবাসকল। একটু জিরোও। ও মানুষটা অমনিধারা চিরকাল। শুধু তালশাঁস কাউড়ে দিতে আছে ? সঙ্গে এট্টু বাতাসা সেবা করুন আজ্ঞে।'

বেলাও বাড়ে। টুকটুক ক'রে দু-চারজন গাঁয়ের লোক জমে। 'গানের গন্ধ পেয়েছে সব' দোয়াতালি সগর্বে বলে। তারপরে একতারা কাঁধে তুলে গেয়ে ওঠে :

আরে তানা না তানা না না।
ওরে মুষ্টি ভিক্ষে ক'রে আমি খেতে পাই নে উদরপুরে।
ও মন লয়ে ঝুলি মনের খেদে বেড়াই লোকের দ্বারে দ্বারে ॥
বাড়ি বাড়ি হাঁটব কত
ভুত খাটুনি খাটব কত
রোদে পুড়ে মরব কত
মনের দুঃখ কই কারে ॥
আমার ঘরেতে বোষ্টমী আছে
পণ-কাঠা চাল চিবিয়ে মারে।
তিনি দেবী আমি দেবা
আমি করি ঠাকুরসেবা
বলেন আমায় ঠাকুরবাবা
শুনে বড়ই রাগ ধরে।
তিনি সদাই বলে 'খাবো' 'খাবো'

কোথায়.পাব খাওয়াই তারে ?

গান শুনে সুরতন্নেছা কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বললে, 'সন্তোষ, তুমি এ গান বিশ্বেস করলে ? আমি কোন্ সময়ে 'খাবো' 'খাবো' বলেছি । আমি পণ-কাঠা চাল চিবিয়ে মারি ? পণ কাঠা চাল কোনদিন চোখে দেখেছ ড্যাক্‌রা কানা ?'

দোয়াতালি হেসে বললে, 'এ এক জ্ঞানছাড়া মাগীর পাল্লায় পড়েছি যাহোক । সন্তোষ, তুমি এ কোন্ এঁটুলি লাগিয়ে দিলে আমার আলাভোলা জীবনে । এর রসকষ নাই । গান বোঝে না । আরে কানী, এ গান কি আমার রচা ? এ তো কুবির গোঁসাইয়ের রচনা ।'

সন্তোষ বলল, 'তোমাদেব এই কানা বক আর শুকনো নদীর কাজিযা আমি শুনতে চাই না । দোয়াত, তুমি মানুষের গানের পরে এবাবে ফলের গান একটা শোনাও ।'

'সবই তো মানুষের গান আজ্ঞে', দোয়াতালি বলে, 'ফল তো খোদা মানুষের জন্যই বানিয়েছে । নইলে ফলের আর মূল্য কি ? তবে হ্যাঁ খোদার সব চেয়ে হেকমতি এই মানুষরূপ ফল বানানোতেই । শুনুন তবে—

গাছে ফল ধরালে বারএলাহি কুদবত তাহাবি ।
প্রথমে দুই গাছেতে এক ফল ধরায
দ্যাখো না মক্কর ভাই—
সেই ফলের খাতিরেতে নানা প্রকার ফল তৈয়ার ॥

এই পর্যন্ত গেয়ে দোয়াতালি বলল : সুলতান আছ নাকি ? বাবুকে গানটাব মানে ব'লে দাও দিনি ।

সুলতান ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বলল : বাবু, বারএলাহি হলেন কিনা আল্লা । কুদরত মানে ক্ষ্যামতা । দুই গাছ মানে আদম আর হেবা । মক্কব মানে কারিকুরি । আর ফল মানে মানুষ ।

সন্তোষ বলল : তার মানে আল্লা তাঁর কারিকুরি আর সৃষ্টি ক্ষমতায় প্রথমে আদম আর হেবার সৃষ্টি করলেন । সেই দুজন হ'তে জন্মালো মানুষ । আর সেই মানুষের জন্য নানাপ্রকার ফল তৈরি হলো । কেমন কিনা ?

'যথার্থ, যথার্থ' দোয়াতালি বলে উঠল সোচ্ছ্বাসে, 'শিক্ষিত লোকের জ্ঞানবুদ্ধি একেবারে পরিষ্কার । যাক, এবারে বাকিটুকু শুনুন ধীরে ধীরে । সুলতান তুমি বাবুর কাছে-ভিতে থাকো । মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দেবা । শোনেন—

ধান্য গম আর কলাই তিলে
খুশি ভাই হই নারকেলে
আবার কতজনার পুলক তালে

আছে বেগুন ঝিঙের তরকারি।
পটল করলা আর টোপা কুল
টক রাঁধার আছে তেঁতুল
টকমিষ্টি লেবু মাকুল
সস্তার ডাল খেঁসারি।
মরিচ ধনে মৌরি জিরে
এই কয় ফলের মসলা হয়
কলা আইড়ি লাউ লালিম
শশা পেঁপে রেঁধে খায়।
আবার রাই সরষে তিসি গাঁজা
এই চারফলে তেল তৈয়ার।

আমার সামনে খুলে যায় এক স্পন্দমান মানুষের জগৎ। জীবন রস-সম্পৃক্ত এক ভোজন সচেতন সমাজের ছক। দোয়াতালি অবশ্য থেমে নেই। অনাবিল তার কণ্ঠ গেয়ে যাচ্ছে :

কদবেল আর খিরো জামির
পানিফল আর করঞ্চা
চালতা খেজুর খরমুজ ডালিম
লিচুর চাই খোসাবাছা।
কদু ভুরো গ্যামা মেরো
শেয়াল-ল্যাজা আদরকি।
মিহির দানা জার্জির ভুট্টা
চেঁপের ফল হয় মোটামোটা।
কেলেজিরে হলুদ মেথি
জাম পোস্ত তোকমারি।
কাঁকরোল খায় ভর্তা করে
বৈঁচি ফল খায় যুবান তরে
খায় হরিতকী পানের পরে
চন্দনী হজমিকারী।

গান হয়েই চলে। শ্রোতারা যতটা আবিষ্ট, দোয়াতালিও ততটা। কিন্তু আমার মনে হল এখানে আমার ভূমিকা কি ? এই গ্রামীণ জগতে কি আমি খুবই বেমানান নই ? সত্যিই তো এর মধ্যে কত ফল শস্যের নাম আমি জানি না। আমাদের শহুরে জীবন প্রকৃতই কত সম্বৃত কত সীমায়িত। আলাদা ক'রে সব

শস্য মনে রাখা বা তার ব্যবহারবিধি সম্পর্কে আমাদের চেতনা কি খুব সজাগ ?

এর মধ্যে এক সময়ে ফলের গান শেষ হয়ে শুরু হয়ে গেছে লোহার গান সেও কি কম বিচিত্র ? সে গানের গোড়াতেই এক ধাক্কা :

বাঁশের দ্রব্য গঠন যত লোহা ভিন্ন নয় ।
লোহার বাঁশ না কাটিলে
অমনি ঝাড়ে রয় ।

সত্যিই এ কথাটা এমন ক'রে কখনো ভাবি নি । লোহার প্রথম কাজ বাঁশ কাটা । সেই বাঁশ দিয়ে তবে খোড়ো চালের খুঁটি আর বাতা, গরুর গাড়ির দেহ, মাচা, ছই । এমনই কত-কি । দোয়াতালির গান লোহার হরেকরকম ব্যবহারকে বিশদ ক'রে চলে :

লোহার গাছ কাটা দা কুড়ুলে
শাবল আর খোন্তার ফালে
চিচ্‌কে ছুঁচে নিড়েন কাচি
ডেডো কোদালে ।

সুলতান পাশে দাঁড়িয়ে বলল : বাবুর বোধ হয় বুঝতে একটু ধন্দ লাগছে । শোনেন তবে । চিচ্‌কে মানে পটল পোড়াবার শিক । গ্রামদেশে গরিব মানুষ তেল খেতে পায় না তাই পটল পুড়িয়ে খায় আজ্ঞে । কাচি মানে ধান বা গম কাটার যন্তর । এবারে শোনেন লোহার আরো কেরামতি—

সে হয় লাঙলের ফাল
পাসি আর গজাল ।
বল্লম সড়কির ফলি বাঁশ বাটালি
উকো কেঁকো টেঁকো
মাকু চাকু ছুরি বঁড়শি কাটারি ।

সুলতান বলল : পাসি হলো যেখানে লাঙলের ফাল আঁটা থাকে । কেঁকো হলো মাছ মারার যন্তর । আবার শুনুন—

তুরপুন ঘুরপুন র‍্যাঁদা ঘিস্কাপ
নেহাই হাতুড়ি
বাউলহাতা কাজললতা
চোরের পায়ে বেড়ি

'বাঃ বাঃ চমৎকার' সন্তোষ ব'লে উঠল । 'চোরের পায়ের বেড়ি পর্যন্ত ? বাপ রে । কিন্তু বাউলহাতা কি গো ? ওটা তো আমিও চিনলাম না ।'

: বুঝলেন না ? গাঁ-ঘরে বাউলহাতা দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করে । কিন্তু

ওদিকে গান যে বয়ে যায়, শোনেন—

সন্না আর বাণ বন্দুক কামান
ছেকল বিদের কাঠি কড়ার বাঁট
হাঁসকল ডোমানি হুলোগুলো বিদে বাওলে
ভোমর বাদারি।

সুলতান বললে : কী বাবু, আবার ধন্দ লাগে নাকি ? তবে বুঝে নেন। হুলোগুলো থাকে ঢেঁকির মুগুরের মাথায়। ভোমর বলে মুচিরা যা দিয়ে জুতো সেলাই করে। আর বাদারি দিয়ে চামড়া ছোলে। নাও গো দোয়াতালি এবারে লোহার গান সাঙ্গ করো দিনি। এখনো পাখির গান বাকি। সেটা না হয় আমিই গাইব খুনি।

লোহার হন্দরেতে পাথর গুঁড়ো হয়
নরসুন খরসুন ক্ষুর কাঁচিতে কাটে চুল
নেটকা সারা জলুই পেরেক
ছাতার শিক আর শূল।
জাহাজে টাঙায়ে নোঙর দরিয়াতে রয়।

সুলতান বললে : বাবু, নরসুন মানে নরুন। আর খরসুন দিয়ে ঘোড়ার গা আঁচড়ানো হয়। কিন্তু এ গান এখন চলবে অনেকক্ষণ। আপনাদের এ গান ভালো লাগবে না।

আমি সন্তোষকে একপাশে ডেকে বললাম : তুমি এ-সব গানে কি পাও ? কোনো গভীর সংবাদ এ গানে কই ?

সন্তোষ বলল : গ্রামীণ সমাজবদ্ধতা, বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে অভ্রান্ত জ্ঞান, ব্যাপক মানুষের প্রয়োজনের দিকটা কি খুব বাদ দেওয়া যায় ? আপনি লক্ষ করেছেন যে আমাদের চেয়ে গ্রামের মানুষ গানটা অনেক বেশি এনজয় করছে। এর কারণ কি বলুন তো ?

আমি বললাম : এর কারণ ওদের চেনাজানা জগতের পরিধি তো খুব ছোট। জীবনের চাপে রুজির ধান্দায় তা আরো ছোট হয়ে যায় দিনে দিনে। এ-সব গানে তাদের ব্যাপ্ত জীবনের স্মৃতি ধরা আছে। আমরা যেমন বাপ-ঠাকুর্দার আমলের সমৃদ্ধির খবর জানতে ভালোবাসি এও তেমনি, নয় কি ?

: অনেকটাই হয়তো তাই। কিন্তু গ্রামীণ জীবনের আয়োজন শহরের চেয়ে অনেক বড় মাপের। তাদের কৌতূহল সবটা জানবার। যেমন শহরের মানুষ জানে ধান থেকে চাল হয়, ব্যাস। গ্রামের মানুষ প্রথমে ধানের বিছন নিয়ে ভাবে, তার পর জমি তৈরি, সার দেওয়া, ধানের মাদা তৈরি করা, তারপরে রোয়া,

তারপরে ধানের ফলন, ধান পাকা, তাকে তুলে এনে গোলাজাত করা, তাকে সেদ্ধ করা, ভানা পর্যন্ত সবটা জানে। সব কটা স্তর তাদের কাছে সমান জরুরি। এর সঙ্গে আছে যন্তরপাতির ভূমিকা। লাঙ্গল বিদে মই হেঁসো ঢেঁকি চালি সবকিছু বিষয়ে থাকতে হয় সতর্ক। যত্ন নিতে হয় বলদজোড়ার। তার খাদ্যের জন্যে ধানের খড় মজুত রাখতে হয়। বোধহয় গ্রামের গানে সেইজন্যে এত ডিটেইল্‌স্ থাকে।

: একেই কি বলে অ্যাবান্‌ডেন্স ? যাক গে, এবার শোনা যাক পাখির গান।

ততক্ষণে দোয়াতালি গান শেষ ক'রে বিড়ি ধবিয়েছে। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে এবারে ধরলো খুব লম্বা তান মেরে সুলতান ·

আরে আরে আরে বে রে রে—
ফাঁদ না এড়ালে পাখি যাবি মরে বে
বিঘোরে রবি পড়ে।
আউল পাখি টিটি শালিক দোয়েল কোয়েল টাকসোনা
কালিময়না কাকাতুয়া ভীমরাজ টিয়ে চন্দনা।
পায়রা ঘু ঘু কাদাখোঁচা
হট্টিটি আর পাছানাচা
ঐ যে হলদে চড়ুই হাঁড়িচাঁচা ফাঁদেতে নেবে ধরে ॥

আমি সন্তোষকে বললাম, দেখলে তো গ্রাম্য গীতিকারের চিন্তার মৌলিকতা। পাখি সম্পর্কে গান লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়লো, ফাঁদ এড়াতে না পারলে পাখি বেঘোরে মরে। তাহলে পাখিদের বাঁচার প্রথম বাধা মানুষের তৈরি-করা ফাঁদ। যাক, এবারে গানের অন্য অংশ :

চিল ঠোক্কর রঙ্গিকাক হরমতী আর বাজপাখি
পাখিতে পাখি শিকার করে
আমি তা স্বচক্ষে দেখি।

সন্তোষ বললে, এবারে দেখুন আরেক কনট্রাডিকশন। পাখিতেই পাখি শিকার করে। বলতে গেলে এটা জীবজগতেরই কনট্রাডিকশন। মানুষই তো মানুষ মারে নানাভাবে। কিন্তু থাক ওসব কচকচি। আগে গানটা শুনি। ভাল লাগচে বেশ। বলুন ?

হুদহুদ আর পরিওল শরবনে বাস সেজারু
শালবনে এক পাখি আছে নামটি তার শালতরু।
বউ কথা কও কোকিল ঐ
শব্দ শুনে সুখী হই

ফুলের মধু খায় যে সদাই কুচপাখি বলে তারে ॥
বাঁশপাতা মাছরাঙা পাখি পানকৌড়ি জলপিপি
উড়োবক ছিঁয়াছুড় কিস্তে চোরা এরা বগা মানিকজোড়া

সন্তোষ বলল : আপনি অ্যাবানডেন্সের কথা বলছিলেন না ? নেচারস্ ওন অ্যাবানডেন্স। এখন শুধু গ্রামেই পাবেন এ-সব। কত সব পাখি আমাদের দেশে। আর কি আছে এতরকম পাখি ? প্রায় একশো বছর আগে আর্জান শা এ গান লিখেছিলেন। মনে রাখবেন তখনও দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। বাতাস বিশুদ্ধ ছিল। জমি আর জলা এত হতশ্রী হয়নি। গাছে পাকা ফল থাকত। পাখিরা তো এ সবেই বাঁচে।

সুলতান গায় নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে :

মতিরাবাস বুলবুলি গগন আর ভেটকুল্লি
সংসারের শুক পাখি তুই থুলি আর মুইথুলি।
আবার কাঠঠোকরা কুকো পাখি
ময়ূর চড়াই আর বাবুই
আবাবিল করবটে ফিঙে গড়ুল খড়খণ্ডে ধুলো চটুই।
লালমোহন আর বীরাজ পাখি
হংস সরাল চকাচকী
বেঙাবেঙি ধনেশ পাখির হাড় দেয় কোমরে ॥

গান এগিয়ে চলে আপন গতিতে। আমি ভাবলাম এসব পাখি আর সত্যিই কি আছে ? অকৃত্রিমভাবে ? সন্তোষ বলল, 'কি ভাবছেন ?'

বললাম : কী জানি কেন, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল কালোসায়েবকে। এ-সব পাখির মধ্যে আই. আর. এইট কোন পাখি ঢুকে পড়ে নি তো ?

সন্তোষ হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

ইতিমধ্যে গানের আসর আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে লাগল। বেলাও বাড়ছে। তা ছাড়া গান শুনলেই তো পেট ভরবে না। কাজের মানুষগুলো তাই যে যার কাজে গেল। কেবল একজন আমার কাছে এসে খুব নিচুস্বরে বলল : বাবু, আপনাদের কথা সব শুনেচি। তাই বলছি এ গানও কিন্তুক খাঁটি গাঁয়ের মানুষের মনের গান নয়। সে গান শুনতে হলে আপনাকে একজনের কাছে যেতে হবে ও-পাড়ায়। যাবেন ?

সন্তোষকে রেখে আমি একাই গেলাম। পৌঁছনো গেল একটা মেটে দাওয়ায়। সেখানে একজন মাঝবয়েসী খুব নিস্পৃহমুখে বসে আছে যেন কত

তিতিবিরক্ত। তবে আমার সঙ্গীকে (যার নাম অরুণ) দেখে তার মুখে একটা চাপা হাসি খেলে গেল্। অরুণ বলল : চাঁদুদা, এ ভদ্রলোক খাঁটি গ্রামের গান খুঁজছেন। দোয়াতালি ওঁকে সেই কবেকার ফল পাখি লোহার গান শোনাচ্ছিল। আমি ওঁকে ধরে আনলাম। এখনকার একটা সত্যিকারের গ্রামের গান ওঁকে শুনিয়ে দেবেন নাকি ?

চাঁদুদা বললেন : সত্যিমিথ্যে বলতে পারব না বাবু। আমাদের মামার বাড়ির অঞ্চলে অর্থাৎ নলদা, টুঙ্গী, শব্দনগর, পলাশীপাড়া, সায়েবনগরে চোত মাসের সংক্রান্তিতে ছেলেরা 'বোলান' ব'লে একরকম গান গায়। হালফিলের ঘটনা নিয়ে তাতে থাকে 'রং পাঁচালি' ব'লে একরকম জিনিস সেরকম একটা নমুনা শুনবেন কি ? তাতে কিন্তু কোনো জ্ঞানেব কথা নেই। তবে সত্যিকথা আছে। শুনুন তাহলে।

চাঁদুদা এর পর সোজা তাকালেন আমার দিকে। বললেন : গবরমেন্ট সব গ্রামে গ্রামে হেলথ সেন্টার করেছে জানেন তো ? সেখানে অপারেশান হয়, যাতে মানুষ আর না জন্মায়। তাই নিয়ে একটা গান হলো এইরকম :

আরে ঐ মানুষ-কাটা কল উঠেছে ভাই
তোরা কে দামড়া হবি আয়।
দামড়া করার হেকিম আছে পলাশীপাড়ায়।

যেন সপাং করে চাবুক পড়ল মুখে। জ্যৈষ্ঠের সেই আতপ্ত বেলায় আমি লজ্জায় মুখ নিচু করলাম।

মানুষের জীবনে কোন্ কারণে যে কার সংসর্গ ঘটে তা কে বলতে পারে ? আমার নিজের যে জড়বুদ্ধি মেয়েটি আছে তাকে সুস্থ করবার জন্যে একসময় মরীয়া হয়ে কী না করেছি, কোথায় না গেছি। কলকাতার সবচেয়ে ভিজিটঅলা প্রথম শ্রেণীর স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ থেকে তৃতীয় শ্রেণীর গ্রাম্য হেকিম পর্যন্ত ধাওয়া করেছি। সেবার আমাদের শহরে একজন বাক্‌সিদ্ধ ফকির এসেছিল। ও-সবে একদম বিশ্বাস করি না। তবু স্ত্রীর অনুনয়ে আর প্রতিবন্ধী সন্তানেব করুণ মর্মান্তিক মুখখানা দেখে ফকিরের কাছে না গিয়েও পারি নি। এ-সব জায়গায় গেলে মানুষের অসহায়তা আর আধিব্যাধির দারুণ বিস্তার দেখলে চমকে যেতে হয়। ফকিরকে ঘিরে অন্তত শতখানেক পুরুষ-নারীর ভিড়। বেশির ভাগই বাপ মা। সন্তানের আরোগ্যের প্রার্থনা তাদের। কী সজল তাদের ভাষা, কী সকাতর আবেদন ! 'বাবা, আমার ল্যাংড়া ছেলেটা হাঁটবে তো ?' 'বাবা, আমার মেয়ের বাক্‌শক্তি দাও দোহাই', 'বাবা আমার ছেলেটার মাথা আর কি ভালো হবে না ?' 'আমার মেয়ের মৃগীনাড়া কি সারবে না ? ও বাবা'।

ফকির উদাসভঙ্গিতে বলেন : তাঁর ইচ্ছেয় জগৎ চলে। আমি কি করতে পারি ? সবই তাঁর নিজের হেকমৎ। আমি তাঁর নামে ওষুদ দিই। সারার হয় সারবে। তাঁর নাম করো। তাঁকে ভাবো।

ঐ প্রচণ্ড ভিড়ে আমি কি বলব ? কোলে আমার নির্বোধ মেয়ে আপন মনে দোল খাচ্ছে। নেহাৎ কৃপা হলো, ফকির তাকালেন আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন : 'ফলটা কার ? আপনার নিজের ?'

যেন চমকে গেলাম। ফল ? ফল শব্দের এমন ব্যঞ্জনা কখনো ভাবি নি। সন্তান কিনা ফল। কর্মফলও কি ? সায় দিয়ে ঘাড় নাড়তে বললেন : ছেলেটার কী রোগ ?

: ছেলে নয়, মেয়ে।

'যে ছেলে সেই মেয়ে' ফকির হাসলেন, 'সব তাঁর সৃষ্টি। কেবল ছাঁচ আলাদা। কর্ম আলাদা। ভগমান ওকে বোধ দেয় নি। তাই না ? আমার কাছে কিছু হবে না। তবে রানাবন্দের শ্যাওড়াতলা চেনেন ? সেখানে আহাদ ফকিরের থান আছে। ভক্তি ভরে হত্যে দিলে এ সব রুগী ভালো হয়। আমি নিজে জানি।'

রানাবন্দ তো খুব দূরে নয়। আমাদের শহর থেকে সোজা বাস যায় সেখানে চাপড়া হয়ে। অসুখ বিসুখের জন্যে হত্যে না হয় পরে দেওয়া যাবে, আপাতত জায়গাটা দেখেই আসা যাক, এই মনে করে একদিন সকালে রওনা হওয়া গেল। পথে যেতে যেতে যাত্রীরাই অনেকটা জানিয়ে দিল। খুব নাকি জাগ্রত থান। 'আহাদ ফকিরের নাম এ দিগরে কে না জানে বলুন ? কার না মানসা পূরণ হয় নি কহেন ?' বললেন একজন। চাপড়া বি. ডি. ও. অফিসের কর্মচারী যুবকটি পাশ থেকে বললেন : 'আহাদ নামটা শোনা শোনা লাগছে যেন ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই একজন ফকির, যাকে মার্ডার করেছিল কারা, তাই না ?'

মার্ডার ? ফকির হত্যা ? আমি নড়েচড়ে বসি।

রানাবন্দে এসে বাস থামল। এখানেই বাস যাত্রা শেষ। এখান থেকে ছোট একটা নদী পেরিয়ে ওপারে শ্যাওড়াতলা। পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দশটা। একটা নির্জন জায়গা, গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। ছোট দু-একটা চালা, একটা বেদী। এখানেই আহাদ ফকির বেশির ভাগ বসতেন।

'তবে বসতেন যখন তখন দু পায়ের পাতা হাত দিয়ে ঢেকে রাখতেন' বললেন এক বৃদ্ধ ভক্ত।

: কেন ? কেন ?

: যাতে কোনো ভক্ত তাঁর পা ছুঁতে না পারে। প্রণামে তাঁর বড় আপত্তি

ছিল।

: আপনি জানলেন কী করে ?

: কী আশ্চর্য ! আমি যে তাঁকে স্বচক্ষে ঐ বেদীতে বসতে দেখেছি। এই আপনাকে যেমন দেখছি।

একজন এগিয়ে এসে বলল : আহাদসোনাকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ছামাদ আলী আরেকজন ওয়াছেফ আলী। ইনি ওয়াছেফ সাহেব।

আমি অভিবাদন ক'রে বলি : আহাদ ফকির কি খুব পুরনো কালের নন ?

: খুব পুরনো কই আর ? বাংলা ১৩৬৫ সনের ১০ই মাঘ তাঁর ইন্তেকাল হয়। তার মানে তেত্রিশ বছর আগে। আমি তখন জোয়ান।

তেত্রিশ বছরের মধ্যে কিংবদন্তী ? খুব বড় জাগ্রত ফকির ছিলেন বোধ হয়। কী আশ্চর্য, আহাদ সম্পর্কে কিছুই জানি না যে ! কী ভাবে জানা যায় ? ওয়াসেফ আলীকেই ধরতে হবে ভাবছি, এমন সময় বেদীর কাছে ব'সে গৌরকান্তি এক গায়ক গান ধরল। একজন আমার কানে কানে জানান দিল, 'বাবু, এ গাহক খুব নামী। এর নাম জহরালী। আমাদের পদ্মমালা-রানাবন্দের একেবারে একচেটিয়া গাহক।' খোলা গলায় আন্তরিক সুর উঠল :

ঝকমারি করেছি আমি প্রেম করে কালার
হার হয়েছে বুড়ো মিন্‌সে আমার গলার।
নবীন ছোকরা আমার স্বামী কোনোমতে নাইকো কমি
বুড়োর জন্য ছাড়লাম আমি অষ্ট অলংকার ॥
বুড়োর সঙ্গে প্রেম ক'রে দিবানিশি নয়ন ঝরে
একবার এনে দেখাও তারে জুড়াক জীবন আমার।
দেখ দেখি সই আগবেড়ে আমার বুড়ো আসছে কতদূরে
আমি থাকতে আর পারি নে ঘরে চেয়ে আছি আশায় তার।
হে কালী দয়াল আমার বুড়োকে রেখো যত্ন করে
আমায় যেতে যেন না হয় ফিরি মুর্শিদ গো
সেই নবীন ছোকরার ঘরে ॥

এমন অদ্ভুত বৈষ্ণব বিশ্বাসের গান কখনো শুনি নি। এখানে কালা মানে যদি হন কৃষ্ণ তা হলে সমস্ত গানে তাকে বুড়ো বলাটা খুব নতুন সন্দেহ নেই। গানটি সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করতে ওয়াসেফ বললেন—'এ গানখানা আমাদের গুরু অর্থাৎ মহামান্য আহাদ শাহ্ প্রায়ই গাইতেন। তাঁর খুব পছন্দ ছিল গানখানা। আজ্ঞে না, কবে লিখা জানি না সঠিক।'

কথায় কথায় জানা গেল এখানে এই শ্যাওড়াতলায় প্রতি বছর অম্বুবাচীতে

একটা প্রকাণ্ড মহোৎসব হয়। যতলোক এখানে মানসিক করে তারা আসে। সকলের দেওয়া চাল ডাল তরকারিতে সারা দিনরাত অন্নমচ্ছব হয়। সমস্ত দিন চলে হাপু গান, শব্দ গান, ধুয়োজারী গান। সারারাত বসে ফকিরি গানের আসর। কিসের এত জনপ্রিয়তা? আহাদের কার্যকলাপ কেমন ছিল। আহাদ শাহ্ কি বাউল না দরবেশ?

এবারে ওয়াসেফ আলী বিশদ হলেন : না বাবু, তিনি বাউল ছিলেন না। ছিলেন সুফীফকির। তাঁর জীবনকথা আমি যা জানি বলতে পারি।

: বলুন তো।

: পাশেই রানাবন্দ গাঁয়ে তাঁর জন্ম। বাবার নাম মাদারী, মার নাম অমেত্য। খুব গরিব মানুষ। পর পর সাতটা মেয়ে-সন্তান জন্মাতে সোয়ামী স্ত্রী আল্লার কাছে দোয়া মাঙলেন একটি পুত্র-সন্তানের জন্যে। মানসা করলেন সেই ছেলে জন্মালে তাকে আল্লার নামে উৎসর্গ করবেন। আল্লার ইচ্ছায় মান্‌সা পূরণ হলো। পুত্র-সন্তানের নাম রাখলেন আহাদ।

: আহাদ কথার মানে কি?

: আরবী ওয়াহেদুন্ শব্দ মানে এক। তার থেকেই আহাদ। যা হোক গরিব সংসারের অভাবী সন্তান আহাদ। পরের বাড়িতে রাখালী করতে লাগল। তবে আহাদ ছিলেন ছোট থেকেই বিনয়ী ধর্মভীরু উদাস স্বভাবের। তার পরে বয়স যখন আন্দাজ পনেরো যোলো তখন চন্দ্রকান্ত পরামানিকের বাড়ি কৃষাণীর কাজে লাগলেন।

আমি জানতে চাইলাম রাখালী আর কৃষাণীতে তফাৎ কি?

ওয়াসেফ আলী বললেন : শহুরে মানুষ আপনারা বাবু। আমাদের গ্রামদেশে চাষবাস গরুচরানো ছোটদের বলে রাখাল আর বয়স্ক রাখালদের বলে কৃষাণ। তা ঐ কৃষাণী করতে করতে আহাদ খবর পেলেন লোকমুখে যে বালিউড়ো-ভিটের গাঁয়ে আছেন এক পীর। ব্যাস। সারাদিন কৃষাণী করেন আর সন্ধে থেকে চলে যান পীরগুরুর কাছে। এদিকে বাবা মা জোর করে আহাদের বিয়ে দিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বাবা-মার ইন্তেকাল হলো, সহধর্মিনীও গেলেন সর্পাঘাতে। সব বন্ধন গেল ঘুচে। আমার গুরু তখন এই শ্যাওড়াতলায় এসে আসন গাড়লেন, আশ্রম বানালেন। সারাজীবন কোথাও যান নি আর।

আমি বললাম : প্রথম যেদিন শ্যাওড়াতলায় এলেন সেদিন থেকে আর কোনোদিন কোথাও যান নি এ কি আপনার শোনা কথা?

: ছোটবেলা থেকে কথাটা শুনেছি, তা ছাড়া যতদিন জীবিত ছিলেন আমি তো স্বচক্ষে কোথাও যেতে দেখি নি। আর একটা আশ্চর্য জিনিস আমরা তাঁর

শিষ্যরা দেখেছি। তাঁকে কেউ কখনো স্নান করতে, খেতে, বসন পালটাতে বা পায়খানা প্রস্রাব করতে যেতে দেখি নি। চোপর দিনরাত থেকেও লক্ষ রেখেছি। এমনকি··· কথাটা কি বিশ্বাস করবেন ?

: বলুন বলুন। শুনতে খুব ভালো লাগছে।

: আমার নিজের চোখে দেখা সেই বাংলা ১৩৪৫ সালে যেবাব বন্যে হয়ে সব দিগর ডুবে গেল তখনও তিনি ঐ গাছতলা পরিত্যাগ করেন নি। চারিদিকে জল থই থই করছে। তার মাঝখানে তিনি কোমরে দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে ব'সে থাকলেন। শিষ্যরা একখানা কলার মাড় তৈরি করে তাঁকে উদ্ধার করতে এলে তিনি বললেন—– 'দয়াল আমারে ভাসতে দিয়েছেন, তাই ভাসছি। তোমরা বাড়ি যাও।'

সম্ভ্রমে হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন ওয়াসেফ সেই বিদেহী ঐশীপুরুষের সম্মানে। তার পর বিগলিত স্বরে বললেন : মহামান্যমান মানুষ ছিলেন তিনি। বাক্‌সিদ্ধ। যা বলতেন তাই হতো। যে যা আন্তরিক ভাবে মান্‌সা করত ফলে যেত। তাঁর থানে এখনো হত্যে দিলে রোগ সারে। দেখুন কতজন পড়ে আছে।

সত্যিই তাই। আহাদের বেদীর সামনে অনেক নারী-পুরুষ সাষ্টাঙ্গে পড়ে আছে। এর কি সবটাই মীথ না সত্যি কে বলবে ? শান্ত ছায়াসুনিবিড় সেই আশ্রমের স্নিগ্ধ পরিবেশে খুব বড় নাস্তিকের মনেও দ্বিধা আসে। আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু মেয়ের করুণ মুখ। দুর্বল মনকে শক্ত করে শেষ তৃণাশ্রয়ের ভঙ্গিতে বলি : আপনি নিজে দেখেছেন কাউকে সারতে ? নাম বলবেন তার ?

'বাবুর সন্দ কাটে নি', ওয়াসেফ হেসে বলেন, 'তা হ'লে আপনাকে দুবরাজের বিত্তান্ত বলতেই হয়। শোনেন। দুবরাজ ছিলেন আমার গুরুর প্রথম শিষ্যা। তাঁকে আমি দেখেছি অম্বুবাচীর ঘি-খিচুড়ির জন্যে ঘি নিতে আসতে।'

: দুবরাজের বাড়ি কোথায় ছিল ?

: ঐ বড় আন্দুলের কাছে নূতনগ্রাম-কেশবপোঁতায় ছিল তেনার ভিটে। খুব অল্প বয়সে বালিউড়ো-ভিটের-গাঁয়ে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু শরীরে ঢোকে কুষ্ঠ ব্যাধি। সর্বাঙ্গ খসে পড়তে থাকে। সোয়ামীকে আবার বিয়ে করতে ব'লে চলে আসেন শ্যাওড়াতলার ফকিরের আস্তানায়। মাঝরাতে তার কান্না শুনে ছুটে আসেন গুরু। জিগ্যেস করেন 'কে তুমি মা ?' সব শুনে বলেন 'তাঁকে ডাকো যিনি দিলেন এই কালব্যাধি।'

: সত্যিই দুবরাজের কুষ্ঠ সেরে গেল ?

· একদম সেরে গেল। আমার নিজের দেখা। এ আশ্রমে সবাই তাঁকে 'মা'

বলে ডাকত। এই তো সেদিন মারা গেলেন জননী। হ্যাঁ, সেও এক আশ্চর্য! আহাদ গেলেন ১৩৫৬ সনের ১০ই মাঘ আর দুবরাজ মা মাটি নিলেন ঠিক একবছর পরে ঐ ১০ই মাঘ তারিখেই। আশ্চর্য নয়?

আশ্চর্য তো অনেক কিছুই। আণবিক যুগের বৈদ্যুতিক কৃৎকৌশলের মধ্যে আমাদের দেশের লৌকিক দেবীর পূজার ঘটা কিছুই কমে নি। বাউল ফকির দরবেশ গোঁসাইদের বার্ষিক মচ্ছবেও কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। প্রতি গ্রামে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুললেও দেখা যাবে একই রমরমায় চৈত্র মাসে শেতলা পুজো হচ্ছে, শ্রাবণে হচ্ছে মনসা পুজো। তফাতের মধ্যে কেবল ঝাঁপান গানের বদলে মাইকের তারস্বর চিৎকার আর মেলার নানারকম বিক্রয় দ্রব্যের মাঝখানে লাল শালু মোড়া একখানা বামপন্থী গ্রন্থবিপণি। গ্রাম্য দেবদেবী পুজোয় আরেকটা নতুনত্বের কথা বলেছিলেন ব্রহ্মাণীতলার সুদেব সেনশর্মা। বলেছিলেন—'চিরকাল দেখেছি মশায় আমাদের এই মনসা পুজোয় ভোজ দেওয়া হয় পাকা কাঁঠালের কোয়া দিয়ে। তবে আজকাল মা মনসার মুখ বদল হচ্ছে। তিনি খাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের বাম্‌পার ক্রপ আনারস আর গঙ্গাসাগরের তরমুজ।' এও কি কম আশ্চর্য?

শেষ পর্যন্ত ওয়াসেফ আলীকে অনেকক্ষণ-থেকে-আটকে থাকা কথাটা জিগ্যেস করেই ফেললাম : আহাদ শাহকে মার্ডার করলে কে? কেনই বা? এর মধ্যে কি হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার আছে নাকি কিছু?

: আরে না না। খানিকটা হিংসা দ্বেষ খানিকটা লোভ। এ কথাটা ঠিকই যে গুরুর নামডাক আর ক্রিয়াকলাপের খবর দূর দূর গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটাও সত্যি যে তাঁর কৃপায় রোগ সেরে যাচ্ছিল অনেকের। তার ফলে কি হলো? এই আশ্রমের চার পাশে যত জমি আর বাগান দেখছেন এ সবই ভক্তজনেরা তাঁকে লিখে দিতে লাগল। সে-সব কি নীচ মানুষের ঈর্ষা হিংসা জাগায় নি? কিন্তু তাতে তো একটা লোককে খুন হতে হয় না।

: তবে কি ওঁর ধর্মমত কাউকে চটিয়েছিল?

: না। তাও তো নয়। তাঁর ধর্মমত খুব উদার ছিল। এখনো এখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান অম্বুবাচীর মচ্ছবে একসঙ্গে খানা খায় পাশাপাশি বসে। আসবেন দেখবেন। তিনি বলতেন—'হক্‌-আল্লা বলো মুসলমান, হক্‌-হরি বলো হিন্দু, হক্‌-যিশু বলো খৃষ্টান'। এই কথা সর্বদাই বলতেন। হক্‌ মানে তো সত্য। সত্যকে তো সবাই চায়। আসলে আমি যা বুঝি, ও-সব ধর্ম নয়, ঈর্ষা হিংসা নয়, তাঁকে মরতে হলো একদল মানুষের অন্যায় লোভে।

: ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওয়াসেফ বললেন : সে আমাদের খুব দুঃখের ঘটনা। সেদিন সন্ধের আগে ফকির সাহেব বিশেষ কারণে কিছু টাকা ভক্তদের দেন। তাদের মধ্যে কজন ভক্ত বোধ হয় ভেবেছিল তাঁর কাছে অনেক টাকা আছে। রাতের বেলা তারা এসে ফকিরের কাছে সব টাকা চাইল। তিনি সবই দিলেন তবু তারা বলল, আরো টাকা আছে দিতে হবে। তারা বাঁধলো তাঁকে। তাদের বোধহয় চিনতে পেরেছিলেন গুরু। তাই বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। ফকির বলেছিলেন অনুনয় করে, 'আমাকে জানে মেরো না'। তারা শুনল না।

সজল চোখে ওয়াসেফ বললেন : আমার কপাল, আমিই প্রথম তাঁকে দেখি। খুব ভোরবেলা। তখনও প্রাণ ছিল। রক্তের বন্যায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছেন। আমিই দড়াদড়ি খুলে দিই। সে রাতেই প্রাণ চলে গেল তাঁর। কিছুতেই, শত অনুনয়েও খুনীদের নাম বললেন না। ক্ষমা করলেন তাঁদের। তবে আল্লা তো তাদের ক্ষমা করেন নি। উচিত বিচার হয়েছে।

: কী রকম ?

: সে কি আপনার বিশ্বাস হবে ? তবে আমরা নিজে দেখেছি একজন লোক এই আশ্রমেই রক্তবমি করে মরল। কজন চুরি-করা টাকা ফেরত দিয়ে আশ্রমের বেদীতে মাথা ঠুকে ঠুকে ক্ষমা চাইতে লাগল আকুল হয়ে। সূর্যাস্তের আগেই তারা ছটফট করে ম'ল। বাকি যে-সব খুনী ছিল মাসখানেকের মধ্যে সবাই অপঘাতে শেষ হলো। হঠাৎ হঠাৎ আশপাশের গাঁ-ঘরে কজন মরে গেল। আপদ চুকল। সেই থেকে এই আশ্রমের নামডাক খুব ছড়িয়ে পড়ল। অম্বুবাচীর মেলায় ভক্ত ভক্ত্যাদের ভিড় বেড়েই চলল। এখন তো হাজার পঞ্চাশ লোক আসে।

জানতে ইচ্ছে হলো আহাদ ফকির কত বছর বয়সে নিহত হয়েছিলেন ? সে কি অকালে ? তখন কি তিনি নিতান্ত নবীন ?

ওয়াসেফ বললেন : 'তাঁর জন্ম সাল ১২৪৬ সন, এন্তেকাল ১৩৫৬। তারমানে ১১০ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন।'

আমি বললাম : এমন একটা মানুষ মরে গেল। মামলা-মোকদ্দমা হলো না ?

: কাকে নিয়ে হবে ? সাক্ষী তো ছিল না কেউ। তাছাড়া ফকির তো কারুর নাম বলে যাননি। তবে খোদ খোদার আদালতে হয়ে গেছে বিচার। সে-সব খুনী পাপীদের নাম কি আজ আর কেউ করছে ? সবাই ভক্তিভরে আহাদের নামই করে, তাঁরই গুণ গায়। এই যে আপনি এতদূর থেকে এয়েচেন সে তো তাঁরই কথা শুনতে নাকি কহেন ?

আমি দেখতে থাকি এই ঐশী জায়গা। সন্দিহান মন আমার সাড়া দেয় কই ?

আমার জড়বুদ্ধি মেয়ের জন্যে এখানে হত্যে দিলে সে সেরে উঠবে ? ঘুচবে তার পঙ্গুত্ব ? ফিরবে তার বোধ ? কথা বলবে সে ? আমাকে ডাকবে সে 'বাবা' বলে ? সে ডাক যে তার মুখে আমি কখনো শুনি নি ! হে আহাদ ফকির, আমাকে বিশ্বাস দাও । তোমাকে ভরসা করবার মতো বিশ্বাস । লোকায়ত জীবনে আমি কখনো অলৌকিক দেখি নি । দুবরাজের মতো আমি তোমাকে আকুল হয়ে ডাকতে পারি না । ওয়াসেফের মতো অটল বিশ্বাস নেই আমার । দু চোখ কি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে ?

না । মুহূর্তে যুক্তিবাদী মন শক্ত হয়ে ওঠে । বিশ শতকের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে এ আমার কী সব উলটো ভাবনা । আমার বুদ্ধিবাদী মন ভাবতে থাকে আহাদের চমৎকার মীথটুকুর সারবস্তু নিয়ে । ভাবি, জীবনে যে-মানুষটি ছিল অনতিখ্যাত, এক অকারণ হনন তাঁকে করেছে লোককথার বিখ্যাত কেন্দ্রবিন্দু । আততায়ীদের মৃত্যুঘটনা তাঁকে দিয়েছে অলৌকিক কিংবদন্তীর দুর্লভ অবিস্মরণীয়তা । এমনিই কি চলবে চিরকাল ? পৃথিবী এগিয়ে চলবে এবং সভ্যতা । আণবিক যুগ তৈরি করবে অবিশ্বাস্য পৃথিবী, বৈদ্যুতিক কৃৎকৌশল রিমোট কন্‌ট্রোলে চালাবে যান্ত্রিক সমাজজীবন । আহাদদের গল্প তখনও থাকবে ? বিশ্বাস করবে মানুষ সে-সব ?

হঠাৎ সমস্ত আশ্রমটা আমার সামনে বিস্ফোরিত হয়ে গেল । যেন অন্তহীন ব্যর্থ রিক্ত মানুষের নিষ্ফল মাথাকোটা এখানে দারুণ শ্বাস ফেলছে । যেন আমার মেয়ের মতো ভারতের পাঁচ লক্ষ জড়বুদ্ধি সন্তান মুক্তি চাইছে অসহায় জীবন থেকে নিষ্ক্রমণের জন্যে । হতবাক আমার কাঁধে হাত রেখে বৃদ্ধ ওয়াসেফ বললেন : আপনার কষ্ট আমি বুঝছি।আপনার মধ্যে ভক্তি নেই । আপনি কোনোদিন শান্তি পাবেন না ।

আমি অভিমান ভরে মাথা তুললাম আর মনে পড়ল সুফল সরকারের প্রত্যয়ভরা মুখখানা । সেইসঙ্গে তার তেজোদীপ্ত কথা : 'এ দেশটার সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ভক্তি । মানুষকে মাথা তুলতে দেয় না । আমার লড়াই এই নেতানো ভক্তির বিরুদ্ধে ।' কথাটা মনে পড়া মাত্রই আমি শ্যাওড়াতলা ত্যাগ করলাম খুব দ্রুত পায়ে । অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওয়াসেফ আর আহাদের বিশ্বাসী ভক্তের দল । আমি নদী পেরিয়ে সোজা বাসে উঠলাম । খানিকক্ষণের মধ্যে বাস ছেড়ে দিল । আমার মন রোমন্থন করতে চাইল সুফল সরকারের সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটির ঘটনাগুলো ।

জেলা কৃষি আধিকারিক নেমন্তন্ন করেছিলেন বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের উৎসবে । জেলার সফল চাষিদের দেওয়া হবে শীল্ড আর কাপ । কেউ পাবে ভালো ফলনের জন্য, কেউ ভালো সাইজের জন্য, কেউ একই জমিতে একাধিক

ফলনের জন্য। যদিও রুটিন প্রোগ্রাম তবু আমি সাধারণত এ-সব সভায় যোগ দিই গ্রামের অন্য ধবনের মানুষ দেখার লোভে। গুরু-মন্ত্র- কবচ-তাবিজ, আখড়া-শব্দগান-কিংবদন্তী-অন্ধবিশ্বাস, মেলা-মচ্ছব-বাউল-বৈরাগী- উদাসীনদের খুঁজতে গিয়ে গ্রাম-জীবনের অন্য বাঁকটাও দেখেছি বৈকি। যে দিকটা ফলবান, যেদিকে অবিচার শোষণ, যে-মানুষ বঞ্চিত। আবার অগাধ ধানপাট, বিশাল জমিতে ট্র্যাক্টর চলছে, মাঠে মাঠে শ্যালো টিউবওয়েলের জলের কল্যাণে শস্যসম্ভাবের শ্যামশ্রীও আমি অনেক দেখেছি। রবিফসলের সময় আমি গ্রামের মানুষকে পেট পুড়ে খেতে দেখি নি কি ? সেই আমিই আবার দেখেছি গ্রামের মুদিব দোকানে দেশলাই কাঠি খুচবো বিক্রি হতে কিংবা একটি মেয়ে মুদির দোকানে এসে একটা ছোট পুঁটলি নামিয়ে তিসির বিনিময়ে নিয়ে যাচ্ছে কেরোসিন তেল।

তবে গ্রামের পরিবেশে তাদের দেখা একরকম আর শহরের সম্মেলনে আরেক রকম। এই-সব কৃষি অ|ধিকারিকের সভায় একপাশে বেঞ্চিতে বসে থাকে কিছু চাষি। নিজেরা যাদের পরিচয় দেয় চাষাভুষো বলে, আকাশবাণী তাদের বলে চাষিভাই। এমন অনুষ্ঠান ইণ্ডিয়ান নিউজ রিভিয়্যুতে অনেক দেখেছি। সাধারণত হরিয়ানার সহাস্য পেশল পাগড়িপরা চাষিদের এ-সব তথ্যচিত্রে দেখি। সেদিনকার পুরস্কার বিতরণ উৎসবে আমাদের ন্যুব্জ মলিন ক্লান্ত কৃষকদেরই দেখব জানতাম। কিন্তু সেই আশাহীন মানুষের ভিড়ে একজন খাড়া মানুষকে দেখে চমকে যাই। তিনিই সুফল সবকার, পরে জানতে পারি। এক জমিতে বহু ফসলের পুরস্কারের প্রাপক ছিলেন তিনি। সে কথা ঘোষণায় শুনি। কিন্তু তার আগে সুফলেব একটা কথা আমাকে টানে।

টেবিলে পর পর সাজানো ট্রফি, অভিজ্ঞানপত্র আর সেভিংস সার্টিফিকেট। সভাপতি হিসাবে জেলাশাসক এসে গেছেন তাঁর রেডিমেড হাসি নিয়ে। পাশে তাঁর রোদ-চশমা-পরা খরগোশের মতো তুলতুলে বউ। তাঁদের অতি-পরিকল্পিত সংসারের একতম শিশু-সন্তানটি গ্যাজেবো পোশাক পরে ডি· এমের খাস আর্দালির কাঁধে চড়ে দন্তবিকশিত আননে সবাইকে কৃতার্থ করছে। ডি· এমের সামনে জেলা কৃষি আধিকারিক বিগলিত হেসে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যান্য সহ-আধিকারিকেরা নানা তদ্বির তদারকে ব্যস্ত। মঞ্চে নানাজাতীয় পোস্টার। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ও রাজ্য কৃষিমন্ত্রীর আশীবাণীমণ্ডিত স্যুভেনির একটা পাওয়া গেল যার সর্বাঙ্গে জেলার সমস্ত সার ও পাম্পসেটের দোকানের কিম্ভুত নামাবলী। একপাশে বেঞ্চিতে বসে নিমন্ত্রিত চাষিরা। এ উৎসব নাকি তাদের। পরণে তাদের বে-আন্দাজী মাড়-দেওয়া ঠেঁটি ধুতি আর শার্ট।

খড়ি-ওঠা বেঢপ শক্ত পায়ে ধুলোধূসর বুটের অনিচ্ছুক অবস্থান। কিন্তু রোদ-পোড়া কালো মুখে সেই প্রার্থিত সাজানো হাসি যে নেই! সরকারি স্ট্রিনজেন্ট ফোটোগ্রাফার তাদের সামনে ক্যামেরা ধরেছে আর বলছে : কই, একটু হাসুন।

সঙ্গে সঙ্গে একস্‌টেনশ্যন অফিসাররা এসে বললেন : হাসুন হাসুন। আজকে আপনাদের কত আনন্দের দিন। কত প্রাইজ পাবেন। একটু হাসি-হাসি মুখে তাকান এই দিকে।

ঠিক এই সময়ে উঠে দাঁড়ালেন সুফল সরকার। কালো রঙের খাটো মানুষ। মালকোঁচা-মারা ধুতি আর শার্ট পরনে। খুব তেজালো গলায় বললেন · হাসিটা আসবে কোত্থেকে বলুন তো? ভোরবেলা বি· ডি· ও· সায়েব গ্রাম থেকে ধরে এনেছেন। খিদেয় হাঁ-হাঁ করছে সবাই। এ মশায় চাষার খিদে, জষ্টি মাসের খেতের মতো। ও আপনাদের চা-বিস্কুটের কম্মো নয়। পেট পুরে খাওয়ান আপনি হাসি ফুটবে। করছেনটা কি আপনারা? শুধু ব্যাজ লাগিয়ে ফুটুনি আর বড় বড় কথা।

এই এক বাক্যবন্ধের স্পষ্টতায় ভালো লেগে গেল সুফল সরকারকে। চমৎকার সোজা লোক। আলাপ না করে উপায় আছে? আলাপের শেষে কথা আদায় করলেন তাঁর গ্রামে একদিন যেতেই হবে। শ্যামপুর।

মনে আছে দিন-সাতেকের মধ্যেই গিয়েছিলাম। শীতকাল। বাসস্টপ থেকে নেমে শুরু হলো হাঁটা। দুপাশে শস্যাকীর্ণ মাঠ। 'অবারিত' আর 'আদিগন্ত' শব্দ দুটোর ঠিক মানে গ্রামে এলে তবে বোঝা যায়। পথের দুপাশে কদাচিৎ একটা-দুটো মেটে বাড়ি। আখ মাড়াই চলছে। ঘরের দাওয়ায় পাটকাঠিতে গোবর লাগিয়ে জ্বালানি রোদে শুকোচ্ছে।

'কোথায় যাবেন?' পথ-চলতি মানুষের জিজ্ঞাসা।

'সুফল সরকারের বাড়ি।'

'সোজা গিয়ে বাঁদিকে বাঁক নেবেন। মিনিট-দশেক লাগবে। সুফলদা বাড়িতেই আছেন। এই তো কথা বলে এলাম।' মানুষটির মুখে সুফল সম্পর্কে সম্ভ্রমটুকু গোপন ছিল না।

খানিক পরেই পৌঁছে গেলাম। অনতিপ্রৌঢ় মানুষটা উঠোনে বসে খেজুরপাতার চ্যাটাই বুনছিলেন। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বসতে দিলেন একটা পালিশছাড়া কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে। নিজে রইলেন দাঁড়িয়ে। তবে মানুষটা খুব ছটফটে। এই পা দিয়ে আঁচড় কাটছেন মাটিতে, এই খানিকটা এ-পাশ ও-পাশ করছেন। সারাক্ষণ চঞ্চল চোখ দুটো ঘুরছে। খুব সতর্ক অথচ

উৎসুক। খানিকক্ষণ দুপক্ষেই ধানাইপানাই আমড়াগাছি হলো। অবশেষে এই শান্ত ছিমছাম গ্রাম সম্পর্কে সব চেয়ে রোচক প্রশ্নটা তুললাম : কেমন আছেন এই গাঁয়ে ? মনে তো হলো বেশ ফসল হয়। মানুষজনও শান্ত শিষ্ট পরিশ্রমী। মাঠে মহলায় সবাই খুব কর্মব্যস্ত। কিন্তু এই পরিবেশ কি সত্যি ? পার্টিবাজি নেই ? ডাকাতি হয় না ?

খাড়া মানুষটা টান-টান উত্তর দিলেন এক কথায় : ডাকাতি হবে কেন ? আমরা তো ঐক্যবদ্ধ।

খুব চমকে গেলাম। এতদিন গ্রামে ঘুরছি। সব জায়গাতেই এই ডাকাতি খুব সেন্‌সিটিভ ইস্যু। সবাই মিইয়ে আছে আশঙ্কা আর সন্ত্রাসে। তাই জিগ্যেস করতেই হলো : তার মানে, আপনি বলছেন ঐক্যবদ্ধ গ্রামে ডাকাতি হয় না ?

'কি ক'রে হবে ?' সুফল খুব তাত্ত্বিক ভঙ্গিতে বললেন, 'গ্রাম-সমাজে সম-কাঠামো থাকলে অনৈক্য থাকে না। অসম সমাজ ডাকাত টেনে আনে। যে কোনো গ্রামে ডাকাতির ভেতরকার খবর নেবেন, দেখবেন সেই গ্রামের কোনো মানুষ নিশ্চযই ডাকাতদের মদত দেয়। এখানে তা হবে না।'

: কেন ?

: এখানে আমবা পঁচিশ ঘর সাধাবণ চাষি বাস করি। সবাই সাধারণ চাষি। ধান হয় সামান্য, সবজি বেশি। এই এখন যেমন জমিতে দেখবেন বেগুন টম্যাটো আর শিম। একজন চাষির জমি খুব বেশি পাঁচ বিঘে। এখানে ডাকাতিতে খরচ পোষাবে না। সামান্য চাষি দিনে গড়ে দশ পনেরো টাকার সবজি বেচে। নিন একটু চা মুড়ি খান। একটি কালো রোগা মেয়ে চা দিল। সুফল বললেন · আমার বড় মেয়ে। পাশের দোগাছি গ্রামের হেলথ সেন্টারে কাজ করে। আজ রবিবার। ছুটি।

: তারমানে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন সব। ইস্কুল আছে ?

একটু হেসে সুফল বললেন : ইস্কুল ছিল না। আমি করেছি। একটা জেদ থেকে।

: কী রকম ?

: তখন এখানে কিছুই ছিল না। জঙ্গল ছিল আর জলা। আগে নাকি বাঘ থাকত। আশপাশের গাঁয়ের লোক বলে। এ কথাও বলে যে আমরা পুববঙ্গের লোক বাঘের থেকেও নাকি সাংঘাতিক। যা হোক আমরা ফরিদপুরের এড়াকান্দি এলাকার নমঃশূদ্র। এ গ্রামের সবাই। দেশ ভাগ হ'তে আমরা একটা দল চ'লে এসে প্রথমে বসি বহিরগাছিতে। তখন বিশ ঘর মানুষ ছিলাম। সেখানে দশ বছর থেকেও শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারলাম না।

: কেন ? লোকাল মানুষের শত্রুতা ?

: না না। বান বন্যা। বহিরগাছি গেছেন ? খুব নিচু জায়গা। প্রত্যেক বছর ভরা ফসল ডুবে যেত। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেয়ে এখানে এসে জঙ্গল কেটে বসত গড়ি। তা পঁচিশ বছর হয়ে গেল।

সংগ্রামী মানুষের একটা দৃপ্ত কাঠিন্য আর প্রত্যয়ের ঋজুতা সুফলের চোখে। অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার বাইরে একটা আলাদা জীবন-রস থাকে কোনো কোনো মানুষের। যেন শেকড়ের মতো সেই ব্যক্তিত্ব চার পাশ থেকে রস টেনে তুমুলভাবে বেঁচে থাকে। এমন মানুষ এখনকার গ্রামে খুব কম। মুগ্ধ চোখে জানতে চাইলাম, 'জেদের বশে ইস্কুল খোলার কথা কি যেন বলছিলেন ?'

: হ্যাঁ, সে একটা ইতিহাস। জানেন তো এদেশে এসে প্রথম প্রথম পুববঙ্গের মানুষদের অনেক বিদ্রূপ ব্যঙ্গ সইতে হয়েছে। তায় আমরা সিডিউলড কাস্ট। জানেন কি আমাদের এস· সি· আর· এস· টি·, অর্থাৎ সিডিউলড কাস্ট আর সিডিউলড ট্রাইব নিয়ে এদেশে আমাদের কি বলে ? বলে এস· সি· মানে সোনার চাঁদ আর আর· এস· টি· মানে সোনার টুকরো। একবার শিয়ালদহ স্টেশনে টিকিটের খুব লম্বা লাইন পড়েছে, আমিও দাঁড়িয়ে আছি সে লাইনে। হঠাৎ এক কোটপ্যাণ্ট-পরা গৌরবর্ণ ভদ্রলোক, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ, বললেন ব্যঙ্গ করে, 'এ কি ? এত বড় লাইন ? কেন ? গবরমেন্ট এখনো সিডিউলড কাস্টের জন্যে আলাদা লাইনের সুবিধা দেয় নি ?' চুপচাপ এ-সবও শুনেছি। পাশের দোগাছি গ্রামে বেশির ভাগ বর্ণহিন্দুর বাস, ব্রাহ্মণপ্রধান। ওরা আমাদের বলে 'নমো'। খুব ঘেন্না করে। তা সেবার দোগাছিতে কী একটা কাজে গেছি। গরমকাল। দু দণ্ড একটা দিঘির ধারে বসে জিরুচ্ছি। বহু লোকজন ছেলেমেয়ে বাচ্চা-কাচ্চা চান করছে, দেখছি। হঠাৎ দেখি একটা ছেলে মাঝদিঘির অথৈ জলে খাবি খাচ্ছে।

: আপনি তুললেন ?

: হ্যাঁ, পুববঙ্গের জলের মানুষ। আমার সামনে কেউ ডুবতে পারে ? সাঁতরে গিয়ে ছেলেটাকে তুলে আনলাম। খুব জল খেয়েছিল। ঘুরপাক খাইয়ে জল বার করে দিয়ে বললাম 'যাঃ বেঁচে গেলি'। খবর পেয়ে খানিকপর ছেলেটার মা ঠাকুমা ছুটে এল। খোঁজ নিল কে বাঁচিয়েছে তাদের ছেলেকে। সবাই আমাকে দেখিয়ে দিল। বুড়ি বলল, 'তুমি শ্যামপুরে থাক না ?' আমি 'হ্যাঁ' বলতেই বুড়ি তার নাতির নড়া ধরে বলল, 'চল্। জলে ডুব দে। তোকে নমোয় ছুঁয়েছে।' কেউ প্রতিবাদ করল না। সবাই সায় দিল।

: বলেন কি ?

: হ্যাঁ। সেদিন জেদ ধরল মনে। বুড়ি, শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের

দোগাছির সবাইকে আমি নমোর শক্তি দেখিয়ে দেব। তা দেখিয়ে দিয়েছি। এখন ও-গ্রামে আমার খুব মান্যতা। সবাই তোয়াজ করে বলে সুফলবাবু আমাদের গর্ব।

: কি ভাবে তা হলো ?

: গ্রামকে সংঘবদ্ধ করলাম। শহরে ছোটাছুটি করে নাইট স্কুল করলাম। এখন আমাদের গ্রামের সবাই প্রাথমিক পাশ। অন্তত চারটে গ্রাজুয়েট। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বিশজন ছেলে-মেয়ে। সবাইকে শিক্ষিত করব। সবাই এখানে এককাট্টা।

এতক্ষণে মানুষটার অহংকারেব কারণ বুঝলাম। শুধু সুফল নয়, সফল। কিন্তু গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ আছে কী করে ? এখনও পার্টিবাজি ঢোকে নি ? পশ্চিমবঙ্গের এমন গ্রাম তো দেখিনি যেখানে দলীয় রাজনীতির সংঘর্ষ নেই। পঞ্চায়েত তো আছে। ভোটও আছে। তবে ? কথাটা আমাকে শেষ পর্যন্ত জিগ্যেস করতেই হলো।

সুফল বললেন. এখানকার বেশির ভাগ গ্রামের বাজনীতি ব্যাপারটা অন্তঃসারশূন্য আর হুজুগে। একটা ঘটনা শুনবেন ? ঐ দোগাছির পাশের গ্রাম মূর্তিপুর। সেখানে দু ভাই সুকেশ আর জনার্দন মণ্ডল পৃথগন্ন হয়ে পাশাপাশি বাস করে। সামান্য জমি আছে চাষ-আবাদ করে। কোনোরকমে চলে যায়। দুজনেই সি. পি. এম. করে। কারুরই অবশ্য বাজনৈতিক জ্ঞান নেই। তো মূর্তিপুরে সি. পি. এম. আর. এস. পি.-তে খুব বেষারেষি। দু দলই চেষ্টা করছে ক্যাডার বাড়াতে। একদিন সুকেশ আর জনার্দন দুজনেই যখন মাঠে তখন সুকেশের গরু জনার্দনের বেড়া ভেঙে এসে উঠোনেব ফসল খেয়ে গেছে। বেধে গেল দুই বউয়ে তুমুল ঝগড়া। তার পর তেতেপুরে জনার্দন বাড়ি ফিরতেই তার বউ তাকে সাতকাহন করে লাগালো। সঙ্গে চোখের জলের অস্ত্র। ব্যাস্, আগুন জ্বলে গেল জনার্দনের মাথায়···

'খুন ?' আমি সচকিত হয়ে বললাম।

'আরে না না, খুন নয়।' জনার্দন বললে 'তবে রে, চললাম আমি আর. এস. পি. অফিসে। আজ থেকে আর সি. পি. এম. করব না।' সত্যিই জনার্দন সেই থেকে খুব আর. এস. পি. করে। সেই কোঁদলে মূর্তিপুরে ভোট ভাগ হয়ে গেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ও অঞ্চলে ফ্রন্ট হেরেছে। এই তো গাঁয়ের রাজনীতি।'

শহরে থাকি। খবরের কাগজ প'ড়ে গ্রাম্য রাজনীতির খবর পাই। তাতে তো কোনোদিন এসব খবর বেরোয় না। তাই অবাক লাগে খুব। তার চেয়েও সম্ভ্রম আসে স্থিতধী সুফল সরকারের বিশ্লেষণে, ঘটনা সাজানোর বিন্যাসে। কিন্তু

মানুষটার নিজের কথা জানা খুব শক্ত। প্রায় কিছুই বলেন না। খোঁচাতেই হয় কৌশলে। জিগ্যেস করি : সারাদিন তো জমির কাজে কাটে আপনার। সন্ধের পর কি করেন ? হরিনাম ?

খুব অবজ্ঞার সুরে উত্তর এল : 'হরিনাম করে পাপী-তাপী। আমার ওসব বালাই নেই। পাপ তো কিছু করি নি। বিশ্বাসও নেই পাপপুণ্যে, ভক্তি নেই দেবদ্বিজে। মানুষকে বিশ্বাস করি। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন ? এ দেশটার সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ভক্তি, মানুষকে মাথা তুলতে দেয় না। আমার লড়াই এই নেতানো ভক্তির বিরুদ্ধে।'

'কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি', আমি বললাম, 'সন্ধের পর কি করেন বললেন না তো ?'

: আমার একটা অসুখ আছে। সন্ধে হলেই সেই ব্যামোতে ধরে···

: কি ব্যামো ? কতদিনের পুরনো ?

: তা ধরুন যৌবনকাল থেকেই রোগটার বাড়াবাড়ি। হ্যাঁ তা বছর তিরিশ-চল্লিশ হলো।

: হাঁপের টান ?

: আজ্ঞে না, লেখাপড়ার ব্যামো। সন্ধে হলেই হেরিকেন জ্বেলে বসে পড়ি। এই আপনার সঙ্গে কথা বলছি আর ভাবছি কখন সন্ধে হবে আর বসব বইখানা নিয়ে। যে বইখানা পড়ছি তার শেষটুকু জানার জন্যে মন আকুলি-বিকুলি করছে।

: কী সেই বইখানা ?

: 'ইস্পাত'। নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কির লেখা। পড়েছেন ?

মাথা নাড়লাম। কিন্তু বলতে পারলাম না কতখানি বিস্ময়ের ধাক্কা লাগল মনে। শুধু চমকিত নয়, যাকে বলে চমৎকৃত হওয়া। খুবই আশ্চর্য। একই দেশকাল পরিবেশভেদে এক একরকম বিশ্বাসের মানুষ তৈরি হয় কেমন করে ? আজকে যখন খুব দূর থেকে সবটা ভাবি তখন মেলাতে কষ্ট হয় ওয়াসেফ আলীর মতো সংস্কারান্ধ আর সুফল সরকারের মতো মুক্তমনা মানুষকে। খুব ঘনিষ্ঠ কালের মানুষ অথচ দুজনেই। এ কেমন করে হয় ? বাউল-ফকিররা আমাকে প্রায়ই যে আপ্তজ্ঞানের কথা বলত এ কি তারই উদাহরণ ? আমার তো পরিষ্কার মনে হয় একবারও ঈশ্বরকে না ডেকে সুফল আত্মজ্ঞানের চরমে পৌঁচেছেন। অথচ মনের মানুষের পথের উল্‌টো বাঁকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা।

সেদিন শেষবিকেলে সুফল সরকার আমার জীবনে যে বড় বিস্ময়ের ধাক্কা দিয়েছিলেন তার সমাপনটুকুও কম চমকপ্রদ নয়। তাঁকে স্বভাবতই প্রশ্ন

করেছিলাম সেই অজপাড়াগাঁয়ে অস্ত্রোভ্স্কির পৃথিবীবিখ্যাত বইখানা কোথা থেকে পেলেন ? গ্রামে কি লাইব্রেরি আছে ?

সুফল সরকার হাল্‌কা হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে বললেন : তাহলে আপনাকে কষ্ট করে উঠতে হবে আমার ঘরের দাওয়ার একটা কোণে।

উঠতে হলো। দাওয়ার এককোণে প্যাকিং বাক্সের কাঠে তৈরি একটা সাধারণ খোলা বুকসেল্ফ। তাতে গোটা-পঁচিশেক সোভিয়েত আর চীনা বইয়ের বাংলা অনুবাদ বই খুব যত্ন করে সাজানো। কথায় কথায় জানালেন এ-সব বই অন্তত দশবার পড়েছেন। পেয়েছেন বাঁচার মন্ত্র, সংগ্রামের রসদ। ক্লাস সিক্স অবধি বিদ্যে কর্ষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্যভাবনা আর প্রগতি মন্ত্রে। 'ইস্পাত' বইটা হালে কিনেছেন শহরের বইমেলা থেকে।

এতক্ষণকার লুকিয়ে থাকা মানুষটা অনর্গলিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন একেবারে গর্বিত মুখরতায়। কী উদ্দীপ্ত সেই মুখভঙ্গি !' 'তেভাগা আন্দোলনের নাম জানেন ? তারই ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ি হঠাৎ। সেই থেকে পড়ার নেশা। অবিশ্যি তখন কাজের চাপ খুব ছিল। সংগঠনের চাপ। তার পর দেশভাগ। কুটোর মতো ভেসে এসে প্রথমে বহিবগাছি, দশ বছর পরে এই শ্যামপুরে পাকা পত্তনী। তবু নতুন দেশে নতুন গ্রাম গড়া। সেও এক বড় সংগঠন। মানুষের সঠিক পথটা বোঝানো, সঠিক কাজটা করানো। এখন খানিকটা বিশ্রাম পাই। পরামর্শ দিই। নিজেও পড়ে পড়ে জানি অনেকটা।'

'এ গ্রাম তাহলে আপনার কব্জায় ?' আমার জিজ্ঞাসা।

: কব্জা-টব্জায় বিশ্বাস করি না। যৌথ জীবন। সবাই খাটি, খাই। সবাইয়ের সুখে-দুঃখে সবাই দাঁড়াই। আমরা এককাট্টা।

মাঝে মাঝে ভাবি, সুফলরা কি এখনো এককাট্টা ? রাজনীতির ফড়েরা এখনও সেখানে ঢোকে নি ? শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের মানুষ কি সুফলের নেতৃত্ব এখনো মেনে চলছে ? কতবার ভেবেছি আরেকবার শ্যামপুর যাই। কিন্তু যাই নি। যদি তেমন আর না দেখি ? মনের অতলে থাকুক একটা অমলিন বিশ্বাসের স্মৃতিচিত্র। কে আর শুদ্ধতাকে ভাঙতে চায় ?

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সন্ধানে যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরতাম তখন দুটো চিন্তা মাথায় ছিল। চাপড়ার বৃত্তিহুদা গ্রামে সাহেবধনীদের মূল গুরুপাট। সেখানে প্রতিদিন তাদের উপাস্য দীনদয়ালের ভোগরাগ সন্ধ্যা আরতি দেন মূল সেবাইত, আর প্রতি বৃহস্পতিবার দীনদয়ালকে দেওয়া হয় বিশেষ ভোগ ও পূজা। সেবাইত শরৎ-পালকে আমি প্রথম চিন্তা থেকে জিগ্যেস করেছিলাম : আপনি

তো সাহেবধনীদের মূল ফকির। তা আপনাদের সাহেবধনী-সম্প্রদায়ের যে অগণিত ভক্তশিষ্য চারি দিকে ছড়িয়ে আছে তাদের দীক্ষাশিক্ষা দেয় কে ? সবাই আপনার কাছে আসে ?

শরৎ-পাল বলেছিলেন : না। আমাদের এই পাল-বাড়ি থেকে দীনদয়ালের ঘরের সত্যনাম যারা নিয়েছে তাদের মধ্যে যারা ভালো ভক্ত, মধ্যমরকম শিক্ষিত, ভালো বলতে-কইতে পারে তাদের আমরা বিশেষ অনুমতি দিই তাদের নিজ-গ্রামে নিজ-বাস্তুতে দীনদয়ালের 'আসন' প্রতিষ্ঠা করতে। তাদের বলা হয় 'আসুনে ফকির'। তারা দীক্ষাদানের অধিকারী। সায়ংসন্ধ্যা দীনদয়ালের পুজো উপাসনা করে তারা। তারাই আমাদের শিষ্য বাড়ায়। অগ্রদীপের যে মেলা বসে চৈত্র একাদশীতে, সেখানে আসুনে ফকিররা তাদের শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে আসে। মচ্ছবের চাল-ডাল দেয়। আমাদের ঘরে খাজনা দেয়। আর আমরা তাদের দিই একটা করে মাদুর একটা করে হুঁকো।

: ভারি অদ্ভুত নিয়ম তো ? লোকধর্মের অনেক-দেখা আমার অভিজ্ঞতাও রীতিমতো বিস্ময় মানে। জিগ্যেস করি : 'তার মানে আসুনে ফকিররা আপনার কাছে দায়বদ্ধ আর সাধারণ শিষ্যরা আসুনে ফকিরদের কাছে দায়ী, এই তো ? তা আসুনে ফকিরদের নাম-ঠিকানার একটা তালিকা আপনার কাছে আছে তো ?'

: নিশ্চয়ই। আপনি অগ্রদ্বীপের মেলায় দেখেন নি লালখেরোর খাতা নিয়ে গোমস্তা আসুনে ফকিরদের জরিমানা নেয় ?

: জরিমানা ?

: হ্যাঁ, আমাদের মতে খাজনাকে বলে জরিমানা। আমরা তাদের ঐহিক কর্তা যে।

: বাঃ চমৎকার সিস্‌টেম। তা আপনাদের অনেককিছু তো দেখা হলো, এখন আমার দুটো আগ্রহ আছে। এক, একজন আসুনে ফকিরকে দেখা, আর দুই, একজন দীনদয়ালের খুব সাধারণ ভক্তকে কাছ থেকে দেখা। এই সাধারণ ভক্তকে আমি খুঁজে নেব যে-কোনো গাঁয়ে। কিন্তু একজন আসুনে ফকিরকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে গেলে তো আপনার মতামত দরকার। ঠিক কার কাছে গেলে ক্রিয়াকলাপ দেখা যাবে, কে সব ঠিকমতো বোঝাতে পারবে, সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। তাছাড়া যদি একটা চিঠি লিখে দেন তো খুব সুবিধে হয়।

শরৎ পাল খুব চিন্তা করে জিগ্যেস করলেন, 'কিরকম আসুনে ফকির দেখবেন ? হিন্দু না মুসলমান ?'

আমি বললাম, 'আমার ও সব তফাত নেই।'

শরৎ পাল একটু হেসে বললেন, 'পুরুষ না নারী ?'

এবারে চমকাতে হলো। পুরুষ বা নারী দুজনেই দীক্ষাগুরু হ'তে পারেন নাকি সাহেবধনী মতে ?

শরৎ পাল বললেন : আমাদের ঘরে এককালে খুব নামকরা মহিলা ছিলেন জগতীমাতা, দিনুরতন দাসী, লক্ষ্মীটগর। তাঁদের অনেক শিষ্য ছিল। এখনো অনেক আছেন। ঠিক আছে, আপনাকে একটা খুব মজার জায়গায় পাঠাচ্ছি। চলে যান আকন্দবেড়ে। চেনেন তো ? সেখানে দর্জি ফকিরের বাড়ি যাবেন। তার ছেলের নাম কামাল হোসেন। খুব নামকরা লোক। সবাই চেনে। দর্জি ফকির ছিলেন আমাদের ঘরের খুব পুরনো আসুনে ফকির। এখনো আসন আছে। তবে কামাল ফকিরি নেয় নি। ভোগরাগ, নিত্য পূজা, দিবসী, মন্ত্রদীক্ষা সব করে হরিমতী। সে কিন্তু হিন্দু। কামাল তাকে দিদি বলে। দর্জি ফকিরকে হরিমতী 'বাবা' বলে ডেকেছিল। সেই থেকে ঐ বাড়িতে থাকে। বিয়ে-থাওয়া করে নি। দীনদয়ালের খুব ভক্তিমতী সাধিকা।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়ের ধাক্কা। বলেই ফেলি : মুসলমান বাড়িতে হিন্দু মেয়ে বাস করে ?

শরৎ পাল আহত ভঙ্গিতে বলেন : সব বুঝেও মাঝে মাঝে আপনার ঠিকে ভুল হয়ে যায় বড্ড। আমাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বিচার নেই। ওটা আপনাদের হিসেব।

লজ্জিত হই। সত্যিই ভুল হয়ে যায় বারে-বারে। সংস্কার বড় সাংঘাতিক। শরৎ পালের কাছে মার্জনা চেয়ে তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি লিখে নিয়ে বিদায় নিই সেদিনের মতো।

যাবার দিনক্ষণ মোটামুটি জানিয়ে আকন্দবেড়ের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলাম কামাল হোসেনকে। তার ফল পাওয়া গেল হাতে-নাতে। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল এক দিব্যি ছই-দেওয়া গরুরগাড়ি। আকন্দবেড়ের হাঁটা-পথ ক্রোশ দুই তো বটেই। সেটা মালুম হলো গাড়িতে যেতে যেতে। দারুণ গ্রীষ্মে গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে কুল-কুল করে ঘামছে। লোকটা মাঝে মাঝেই সম্ভ্রম নিয়ে আড়চোখে দেখছে আমাকে। ভাবছে বোধ হয় কামাল হোসেন হেন আলেম ব্যক্তি যাকে আনতে গো-গাড়ি পাঠায় না জানি তিনি কতবড় লায়েক ব্যক্তি ! লোকটার জড়তা কাটাতে নানা খুচরো প্রশ্ন করি সেও হুঁ হাঁ দিয়ে পাশ কাটায় কিংবা অকারণে গরুর সঙ্গে কথা বলে অবান্তর অব্যয় মিশিয়ে। এ তো ভারি মুস্কিল। কাঁহাতক চুপ করে থাকা যায়। তাই একটা বিশদ কৌতূহল জ্ঞাপন করে বসি : হ্যাঁ গো কত্তা, তোমাদের এই কামাল সায়েবের আব্বাজানকে তুমি দেখেছ ? বাঃ। তা আমার মনে একটা কথা খুব জেগেছে।

গাড়োয়ান বলে, 'কহেন।'

: আচ্ছা, মানুষটির নাম অমন অদ্ভুত কেন ? দর্জি ফকির আবার কী নাম ? মানুষটা দর্জিগিরিও করতেন আবার ফকিরিও করতেন নাকি ?

: আজ্ঞে না। প্রথমে ছিলেন শুধুই দর্জি। খুব গরিব মানুষ। রুকুনপুরের নাম শুনেছেন বাবু ? তা সেখানকার জমিদার একবার দর্জিকে ডেকে পাঠান তাঁর এক সাবেকি গদি সারাবার জন্যে। এ-সব আমাদের শোনা কথা আজ্ঞে। সেই গদি একটা ঘোড়ার এক্কায় চড়িয়ে উনি তো এলেন আকন্দবেড়ের ভিটেয়। পরদিন গদি খুলে তো অবাক। তার মধ্যে সেলাইয়ের ফোকরের চারভিতে গদির চার ধারে শুধু মোহর শুধু মোহর !

: সেকি ! তারপর ?

: উনি তো মাথায় করাঘাত করেন আর কাঁদেন, 'আই আল্লা এ কি পরীক্ষা আমার।' কাউকে বলতেও পারেন না। যদি ডাকাতি হয় ? সে রাত কোনোরকমে কাটিয়ে গদি নিয়ে ফিরলেন। জমিদারবাবু সব শুনে তো থ। তিনি মোহরের কথা কিছু জানতেন না। তেনার বাপ-পিতামোর কাণ্ড আর কি !

এ যে দেখি গাঁয়ের মধ্যে খাঁটি আরব্যোপন্যাস। খাড়া হয়ে বসি কৌতূহলে। কী হয় কী হয়। গাড়োয়ান একটু দম নিয়ে বলে : মোটমাট তিনশো আকবরী মোহর ছিল। মনেব খুশে জমিদারবাবু দর্জিকে দিয়ে দিলেন একশো মোহর। কপাল খুলে গেল মানুষটার। মস্ত বড় দালানকোঠা দলিজ উঠল। খুব রমরমা। তেমনই বোলবোলাও। টাকার গরমে মানুষটার মাথাও গেল ঘুরে। মোহরের তাপ আর দাপ কি সোজা ? মাথার গরমে কতদিনের লক্ষ্মীমন্ত বউকে দিলেন তালাক। সে হলো আত্মঘাতী। কামাল তখন বালক। আসলে অন্য দিকে মন তখন মানুষটার। ফুরফুরে সুন্দরী সালেহা বিবিকে ঘরে আনলেন বেলডাঙা থেকে। এদিকে হঠাৎ এক রাতে সালেহা সুন্দরী বাকি মোহর আর চাচাতো ভাইকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। আর হবি তো হ, দিন সাতেকের মধ্যে অতবড় দালান-কোঠা হঠাৎ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সবাই বললে তালাক-খাওয়া লক্ষ্মীমন্ত বউয়ের অভিশাপে এমন হলো। মানুষটা দিনকতক পাগল-পাগল হয়ে ঘুরে কার বুদ্ধিতে কে জানে পড়লেন হুদোর পাল বাড়িতে দীনদয়ালের চরণে। ব্যাস মাথা ঠাণ্ডা। দীনদয়ালের কৃপায় জীবনে শান্তি এল আবার। ফকিরি নিলেন। বাড়িতে দীনদয়ালের আসন হলো। সদাই গান করতেন। সেই থেকে নাম রটে গেল দর্জি ফকির।

: তুমি দেখেছ দর্জি ফকিরকে ?

: হ্যাঁ, আবছা মনে আছে। তখন আমার বালক বয়স। ফকিরের ছিল এই

শাদা দাড়ি। গান করতেন সদা সর্বদা, সেটা মনে পড়ে।

গল্পে গল্পে কখন আকন্দবেড়ে এসে গেছে। হৈ হৈ ক'রে অভ্যর্থনা করলেন কামাল হোসেন। বছর পঞ্চাশ বয়সের সমর্থ চেহারার মানুষ। লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। 'আসুন আসুন, গরিবের কুঁড়ে ঘরে' বলে হাতে গুঁজে দিলেন ফিল্টার কিংস। কুঁড়েঘব অবশ্য নয়, পাকাবাড়ি। বাড়ির পেছন-বাগে ভটভট করে গমকল চলছে। ফিল্টার কিং-এ একটা মোক্ষম টান মেরে ছাড়লেন একরাশ আত্মতৃপ্তির ধোঁয়া। সেইসঙ্গে সংলাপ : 'এ দিগরে গম পেশাই কল এই একটাই। সেটার মালিকানা এই অধমের।'

মানুষটির দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখি এবারে। পেটা চেহারায় আশনাই রোশনাই প্রচুর। চোখে সূক্ষ্ম সুর্মার টান, মানানসই বাবরি। চারপাশে অযাচিত মোসায়েবের দল। হাবেভাবে বোঝা গেল কামাল সাহেব বেশ সম্পন্ন আর প্রতিষ্ঠাবান নেতা ব্যক্তি। এ গ্রামে সম্ভবত তাঁর কথাই শেষ কথা। এঁর বাবা ছিলেন সর্বত্যাগী ফকির, ভাবা যায় ? কথা বলবার জন্যে, নিজেকে জাহির করতে মানুষটি বড়ই অস্থির। এসব লোককে আমি ইচ্ছে করে খুব উসকে দিই। গলগল করে কথা বেরিয়ে আসে। তাঁর কথার ধরতাই মিলিয়ে এবারে বুদ্ধি ক'রে বলি · 'মনে হচ্ছে শুধু গমকল নয়, কামাল সাহেবের যেন অনেক কিছুই অদ্বিতীয় এ গ্রামে ?'

: বেশক বেশক। গুণী লোক গুণীর আদর বোঝেন। গাঁয়ের একমাত্র রাজদূত বাইক অধমের বাড়িতে বাঁধা। দুখানা দো-নলা বন্দুক। একমাত্র এই অধমের মেয়ে শহরের কলেজে পড়ে। গ্রামের সবেধন নীলমণি কোয়াক ডাক্তার আমি। ছেলে দ্বীনি আরবি পড়ে কলকাতা মাদ্রাসায়।

হয়তো অদ্বিতীয়ের তালিকা আরো লম্বা। কিন্তু মাঝপথে বাধা পড়ল। একজন গেঁয়ো গরিব এসে বলল, 'হেকিম ছাহেব, মেয়েটার দাস্ত তো হয়েই চলেছে, আমরক্ত। পেট মুচড়ে তেমনি বেদনা। যন্তরণায় মেয়ে আমার কোঁকাচ্ছে গো।'

'হুম' গম্ভীর আওয়াজ করলেন কোয়াক ডাক্তার, আপাতত হাকিম সাহেব। মুখটা চিন্তিত ক'রে তুলে আমাকে হঠাৎ বললেন, 'বুঝলেন তো কেসখানা ? একেবারে কেরোসিন। ছটা এনট্রোস্টেপে কাজ হলো না। তবে কি ইনজেকশন দেব নাকি ?' মুখ ঘুরিয়ে লোকটিকে বললেন, 'তুমি ঘরে যাও, আমি ভেবে দেখি।' দুজনে এগোলাম। বাড়ির ঠিক পাশে, রাস্তার ওপরে রয়েছে একখানা দোকান। দোকানের এক অংশে বই খাতা পেন্সিল কলম কালি বিক্রি হচ্ছে, আরেকদিকে জমির সার, কীটনাশক, বীজ আর স্প্রে মেসিন। আমার এতদিনের

গ্রাম পরিক্রমায় এমন সারবান দোকান কখনও দেখিনি। বিস্মিত কণ্ঠে বলতেই হয় : 'এ দোকানও কি আপনার ?'

'একেবারে যথার্থ অনুমান করেছেন। এ দোকানটা আমারই। বেকার ভাইপোকে বসিয়ে দিয়েছি। দোকানের আইডিয়াটা কেমন বলুন তো ? জীবনের সার শিক্ষা আর জমির সার সুফলা ইউরিয়া আমি একসঙ্গে বেচি। মানব জমিন আর খোদার জমিন দুয়েরই চাষ চলবে।' কামাল হোসেন নিজের রসিকতায় নিজেই হাসেন হো হো ক'রে। মোসায়েবরাও গোঁজামিল হাসির কোরাস তোলে।

আমি বেশ খানিকটা মজা পেয়ে বলি, 'কামাল সায়েব, এইটুকু সময়ে আপনার এত রকম রূপ দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারছি না আপনাকে কি বলে ডাকব। ডাক্তারবাবু, কামালভাই না মিস্টার হোসেন ?'

'আরে আরে, দাঁড়ান দাঁড়ান। এখনও আপনি আমাব কিছুই দেখেননি। তবে সমিস্যেটা ভালো ধরেছেন। এ গাঁয়ে বেশির ভাগ লোকজন আমাকে জানে দর্জি ফকিরের ছেলে কামাল বলে। আলেম সমাজে আমি ছায়েব। পেশেন্টরা বলে হাকিম সাহেব। কেউ কেউ বলে মাস্টার মশাই···

: মাস্টারিও করেন নাকি ?

: আমি তিন রকমের মাস্টার। এক, প্রাইমারি ইস্কুলের হেড মাস্টার, দুই, আলকাপ গানের দলের মাস্টার···আর তিন নম্বর কি বলুন তো ?

: এ ছাড়া তিন নম্বর মাস্টার আর কি হতে পারে ?

: হুঁ হুঁ, এই দেখুন বাড়ির গায়ে বাঁধা লাল ডাকবাক্স। আমি পোস্টমাস্টারও যে। খাম পোস্টকার্ড বেচি।

বিস্মিত আমার আর একটা অনুমানাত্মক প্রশ্নও লক্ষ্যভেদ করে, 'হাজী সাহেব কি রাজনীতিও করেন নাকি ?'

উল্লসিত কণ্ঠে জবাব আসে, 'অতি অবশ্য। আমি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। তাই একটু আধটু পার্টি করতে হয় বৈকি। এখনকার দিনে পার্টি না করলে জমি জিরেত দোকান মাস্টারি পঞ্চায়েত সব ঠেকানো যায় ? শহরের বিখ্যাত কমরেডরা মাঝে মাঝে এই গরিবের দলিজে পা রাখেন।'

: আপনার তা হ'লে এ গাঁয়ে কোনোই অসুবিধে নেই ?

আকাশের দিকে হাত তুলে কামাল হোসেন বললেন, 'সবই খোদাতাল্লার ইচ্ছা। আমি গ্রামের একজন আলেম মানুষ হবার জন্যে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছি। ইমানদার মুসলমান সমাজের নেকনজর পাবার আশায় ছেলেকে ভর্তি করেছি মাদ্রাসায় আরবী পড়তে। সাধারণ গরিব-গুরবো মানুষকে বশ করেছি

হেকিমি ক'রে। গাঁয়ের কিষাণরা বেশির ভাগ আমার জমিতে অন্নদাস। বাউল বোরেগীরা মান্য করে দর্জি ফকিরের ছেলে ব'লে। হিন্দুরা আমাকে প্রোগেসিভ ভাবে কেননা মেয়েকে শহরে পাঠিয়েছি উচ্চ শিক্ষায়। এস. ডি. ও, বি. ডি. ও বাবুরা সমীহ করেন বাজনীতি করি ব'লে।'

'কিন্তু যুবসমাজ ? বেকাররা ?' আমার জিজ্ঞাসা।

: তাদের জন্য যে আলকাপের দল বানিয়েছি। কটাকে বেকারভাতা জুটিয়ে দিয়েছি। যাত্রাদল আনি শীতকালে।

: কিন্তু আপনি শরীয়ৎ মানেন ?

: সামনা সামনি সবই মানি। সবাইকে বলি 'মসজিদে যাও' 'নামাজ পড়ো'। কিন্তু আসলে কিছুই মানি না। কেন ? মূলে যে দর্জি ফকিরের পয়দা করা মাল আমি—সেটা ভুলি কি ক'রে ? ঘরে আছেন আমার হরিমতী দিদি আর মহামান্য দীনদয়াল দীনবন্ধু গোপ্তবাবাজী। আসলে হিন্দু-মুসলমান ব'লে সত্যিই কি কিছু আছে ? আপনি মানেন ? একটা মজার ঘটনা শুনবেন ?

: বলুন। আপনার সব কথাই বেশ মজার।

বেশ খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কামাল বললেন : আমার এক ভাগনে আছে অপোগণ্ড। চাচাতো দিদি অল্প বয়সে মারা গেলে আমার ভাগনেটাকে আমিই এনে মানুষ করেছি। ভালো লেখাপড়া করল না। বাউণ্ডুলে টাইপ। হরিমতী দিদির কাছে মানুষ। কোনো কাজে লেগে থাকতে পারে না। তবে সৎ। আমার বিবি ওকে খুব পছন্দ করে। তাকে কিসে কোন কাজে যে লাগাই ভেবে পাই নে। ছেলেটা কিন্তু বুদ্ধি ধরে। একদিন এসে বলে, 'চাচা কিছু টাকা দেবে ?' কি করবি জিগ্যেস করতে বলে, 'হোটেল খুলব'। আপনি যেখানে বাস থেকে নামলেন ওখানে আজকাল মালদা বহরমপুর আর উত্তরবঙ্গের বাস থামে। ছোকরা খুলে দিলে এক হোটেল।

: সেকি ? মুসলমানের হোটেলে সাধারণ পাবলিক ভাত-ডাল খাচ্ছে ?

'আরে ছোঁড়ার প্যাঁচটা শুনুন। তার খোলে খোলে বুদ্ধি।' ভাগনের বুদ্ধির তারিফে মামা হেসে বলেন, 'আমাদের গাঁয়ে রাম চক্কোত্তি বলে একজন আছে। গৌরবর্ণ সুন্দর চেহারা। কিন্তু রাণ্ডামুলো। গোমুখ্যু। তবে ভোজে-কাজে রাঁধে ভালো। আমার ভাগনে খোদাবক্স তাকে বললে, "রামকাকা চাকরি করবে ?" সে রাজি হয়ে গেল। ব্যস, ছোঁড়া বাস-রাস্তায় হোটেল খুলল। খালিগায়ে মোটা পৈতে পরে রাম চক্কোত্তি রাঁধে-বাড়ে খদ্দেরদের পরিবেশন করে।'

: আর খোদাবক্স ?

: পাক্কা শয়তান। সে ভালোমানুষের মতো মুখ করে কাউন্টারে ব'সে টাকা

পয়সা আদায় করে। মাছ মাংস সবজি কেনে। ছোকরা এত বড় বাঁদর যে হোটেলের নাম দিয়েছে বড় অদ্ভুত। ভাবতে পারেন? নাম দিয়েছে—'খোদাবক্সের হিন্দু হোটেল'। খাসা চলছে। তাই আপনাকে বলছিলাম হিন্দু-মুসলমান ব'লে কিছু নেই। সব সাজানো।

এমন একটা দারুণ চোখ-কান-খোলা চালিয়াত মানুষ এতটা উদার হয় কি ক'রে? আমার মনে ধন্দ জাগে। এ তো পাক্কা রিয়ালিস্ট, আচারে কম্যুনাল অথচ মনের মধ্যে এতটা স্বচ্ছ হয় কোন্ মন্ত্রে? এই কি তবে দীনদয়ালের ঘরের সত্যিকারের শিক্ষা? একটু যাচাই করতে লোভ জাগে। জিগ্যেস ক'রে বসি, 'মাস্টারমশাই থুড়ি হেকিমসাহেব, আপনার ছেলেমেয়ের নাম কি রেখেছেন?'

'খুব ভালো কথা তুলেছেন। হরিমতী দিদি ওদেব ডাকে গোপাল আর মীরা বলে। ওদের ইস্কুল কলেজের পোষাকী নাম মকবুল হোসেন আর রোকেয়া সুলতানা' কামাল বলেন।

আমি ককিয়ে উঠি, 'সেকি? মুসলমানী নাম কেন?'

: আরে রসুন রসুন। মাথা ঠাণ্ডা করুন আগে। খুব তো হিন্দুয়ানির বডাই করেন, হিন্দুজাতি খুব উদার নাকি, তো একটা ধন্দেব জবাব দেবেন কি মেহমান? এই যে আমি মানুষটা। এতক্ষণে আপনি তো অন্তত বুঝেছেন যে আমি ধর্ম মানি নে? ঘরে আমাব হরিমতী দিদি, ভেতর ঘরে দর্জি ফকিরের দীনদয়াল, তবু আমি কেন মুসলমানী কেতা মেনে চলি? কারণ ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হবে যে! সমাজ ব'লে একটা জিনিস আছে মানেন?

: সমাজ মানি বৈকি? আমাদেব শহুরে সমাজের আঁটাআঁটি কমে আসছে। তবে গ্রাম-সমাজে নানা বন্ধন বা নিয়ম-কানুন আছে মানি।

কামাল প্রতিবাদ ক'রে বললেন, 'আপনি কেমন যেন দায়সারাগোছের সাজানো কথা বলে যাচ্ছেন মহাশয়। শুনুন স্পষ্ট করে বলি। আমাদের গ্রাম-ঘরে লাভ ম্যারেজ ফ্যারেজ খুব একটা হয় না। এখানে ছেলেমেয়ের বাবা মা-ই বিয়ের পাকা বন্দোবস্ত করে। এবারে বলুন মকবুলকে কোন্ হিন্দুবাড়ি বিয়ে দেওয়া যাবে? সবাই তো জানে আমার ঘরে দীনদয়ালের আসন, হরিমতী দিদির বাস। সবাই এটা ভালো করেই জানে যে আমি পুরাণ কুরাণ কোনোটাই অন্তর থেকে মানি নি। তবু কি আপনার ভাইপোর সঙ্গে আমার মীরার বিয়ে দেবেন? দেবেন না। অথচ মীরা আমার রূপসী আর গুণের মেয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স পড়ে। পণের টাকাও আমি অগাধ দিতে পারি। তবু হিন্দুরা তাকে নেবে না। তা হলে উদারতা উদারতা বলে চেঁচান কেন?'

কামাল হোসেনের কথা তো নয় যেন বুলেট। ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে মাথা। বিদ্ধ

হয় একেবারে মর্মস্থলে। কি জবাব দেব ? সত্যিই তো সমাজের ফ্রেম আমাদের অনড়, সংস্কার অতলস্পর্শী। শুধু গ্রামে কেন, শহরেও নয় কি ? আমাদের কোনো ভাইপোই যদি হৃদয়ের উদারতায় ভালবেসে কোনো রোকেয়া খাতুনকে বিয়ে করতে চায়, আমরা কি প্রথমেই বাধা দেব না ? যদি বা তার অতি স্বাধীনচিত্ততার বা ভালো চাকবির ব্যক্তিত্বের সুবাদে সে বিয়ে আমরা মেনে নিই তবুও কি কার্ডে ছাপাতে পারব রোকেয়ার নাম ? তার বাবার সত্যিকারের পরিচয় ? সত্যি এমন বিপদে কখনও পড়ি নি। দুর্গতি তখনও বাকি ছিল। আমার চরম দুর্বল মুহূর্তে কামাল দিলেন আরেক মুষ্ট্যাঘাত। বললেন, 'আপনারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তো অধ্যাপক। আপনি তো আবার সাহেবধনীদের নিয়ে গবেষণা করছেন। তা আপনার একটা মেয়ে আছে শুনেছি। তার বিয়ে দিতে পারবেন কোনো মুসলমান ছেলের সঙ্গে ? আচ্ছা আপনাকেও দিতে হবে না, সে যদি নিজেই বিয়ে করতে চায ? আপনার অধ্যাপিকা-স্ত্রী সহজে রাজি হবেন ? তিনি কি এই ব'লে মেয়েকে গাল দেবেন না যে "ছি ছি, কোন্ বাবার মেয়ে হয়ে তুই কি করলি ? সমাজে কলেজে ছাত্রীদের কাছে আর আমি মুখ দেখাতে পারব ?" কি বলবেন না এই কথা ? বুকে হাত দিয়ে বলুন ? কিন্তু মুসলমান সমাজ আমার ছেলে-মেয়েকে নেবে। আমি নাস্তিক বা উদারপন্থী জানলেও নেবে। সেইজন্য আমাকে আলেম সাজতে হয়। সবাইকে বলতে হয় নামাজ পড়। এর কারণ বোঝেন ?'

: কি এর কারণ ?

: এর কারণ, ভালো হোক মন্দ হোক আমাদের দেশের শরীযতভিত্তিক মুসলমান সমাজ ধর্মের বাইরের আচরণকে খুব বেশি দাম দেয়। সমাজ দেখে, লোকটা নামাজ পড়ে কিনা, মসজিদে যায় কিনা, কল্‌মা মানে কিনা। যদি মানে, ভণ্ডামি ক'রেও মানে, তবু তার সাত খুন মাপ। এই জন্যে আমি আচরণে মুসলমান। আমি বাবার মতো ফকিরি করলে কি সমাজে এত গণ্যমান্য হতাম ?

একেবারে ঈশ্বরপ্রেরিত দূতের মতো একজন এই সময় বেরিয়ে এসে অসহায় আমাকে বাঁচালেন। হরিমতী দিদি। গেরুয়া আলখাল্লা। গলায় তসবী মালা। টকটকে গায়ের রঙ। সৌম্য চেহারা। দারুণ একটা হাসি মুখে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে কামালকে ধমকালেন, 'হ্যাঁরে খ্যাপা, শরিয়তে কোথায় লেখা আছে যে বাড়িতে মেহমান এলে তাকে খেতে বসতে না দিয়ে শুধু বকাঝকা করতে হয় ? জ্ঞানহারার মতো চ্যাঁচাচ্ছিস ? ওকে ঘরে আনবি নে ?"

'বেশক বেশক। চলুন চলুন। তসরীফ রাখিয়ে' কামাল মুখ টিপে হাসলেন।

ঘরের ভেতরে বসিয়ে হরিমতী দিদি আমাকে পাখার বাতাস করতে লাগলেন,

'মুসলমান হলেই কি হয় ? মেহ্‌মানের কদরদানী জানিস ? সে জানত বাবা ।'

কামাল আমার দিকে চোখ টিপে দিদিকে বলল, 'এখন তোমার হিন্দু ভাইয়েব খিদ্‌মদ্‌গার কর । তার বহুত পরেশানি হয়েছে । মুসলমান ভাইটি চুলোয় যাক । তা হিন্দু ভাইয়ের জন্য সারা সকাল ধরে যে ক্ষীর রাবড়ি লুচি হলো তা কি এই দুষমন ভাই পেতে পারে না ? খাওয়া-দাওয়ায় কিন্তু হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই ।'

'বেরো এখান থেকে' পাখাব বাঁটের এক ঘা খেলেন কামাল ।

'তুই কি না খেয়ে ছাড়বি নাকি ? লজ্জা করে না ? গোপাল-মীরা বাড়ি নেই, খোদাবক্স খায় নি । তোর এত নোলা আসে কোত্থেকে ?'

'পালাই, ব্যাপার খারাপ' ব'লে কামাল সত্যিই চললেন । যাবার ঠিক আগে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'একটু চারদিক ঘুরে আসি । পেশেন্টটাও দেখে আসি । জলখাবার খান । হরিমতী দিদির সঙ্গে কথাবার্তা বলুন । তাঁর সঙ্গেই তো আপনার আসল কারবার । দুপুরে খেয়ে উঠে আবার তর্ক হবে কেমন ? আর হ্যাঁ, ভালো কথা, দিদির গান একটা শুনবেন তোয়াজ ক'রে । দিদির আমার স্নেহ নেই, মায়া নেই, দরদ দুঃখ কিছু নেই । চেহারাও তো দেখছেন পেঁচির মতো, তাই আব্বাজান বিয়ে দিয়ে যেতে পারে নি । আমার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে । তবে দিদির আমার গানের গলাটা বড় ভালো । ঐ গানটা শোনায় ব'লে দুবেলা দু মুঠো খেতে পায় । নইলে কবে তেড়িয়ে দিতাম ।'

'ভাগ্‌ ভাগ্‌', হরিমতী দিদি হাসিমুখে এগিয়ে ভাইকে মারলেন এক ঘুঁষি । বললেন, 'তোর পয়সা লবডংকা । সব আমার বাবার । এই, তাড়াতাড়ি খেতে আসবি সোনা ।'

এমন একটা মধুর পরিবেশে মনটা স্বভাবতই নরম হয়ে যায় । হরিমতী দিদির তৈরি ক্ষীর রাবড়ি লুচির স্নিগ্ধ স্বাদ সেই নরম মনে এমন একটা সুবাসিত উদ্যানের ব্যাপকতা আনে যে আমার সব দিকে তালগোল পাকিয়ে যায় । হরিমতী দিদি আমার মনের সেই উথাল-পাথাল বুঝে কাছে আসেন। স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'সবই মানুষের লীলা দীনদয়াল আমাকে কতই দেখালেন । নইলে আমার এই বাড়িতে ঠাঁই হয় ? এ বাড়ি তো স্বর্গ । শুধু তো আমার পাগলা ভাইটিকে দেখলে । রসুই-ঘরে সুন্দরী বউবিটিকে এখনও তো দ্যাখো নি । সে তোমার জন্যে চালের রুটি, মুর্গির মাংস বানাচ্ছে । মীরা গোপালকে দেখলে না, একেবারে সোনার ছেলেমেয়ে । আর সবাইকে টেক্কা দিয়ে সেই শয়তান নচ্ছার খোদাবক্সটা । কে জানে ছোঁড়া আজ বাড়ি আসবে কিনা ।'

আমি ভাবলাম দীনদয়াল আমাকেও বড় রকম দেখালেন না । মাধুর্যের এমন বর্ণময় ছবির চারপাশে মানবিকতার এমন পোক্ত ফ্রেম তো আগে কখনও

দেখিনি। অনেকটা যেন আপ্লুত হয়েই বললাম, 'দিদি, তোমার কথা শুনব আমি। তুমি কেমন ক'রে এ বাড়ি এলে ? কোথাকার লোক তুমি ?'

স্নিগ্ধ লাজুক হেসে দিদি বলেন, 'তুমি তো বৃত্তিহুদোর পালবাড়ি গেছ ? সেখানেই আমার লালন-পালন। আমি ওদের "দোরধরা"। ওকি অমনধারা তাকিয়ে রইলে কেন ? "দোরধরা" মানে বোঝ না ?'

: না তো।

: শোন বুঝিয়ে দিই তোমাকে। আমরা জাতে কুমোর। আমার বাবা-মা থাকত হুদো গাঁয়ের পাশে আড়ংসরষেতে। তাদের যখন কিছুতেই সন্তান হলো না তখন পালবাড়িতে দীনদয়ালের কাছে সন্তানের জন্যে মান্‌সা করলে আমার জন্ম হয়। একেই বলে দোরধরা। ছোট থেকেই নাকি আমার ধম্মে মতিগতি। তাই বাবা-মা বিয়ে না দিয়ে পালবাড়িতে রেখে দেয়। তোমাকে যে শরৎ পাঠিয়েছে তার বাবা লালচাঁদ পালের কাছে আমার দীক্ষাশিক্ষা। আমি জন্মবৈরেগী। দীনদয়ালের চরণে পড়ে থাকি।

: এখানে এলে কি ক'রে ?

: কেন ? ফকির বাবার সঙ্গে। তুমি শোন নি কামালের বাবা দর্জি ফকিরের ঘটনা ? তার বিবি যখন পালালো, বাড়ি গেল পুড়ে তখন তো একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েছিল। দীনদয়ালের কৃপায় সব ঠিক হয়। কিন্তু মানুষটা তো শেষ পর্যন্ত ফকির হয়ে গেল। সংসার দেখে কে ? দীনদয়ালের সেবাপুজো করে কে ? কামালকে দেখে কে ? ফকিরকে 'বাবা' বলে ডেকেছিলাম যে ! বাবা তাই যখন বললে, 'মা, তুই না গেলে আমি বাঁচব না,' তখন আসতে হলো।

হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন দিদি। বললেন, 'কতদিন হয়ে গেল মানুষটা মাটি নিয়েছে। আমাকে মায়ায় বেঁধে রেখে গেল। এই সোনার সংসারের মায়ায় বড় আটকে গেছি ভাই। বুড়ো হয়েছি। চলে গেলে খোদাবক্সকে কে দেখবে ? দীনদয়ালের কী হবে সেবাপুজো ? তাই ভ'বি।'

খাওয়াদাওয়ার আগে ঠিক দুপুরে হরিমতী দিদি আমাকে নিয়ে গেলেন দীনদয়ালের ঘরে। ঠাণ্ডা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একটা প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের একপাশে ছোট জলচৌকি। তাতে পাট করা বস্ত্র, তার ওপর কটা ফুল ছেটানো। ত্রিশূল ফকিরিদণ্ড আশাবাড়ি আর হুঁকো। পাল-বাড়ির কোনো গুরুর একজোড়া খড়ম। সামান্য দীন আয়োজন। দীনদয়াল সাহেবধনী তো মূর্তিধারী সাকার নন।

দিদি আসনে ব'সে নানা ক্রিয়াকলাপ করতে লাগলেন। ধূপের আকর্ষণী গন্ধে, প্রদীপের ঘি-পোড়া গন্ধে চন্দনের গন্ধে ঘরখানি উত্তাল। শান্ত নিরুদ্বেগ শীতল

পরিবেশে দীনদয়ালের দিবসী পুজো ভোগরাগ চললো। হঠাৎ দিদি উঠে দাঁড়িয়ে চামর দোলাতে দোলাতে বললেন :

এসো গো ধেয়ানে বোসো গো আসনে
বরণ করি তোমাকে বজ্রভরনে।
চামর ঢুলাই তোমার সুখের কারণে।
জয় দীনবন্ধু দীননাথ।

মেঝেতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বললেন :

জয় দীনদয়াল অটলবিহারী করোয়াধারী।
দীনদয়াল সাহেবধনীর নামে একবার হরি হরি বলো
হরিবোল

আবার খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে বললেন :

ক্লিং ক্লিং দীনদয়াল সাহেবধনী সহায়।
সাহেবধনী আল্লাধনী সহায়।
গুরু সত্য। চারিযুগ সত্য। চন্দ্রসূর্য সত্য।
খাকি সত্য। বাক সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য।
গোঁসাই দরদী সাঁই
তোমা বই এ জগতে আমার কেহ নাই।

আমি ভাবতে লাগলাম কি বিচিত্র এই লৌকিক ধর্মের জগৎ। হরিবোল ধ্বনির সঙ্গে আল্লার নাম মিশে যাচ্ছে। কি অদম্য বিশ্বাসের জোরে গুরু সত্য আর কাম সত্য একই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। চারিযুগ চন্দ্রসূর্য সবই সত্য? সেইসঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবের বীজমন্ত্র ক্লিং শ্লিং ধ্বনিও একাঙ্গ? কেমন ক'রে হয়? যেমন ক'রে এ ঘরের নির্জন প্রকোষ্ঠে মিলে যায় ধূপগন্ধের সঙ্গে চন্দনসুরভি আবার তার সঙ্গে প্রদীপের ঘিয়ের পোড়া গন্ধ? দীনদয়ালের এই শান্ত শীতল আধো-অন্ধকার নিরুদ্বেগ ঘরখানির সঙ্গে বাইরের দাবদাহ-ঘেরা গ্রীষ্ম প্রকৃতির কোনো মিল নেই অথচ। মিল নেই মানুষে মানুষেও। এ ঘরের বাইরে পা দিলেই আমি হিন্দু, কামাল হোসেন মুসলমান। সেখানে মকবুলের সঙ্গে আমার মেয়ের কোনোদিন মিলন হতে নেই।

যেন আমার স্বপ্নাচ্ছন্নতা ছিন্ন করতেই একসময় হঠাৎ শেষ হয়ে গেল দীনদয়ালেব দিবসী পুজো। বাইরের বারান্দায় এসে বসলাম ধ্বস্ত দুপুরে। চার দিক গরমের ভাপে দুঃসহ। হরিমতী দিদি বোধ হয় অন্তর্যামীর মতো বুঝলেন আমার মনের তাপ আর অন্তর্বেদনা। খুব শান্তভাবে গায়ে হাত বুলিয়ে আমাকে বললেন, 'তুমি বোসো এখানে দু দণ্ড। আমি তোমাকে একখানা গান শোনাই।

শান্তি পাবে মনে।' আশ্চর্য মধ্যসপ্তকে শুরু হলো কণ্ঠবাদন

বাম কি রহিম করিম কালুল্লা কালা
হরি হরি এক আত্মা জীবনদত্তা
এক চাঁদে জগৎ উজ্জ্বলা।
আছে যার মনে যা সেই ভাবুকতা
হিন্দু কি যবনের বালা ॥

লক্ষ্মী আর দুর্গাকালী ফতেমা তারেই বলি
যার পুত্র হোসেন আলী মদিনায় করে খেলা
আর কার্তিক গণেশ কোলে ক'রে
বসে আছেন মা কমলা।

হঠাৎ গাঁয়ে কাঁটা দিলো একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঝড়ে। কে লিখেছিলেন এমন গান? সে কি আজকের দিনটার কথা ভেবে? মা কমলার কোলে কার্তিক গণেশের মতোই কি হরিমতী দিদির কোলে বসে আছি আমি আর কামাল হোসেন? একই স্নেহে ভালোবাসায় উত্তাল হয়ে? এ কোন মানবিক মনীষী এক শতাব্দীর আগের গ্রামে গেঁথে গিয়েছিল এমন গান? ততক্ষণে গানের শেষ অংশে পৌঁচেছেন দিদি গাঢ় উচ্চারণে

কেউ বলে কৃষ্ণরাধা কেউ বলে আল্লাখোদা
থাকে না তেষ্টা ক্ষুধা
ঘুচে যায় জঠরজ্বালা।
মনে ভেবে দ্যাখো একই সকলে
পাবো রে এক নামের মালা।
এক লয়ে ভাগলবাটি এক পানি একই মাটি
এক হাওয়া জেনো খাঁটি
একের কবল এই কলা ॥

আমি অপলক চেয়ে থাকি হরিমতী দিদির দিকে। তাঁর চোখে জল। সে কি আনন্দের না ভক্তির?

পাশাপাশি আমি আর কামাল হোসেন খেতে বসলাম। দিদি বসলেন সামনে একখানা হাতপাখা নিয়ে। পরিবেশন করতে লাগলেন কামালের বিবি। গাঁ-ঘরের লজ্জাশীলা মহিলার মতো ঘোমটাটানা। দুখানা মায়ালী চোখের বিস্ময় ঘোমটার ফাঁকে ধরা পড়ছিল। উনুনের আঁচের মতো উজ্জ্বল রঙ গরমের তাপে

ফেটে পড়তে চাইছে যেন। চমৎকার স্বাদু রান্না। কামাল বারবার খুব তারিফ জানালেন। খেয়ে উঠে ভেতরের শোবার ঘরের বিছানায় বসলাম দুজনে। কামাল সিগারেট ধরিয়ে তাঁর বিবিকে ডাকলেন। সসংকোচে ঢুকে একপাশে দাঁড়ালেন অবগুণ্ঠনবতী। কামাল উঠে দাঁড়িয়ে বিবির ঘোমটা খুলে দিয়ে বললেন, 'জগতের আলো নূরজাঁহা'। একদৌড়ে পালালেন বিবি তাঁর বৈদ্যুতিক চোখের এক দারুণ দৃষ্টির বিপ্লব হেনে।

হো হো করে প্রচণ্ড শব্দে হেসে কামাল বললেন, 'সকালে আপনাকে বলা হয় নি, আমি আরো দুটো বিষয়ে অদ্বিতীয়। চারপাশের দশ-বিশ খানা গাঁয়ের মধ্যে যত এলেমদার মুসলমান আছে তার মধ্যে একমাত্র আমার ঘরে একখানা মাস্তর বিবি। আর দু নম্বর খবরটা হলো আমাদের দুজনের বিয়ে ভাবভালবাসা করে।'

খুব তারিফ চোখে তাকালাম। তার পরে বললাম : আপনার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ নাকি তার কম ?

: তা পঞ্চাশই ধরুন। কেন ?

: ভাবছি কতদিন আগে এই ভাবভালোবাসাটা হয়েছিল। তখন আপনার কত বয়স ?

: সে-সব কি মনে আছে ? তবে এক কথায় শুনবেন ? তখন আমার অনুরাগের বয়স।

ঘরের চৌকাঠের ওপারে কি একটা কাঁচের ঝাড়বাতি ভাঙল মধুর শব্দ করে ? আসলে খিল খিল হেসে পায়ের মল চুটকি বাজিয়ে দৌড় লাগালেন অনুরাগিণী।

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে কামাল বললেন, 'জীবনটা এমনই খুব সুন্দর। মানুষও তো আসলে আনন্দেই বাঁচতে চায়। কিন্তু আজ ঘর আর বার আলাদা হয়ে গেছে। এমন যে সুখীসুন্দর মানুষটা আমি, বাইরে গেলেই ভোল পাল্টাতে হবে। বাজে কথা, সাজানো কথা, মনরাখা কথা। অথচ আমার রক্তে দর্জি ফকিরের হক্ রয়েছে। সে মানুষটা কপটতা জানত না। মারফতী ফকির তো ?'

আমি বললাম : এই শরীয়ৎ মারফত অনেকবার শুনেছি। একটু খোলসা করে বলুন তো তার কী তফাত ?

হরিমতী দিদি ঘরে ঢুকতে আমার কথাটা শুনেছিলেন। বললেন : ও কি বলবে ? ও তো জ্ঞানছাড়া। আমি বুঝিয়ে দিই। শরীয়ৎ হলো কিনা গাছের গুঁড়ি। যদি ফলফুল পেতে চাও তবে কি গুঁড়িতে পাবে ? উঠতে হবে গাছের ডালে। মারফৎ হলো গাছের ডাল ফল ফুল। শরিয়ৎ থেকেই মারফৎ। কিন্তু মারফৎ কবুল হলে শরীয়তের দাম কি ?

আমি এবারে কামাল হোসেনকে বললাম : আপনার মতো মাতব্বর মুসলমান ব্যক্তির ঘরে যে হরিমতী দিদির মতো একজন খোদ হিন্দু বাস করেন তাতে আপনাদের সমাজে আলোড়ন হয় না ?

: সত্যিই হয় না যে তার একটা কারণ দীনদয়ালের নামে আমাদের এ দিগরে সবাই ভক্তিমান। আমার বাবার আমল থেকে আমাদের বাড়িতে দীনদয়ালের নামে কত মান্‌সা, কত সিদে, সে আপনি ধারণা করতে পারবেন না। চোত মাসে মচ্ছবের সময়ে আমার এক পয়সা খরচ করতে হয় না। গাঁয়ের সমস্ত মানুষ চাল ডাল আনাজ তরি-তরকারি নিজেরাই আনে, এনে অন্ন মচ্ছব করে। হিন্দুই বলুন আব মুসলমানই বলুন এখানকার সাধারণ মানুষ দীনদয়ালের নামে এককাট্টা। তার ওপরে আছে আমার বুড়ি হরিমতী আপা। সারা এলাকায় খুব খাতির। তার কথায় সবাই এক পাযে খাড়া। আসলে সারাজীবনে একটা ব্যাপার কি দেখলাম জানেন ? ভালো জিনিসের মার নেই। এই যে আমার এত দালানকোঠা বারামখানা, দোকান, গমকল, পোস্ট অফিস, হেকিমি, পার্টিবাজি তবু আমাকে লোকে ভয়ে ভক্তি করে। ভালবাসে না কেউ। ভোটে দাঁড়ালে কেন জিতি জানেন ? ক্ষমতা আছে ব'লে ? টাকা আছে ব'লে ? ফক্কা। ভোটে জিতি স্রেফ দর্জি ফকিরের ছেলে ব'লে। ভোট দেয়, জানে হারলে দিদির মনে দুঃখ হবে। তা হলে এই যে আমাব ভোটে জেতা সেকি আসলে জিৎ না হাব ?

দেখতে দেখতে বেলা গড়ায়। বিদায়লগ্ন এগিয়ে আসে। মনে ভাবি সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনদয়ালের এতবড় যে আসন সে আমার এখনও দেখা হয় নি। আমি বৃত্তিহুদার পালবাড়িতে খোদ দীনদয়ালের আসন দেখেছি। আকন্দবেড়েতে দেখলাম আসুনে ফকিরের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সাধারণ মানুষ কেমন করে পেয়েছে দীনদয়ালকে তা আমার আজও দেখা হলো না।

গরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার আগে নূরজাঁহা দূর থেকে সালাম দিলেন নতনেত্রের সৌন্দর্য ছড়িয়ে। কামাল হোসেন বললেন, 'আবার আসবেন অধীনের গরিবখানায়। আর বাস-রাস্তায় বাউণ্ডুলে খোদাবক্সের হিন্দু হোটেলে একটু ঢুঁ মেরে বলবেন তার ফুফু ক্ষীর আর গোস রুটি নিয়ে বসে আছে। সে হতভাগা যেন বাড়ি আসে।'

হরিমতী দিদি বললেন, 'দীনদয়াল আবার যেন টানেন তোমায় এদ্দিকে। কিন্তু তখন কি আমি বেঁচে থাকব ? দীনদয়ালের পাট এ বাড়িতে আর কদিন ? বুড়ো হয়েছি। আমিও মরব আর দীনদয়ালের পাটও উঠে যাবে।'

আমাদের দেশে কিছুকাল একটা নতুন কথার খুব চল হয়েছে। কথাটা হলো 'ফিলড ওয়ার্ক রিসার্চ'। এর একটা অদ্ভুত বাংলা হলো 'ক্ষেত্র গবেষণা'। সমাজবিদ্যা নৃতত্ত্ব কিংবা লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেন যাঁরা তাঁদেব কাছে এই 'ক্ষেত্র গবেষণা' একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। চলো অযোধ্যা পাহাড়ে, চলো কালীঘাটের পোটোপাড়ায়, চলো ঘোষপাড়ায় সতী মা-র মেলায়। এসব ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের একটা দল নিয়ে থাকেন একজন বা দুজন গম্ভীরদর্শন অধ্যাপক। অনেক সময় স্টাডি-টিমে বিদেশী-বিদেশিনীদেরও দেখা যায়। সবাইয়ের কাছে নোটবই আর ডট পেন থাকে। দলে অন্তত একটা ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডার থাকেই।

এখানে একটা সত্যি বলতে আপত্তি নেই যে টেপরেকর্ডার আর ক্যামেরার চল যখন ছিল না তখনই অবশ্য ভালো কিছু কাজ এদেশে হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন বা নির্মলকুমার বসু, মনসুরউদ্দীন, যোগেশ রায় বিদ্যানিধি, দীনেশচন্দ্র সেন কিছুকাল আগেও যত কাজ করে গেছেন এখন তার ধারে কাছে কেই বা যেতে পেরেছেন ? অক্ষয়কুমার দত্ত, উইলসন সাহেব কিংবা যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতো খুব পুরনো লোকেব কথা তুললে তো আরও লজ্জা লাগে।

আসলে খুব সমারোহ ক'রে গেলে অনেক সময় ঠিক ঠিক জিনিস আদায় হয় না। ক্যামেরা রেকর্ডার এসব দেখলে গ্রামের সাধারণ লোক খুব গুটিয়ে যায়। কারুর এসবে ঘোরতর আপত্তিও থাকে। ফলে কখনও তারা কিছু বলে না বা ইচ্ছে করে ভুলভাল বলে দেয়। বৃত্তিহুদার শরৎ পাল আমাকে একবার একজন লোক-সংস্কৃতিবিদের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আরে তিনি মশায় সব কিছু প্রমাণ রাখতে চান ফটো তুলে। আমার অত প্রমাণ রাখার দায়টা কি বলুন তো ?' একবার এক গ্রাম্যগুরুর কথায় খুব মজা পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার মতোই একজন এসেছিলেন সেবার। সঙ্গে এক মেয়েছেলে। তা সেই মেয়েছেলেটাকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে বলে কিনা "দাঁড়ান ফটো তুলব"। বুঝুন আস্পর্ধা। আমি বলে কখনও নিজের পরিবারকে নিয়েই ফটো তুলি নি তো কোথাকার কোন্ মেয়েছেলে। ছিঃ।'

এইসব দেখেশুনে 'ক্ষেত্র গবেষণা'-র ব্যাপারে আমি খুব সাবধান সতর্ক থাকি। একটা সুবিধে আমার এই যে আমার কোনো দল নেই। একেবারে নিরম্বু একা। বড়জোর সঙ্গ দেবার জন্য জুটিয়ে নিই একজন খুব শান্ত ধরনের ছাত্রকে। যাতায়াতের পথে গল্প হয়। তার দেখার সঙ্গে আমার দেখাটা ঝালিয়ে নেওয়া

যায়। কম বয়সের সুবাদে সে ছেলেছোকরাদের কাছ থেকে বাড়তি কিছু খবর আনতেও পারে। সব চেয়ে বড় কথা গ্রামদেশে একা একা চলাফেরার কতকগুলো অসুবিধাও আছে, যদি না সে গ্রামটার মানুষজনের সঙ্গে আগে থেকে চেনাজানা থাকে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে ঈশ্বরচন্দ্রপুর যাবার সময় সঙ্গে নিয়েছিলাম মনোরঞ্জনকে। মূলত গ্রামের ছেলে। তার মানে কষ্টসহিষ্ণু, বেশ খানিকটা হাঁটতে পারে, মোটামুটি ডালভাতে সন্তুষ্ট। তাছাড়া বাথরুম কোথায়, স্নান করব কোন্‌খানে বলে জ্বালাবে না। দিব্যি নদী বা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঈশ্বরচন্দ্রপুর খুব গরিবদের গ্রাম। সেখানে কামাল হোসেনের মতো দলিজ নেই।

ঈশ্বরচন্দ্রপুরে যার বাড়িতে আমরা উঠলাম তার নাম গণেশ পাড়ুই। গোয়াড়ির বাজারে সে চাঁপাকলা বেচে। সেই সুবাদেই আলাপ। আমি তাব খদ্দের। তাকে সাহেবধনী বলে শনাক্ত করা অবশ্য নিতান্তই আমার কৃতিত্ব। একদিন তার কাছে খুব সুন্দর গাছে-পাকা কলা দেখে বলেছিলাম · কি ব্যাপার, আজ তো কারবাইড পাকা নয়, এ যে গাছে পাকা!

খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল : রোজ পাইকেরের কাছ থেকে কিনে এনে বেচি, আজ বাড়ির গাছের কাঁদি নামিয়ে এনেছি। সবই দীনদযালের কৃপা।

দীনদয়ালের কৃপা? এই এক কোড ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মানুষটাকে ধ'রে ফেলে বলি : তুমি তা হলে হুদোর পালবাড়ির ঘরের শিষ্য? অগ্রদ্বীপ যাও, তাই না?

কৃতার্থ হেসে বলেছিল, 'বাবুর তো তা হলে আমাদের ঘরের সবই জানা। একদিন আসুন আমাদের গ্রামে। ঈশ্বরচন্দ্রপুর, চেনেন তো? আমার নাম গণেশ পাড়ুই।'

গণেশ পাড়ুই মানুষটা খুবই গরিব। তবে নিঃসন্তান তাই হয়তো খুব অভাবী নয়। একখানা কুঁড়েঘর। তাতে বাঁশের মাচা। তাতেই শয্যা। ঘরের চত্বরে উনুন। রোদে ঝড়ে জলে সেখানেই কোনোরকমে দুটি ফুটিয়ে নেয় তার বউ। আজকে তার বাড়িতে উৎসব-বিশেষ। বউকে সে হেঁকে বলে : বাবুরা এয়েচেন। ডালটা এট্টু ঘন করে রাঁধো।

ঈশ্বরচন্দ্রপুরে আমরা গবেষণার কাজে দু দিন দু রাত থাকব। তাই সব দিক বাঁচিয়ে সকালবেলা পৌঁছে গণেশের সম্মান রেখে সঙ্গে-আনা কিছু জিনিস নামিয়ে দিলাম ব্যাগ থেকে। আলু পেঁয়াজ ডিম চা চিনি দুধ পাউরুটি। 'কিছু মনে করলে না তো?' 'সবই দীনদয়ালের খেলা, নইলে তিনি জানলেন কি ক'রে যে আমার হাতে একটা পয়সাও নেই? অসুখ হয়ে দুদিন বাজারে যেতে পারি নি।'

সেদিন সারাদিন ধ'রে গ্রামের কাজ সেরে সন্ধে খানিকটা গড়িয়ে গেলে গণেশের বাড়ি ঢুকলাম। ততক্ষণে সে চাঙ্গা। চা মুড়ি খেয়ে উঠোনে বসেছি খেজুরপাটি বিছিয়ে। উঠোন থেকে ভাতের গন্ধ উঠছে। শুক্লপক্ষ চলছে বুঝি। আকাশে বেশ ভরাট চাঁদ। গণেশ একখানা একতারা এনে পিড়িং পিড়িং করতে লাগল। কী আর এমন গাইবে গণেশ। একখানা দুর্বোধ্য শহর-নাচানো 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' মার্কা গাইবে হয়তো। সে গান আবার থামবে তো ? হঠাৎ গণেশ আমাকে চমকে দিয়ে গেয়ে উঠল :

আমি সুখের নাম শুনেছিলাম
দেখি নাই তার রূপ কেমন।
আমার দুখনগরে বাটি পরিবার
দুঃখ রাজার বেটি
দুজনায় দুঃখে করি কালযাপন ॥

এ যে একেবারে আত্মজৈবনিক ! এতখানি বিস্ময় আমার জন্যে দীনদয়াল রেখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রপুরের সন্ধ্যায় ! গণেশ গেয়ে চলে যেন গভীর সন্তাপে আত্মস্থ হয়ে :

মনে করি সুখের দেশে
সুখী হয়ে থাকবো ব'সে
দুঃখু বেটা তাড়িয়ে এসে
কেশে ধ'রে করে শাসন।
দুখের বেলা দুই প্রহরে
দুখের অন্ন করি ভোজন।
দুখের শয্যা পেতে সন্ধ্যাকালে
দুঃখেতে করি শয়ন ॥

মনোরঞ্জন ভাবল গানটা বোধ হয় এখানেই শেষ। তাই উচ্ছ্বাসে বলে উঠল : আহা, কি গান। আমি এক্ষুনি লিখে নেব। এ তো আমাদের সকলের গান। এটা লিখেছে কে ? তুমি ?

লম্বা জিভ কেটে গান থামিয়ে গণেশ বলল : এত বড় ভাবের গান আমি লিখতে পারি কখনও ? অগ্রদ্বীপে ঈশুপ ফকিরের কাছে এ গান আমার শেখা। ভনিতে পাই নি, তবে গানের ভাবে মনে নেয় এ আমাদের যাদুবিন্দুর গান। বাকিটুকু শোনেন :

দুঃখু আমার মুক্তি গতি
দুঃখু আমার সঙ্গের সাথী

হৃদয়ে জ্বলে দুঃখের বাতি
দগ্ধ ক'রে দিল জীবন।
আমার দুখের কথা রইল গাঁথা
করবে কে তা নিবারণ ?

সত্যি বলতে কি, এমন একটা গান এ গ্রামে শুনতে পাব ভাবি নি। কোথায় যে কি মিলে যায় !

রাতে শোবার আগে গণেশ পাড়ুইয়ের সঙ্গে অনেক কথা হলো। ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে নাকি দীনদয়ালের একচেটিয়া ভক্ত। 'বাবু, অগ্রদ্বীপের মেলায় আমাদের গ্রাম ঝেঁটিয়ে মানুষ যায়। সব দীনদয়ালের নামে মতিমান। এখানে মচ্ছব হয় ফাগুন মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে। সামনের বার আসবেন বাবু সে সময়ে। ঈশুপ ফকিরের গান শোনাব। তাঁর গানে আমাদের খুব শান্তি হয়।'

পরদিন সকালে আমরা গিয়ে বসলাম ঈশ্বরচন্দ্রপুরের একপ্রান্তে জলাঙ্গী নদীর ধারে এক বটগাছতলার বাঁশের মাচায়। গ্রামদেশে গাছতলায় এমন বাঁশের মাচা থাকে, সেগুলো এজমালি। যার যখন দরকার বসে। আগের দিন এই মাচায় ব'সে অনেকক্ষণ ইনটারভিউ নেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রধান কাজ একেবারে সাধারণ পর্যায়ের সাহেবধনীদের নিয়ে। যারা দীনদয়ালকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার 'পঞ্চতত্ত্ব' অর্থাৎ চাল ডাল আর তিনরকম আনাজ দিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে নিবেদন করে। এরাই আসুনে ফকিরদের জরিমানা দেয়, সেবাপূজা করে। অগ্রদ্বীপে চরণ পালের থানে হত্যে দেয়। বলতে গেলে সাহেবধনীদের এরাই মূল জনশক্তি।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবলই আমার চোখ চলে যায় একজন শীর্ণ চেহারার মাঝবয়েসী লোকের দিকে। গতকাল থেকেই লোকটিকে একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে। পরনে নীল লুঙ্গি আর ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি। সারাদিন সামনের মাচায় নিস্পৃহভঙ্গিতে বসে পা নাচায়। মুখখানা মলিন। চুলে অনেকদিন তেল পড়ে নি। কোনো চাহিদা নেই, কোনো কৌতূহল নেই। চাহনিতে শুধুই শূন্যতা। কেউ হয়তো একটা বিড়ি দিল সেটাই টানল খানিকক্ষণ। যেন তাতেই খানিকটা সময় কেটে যাওয়ায় লোকটা খুব কৃতার্থ। সবাই ওকে খুব অবজ্ঞার সঙ্গে 'পচা' ব'লে উল্লেখ করে। যেন পচা লোকটা নিতান্ত উঞ্ছ উদ্‌বৃত্ত। জাতে নাকি দুলে। পচার গালে ভয়ানক এক আঁচড়ের দাগ। তাকে ডেকে সামনে বসানো গেল। খুব সংকুচিত ভঙ্গি তার। জিগ্যেস করলাম, 'পচা তোমার গালে ঐ মস্তবড় দাগটা কিসের ?'

'আজ্ঞে, ওটা হলো বাঘের আঁচড়' খুব নির্বিকার জবাব।

: কি ক'রে হলো ?

: তা বিশ পঁচিশ বছর আগে পাশের গাঁয়ের জঙ্গলে বাঘ এয়েলো। শিকারীবাবু মাচান বেঁধে বসেছিল। আমরা দুলে বাগদীরা চার দিক থেকে জঙ্গল ঘিরে ক্যানেস্তারা টিন বাজাচ্ছিলাম। আমাদের বলত বিটার। খুব হৈ চৈচেঁচামেচিতে বাঘটা গেল হপ্‌কে। এলোমেলো ছুটে শিকারীর দিকে না গিয়ে পড়ল এসে আমাদের দলের সামনে। তার পর বাঘমহাশয় দিলেন এক ইয়া লম্ফ। আমাদের টপকে পেলিয়ে যাবার সময় আমার গালে লাগল তেনার এক মোক্ষম আঁচড়। তাতেই দগদগে ঘা হয়েলো। তেমনি পুঁজ রক্ত। সদরের হাসপাতালে দু দুটো মাস থাকত হয়েলো। দীনদয়ালের কিরপায় জানে বাঁচলাম। তবে দাগটা থেকে গেল আজ্ঞে। এ গাঁয়ে তো তিনজন পচা আছে। 'তবলা পচা' কিনা তবলা বাজায়, 'মুদি পচা' দোকানী, আর আমাকে সবাই বলে 'ঘা পচা'।

এত নিস্পৃহ মানুষ যে কথা এগোনো মুশকিল। আমাদের কাজ চলে। পাড়াগাঁর দুপুরও এগোয়। শেষ ফাগুনের রোদ চনমনে হয়। আমাদের পেছনেই ঘাট। লোকজন সামনের ধারে খানিক এসে দাঁড়ায়, শোনে আমাদের কথা, তারপরে কোমরে গোঁজা বাঁশের পাত্র থেকে সরষের তেল মাথায় গায়ে চাপড়াতে চাপড়াতে ঘাটে নামে। খানিকটা জল উথালপাতাল করে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে সপ্‌সপ্‌ শব্দ তুলে বাড়ি যায়। খানিক পরে তিনটে চারটে নাগাদ সেই স্নাতভুক্ত মানুষজন একে দুইয়ে এসে জমে আমাদের মাচার কাছে। দেখে আমাদের কার্যকলাপ। তখন তাদের দেহ তৈলচিক্কণ, পরনে কাচা ধুতির মালকোঁচা। মুখে জ্বলন্ত বিড়ির মাদক। কিন্তু লক্ষ রাখি যে পচা তার মাচা থেকে ওঠে না। তার মানে স্নান করে না, খায় না। বেলা গড়ায়। আমাদের সঙ্গে পাউরুটি ডিমসেদ্ধ কলা। সকালে ফ্যানভাতে খেয়ে এসেছি কেননা দুপুরে গণেশের বাড়ি ফিরব না। সে গোয়াড়ি বাজারে কলা বেচতে গেছে।

আমাদের টিফিন খাওয়ার সময় হ'তে পচাকে ডেকে বললাম : পাউরুটি কলা ডিম খাবে ?

'দ্যান' খুব অচঞ্চল ভঙ্গিতে নিয়ে মাচায় গিয়ে ব'সে খেলো খুব তাড়াতাড়ি। সামনের টিউবওয়েলে জল খেয়ে আবার ব'সে পা দোলাতে লাগল।

ব্যাপার দেখে মনোরঞ্জন তার মাচায় গিয়ে ব'সে নিচুস্বরে খানিক কথা বলল। সে নাকি এমন মানুষ বেশি দেখে নি। দীনদয়ালের ব্যাপারে পচার কাছে আমার কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব ব'লে মনে হয় নি। লোকটা একেবারে বিশেষত্বহীন, একঘেয়ে। কথা বলতেও উৎসাহ পায় না। ঘণ্টাখানিক পরে এসে মনোরঞ্জন উত্তেজনা চেপে আমাকে বলল : জানেন স্যার, পচার কোনো জমি নেই,

ফিকস্‌ড্‌ ইনকাম নেই। লেখাপড়া জানে না। একখানা কুঁড়েঘরে থাকে, তার উত্তরকোণের চালা ভেঙে গেছে। 'এবারে চোতের শেষে যদি দীনদয়াল দেন তবে খড় জোগাড় করে চালার ঐখেনটা ছাইব' এই কথা বলল। স্যার ওকে দশটা টাকা দেবেন ?

'দাঁড়াও দাঁড়াও' আমি মনোরঞ্জনকে বোঝাতে চাই, 'না হয় দেওয়া গেল। তাতে পার্মানেন্ট সলিউশন কি হবে ? দশ টাকা ফুরোলে তার পর ? এ গায়ে পচা নামে তিনজন আছে, কিন্তু পচার মতো অভাবী লোক আছে অনেক।' মনোরঞ্জনকে খানিকটা চাঙ্গা করবার জন্যে বললাম, 'ডাকো ওকে। কিছু জিগ্যেস করি।'

খুব নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে সে সামনে দাঁড়িয়ে আঙুলের নখ দিয়ে মাটিতে চিত্তির আঁকতে লাগল। এদিকে বিকেল শেষ হয়ে আসছে। আমি খুব সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'পচা, কাল আর আজ দুদিনই তুমি দুপুরে স্নান কবলে না, বাড়ি গেলে না। কেন ?'

: ছ্যান করলে খিদে পায় বড্ড। বাড়ি যাই না, খাব কী ? বাচ্চারা খিদেয় কাঁদে, বউ গালমন্দ করে। সইতে পারি না। তাই পেলিয়ে পেলিয়ে বেড়াই।

: কটা ছেলেমেয়ে তোমার ?

: দুটো। একটা ছেলে একটা মেয়ে।

মনের মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের পোস্টার আব লোগো ভেসে ওঠে। হাসিমুখ বাবা-মা বালক আর বালিকার প্রতীকী ছবি। সঙ্গে শ্লোগান 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার'। মনের বাষ্পাচ্ছন্নতা কাটিয়ে জিগ্যেস করি : ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়ে ?

: পাউরুটির লোভে যায়। টিফিনে পেলিয়ে আসে।

: আজ সকালে তোমরা সকলে কি খেয়েছ ?

: আজ্ঞে দীনদয়াল আজকে আধবাটি গমচুর সেদ্ধ মাপিয়েচেন।

: সারাদিন বসে আছ। খিদে পায় না ?

: খিদে মরে গিয়ে নাড়ি হেজে যায়। তখন আর খিদে থাকে না দীনদয়ালের কৃপায়।

: এখানে গ্রামে কোনো কাজ নেই ?

: গাঁয়ের নাম ঈশ্বরচন্দ্রপুর। কিন্তুক ঈশ্বরের নেকনজর নেই। এখানে কিষাণের কাজ জুটলে দু টাকা পাওয়া যায়, নিদেন গম। তা কই ? এ বছর বড্ডা অজন্মা। দীনদয়ালের ইচ্ছেয় এবারে ক্ষেতে ধান নেই।

: বাইরে মজুর খাটতে গেলে পার ?

আশপাশের গাঁয়ে সেখানকার কিষাণ মুনিষই কাজ পায় না। পেত্যেকবার

বারাসাতের দিকে ধান কাটতে যাই আমরা কজন। পাই তিনটে টাকা আর তিনবার ভরপেট খাওয়া। মাস দুইয়ের কাজ। যে কাঁচা টাকা জমে তাতে সোম্বচ্ছরের কাপড়-জামা কিনি, ছেলেমেয়েদের মিষ্টি কিনে দিই একদিন। অগ্রদ্বীপের মেলায় যাই জরিমানা দিতে। এবারে এখনও বারাসাতের খবর আসে নি। উঠি বাবুদ্বয়, কথায় কথা বাড়ে।

মনোরঞ্জন বলল : এখন কোথায় যাবে ?

এতক্ষণ পর সারাদিনের শেষে সমস্ত মুখ ভরিয়ে হেসে ঘা-পচা বলল : দেখছেন না বাবু, দীনদয়ালের কৃপায় আজকের দিনটা কেটে এয়েচে। আর এট্টুসখানি পরে সন্ধেপিদিম জ্বলবে। আমি এবার মৌজ করে একডা ডুব দেব নদীতে। তারপরে একছুটে বাড়ি।

: বাড়ি গিয়ে কি করবে ?

: পেরথমে খানিকটা ঝাঁটা-লাথি মুখখিস্তি করবে পরিবার' লাজুক হাসল পচা, 'তার কোনো দোষ নেই। সারাদিন বনে-বাদাড়ে কন্দ কচু খোঁজে, লোকে হেনস্থা করে। ছেলেমেয়ে দুটো কম্‌নে থেকে আনে গেঁড়ি-গুগলি। হয়তো কার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে বউ এনেছে এড্ডু চাল। ঐ সব মিলিয়ে একটু পঞ্চতত্ত্ব সেবা হবে। দীনদয়াল যেমন দ্যান। সেই সেদ্ধ ঘ্যাঁট খানিক খেয়ে একটা তোফা ঘুম দেব। এক ঘুমে সকাল।

: কাল সকালে কি হবে ?

: তা জানেন দীনদয়াল। কিছু না হয় তো এই বাঁশের মাচান আছে। কোনোরকমে সন্ধে অবধি কাটিয়ে দিলেই হবে। যাই গা তুলি, জয় দীনদয়াল দীনবন্ধু।

অপসৃয়মান দিনের আলোর মতো পচা নেমে গেল নদীর ঘাটে। নেমে এল মনোরঞ্জনের থমথমে মুখের মতো সন্ধ্যা। আমি ভাবলাম, দীনদয়াল কোথায় থাকেন ? হুদোয় শরৎ পালের ভিটেয়, হরিমতী দিদির বিশ্বাসে না গণেশ বা পচার মতো মানুষের দুঃখের অতলে ?